শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্ম-অনাত্ম সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক

"এই বিশ্বই আমার মহান

মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮০, ১৯৭৪ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ২৭-তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

—ঃ ২৪-পরগণা জেলার অধিবাসীদের কাছে আবেদন ঃ—

★ খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

★ আপনার উপর ধার্য্য 'লেভী'-র ধান বা চাল না দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।

★ আপনার ধান নির্ধারিত মূল্যে নিকটবর্তী অনুমোদিত এজেন্টের (ডি. পি. এজেন্ট) কাছে বিক্রয় করুন।

★ ধান চালের মজুতদার ও চোরাকারবারীদের ধরার কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। এই সম্পর্কে খবর থাকলে নিকটবর্তী থানা বা চেকপোষ্টে খবর দিন।

★ নিশ্চিত জানবেন আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সরকারের খাদ্য সংগ্রহ ও সুষম বণ্টন সম্পর্কিত নীতি সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব নয়।

★ কোন কিছু জানতে হলে স্থানীয় উন্নয়ন আধিকারীকের (বি. ডি. ও.) সংগে যোগাযোগ করুন।

২৪-পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

UjjWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, (Calcutta-59) 24 Paraganrs, West Bengal
2.	Periodicity of its publication	...	Bi-monthly.
3.	Printer's Name	...	Renu Mitra M. A.
	Nationality	...	
	Address	...	As above
4.	Publisher's Name	...	Renu Mitra M. A.
	Nationality	...	
	Address	...	As above
5.	Editor's Name	...	Renu Mitra M. A.
	Nationality	...	
	Address	...	As above
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total Capital	...	Renu Mitra M. A. As above

I, Renu Mitra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 15th February, 1974,

Sd Renu Mitra,
Signature of the Publisher.

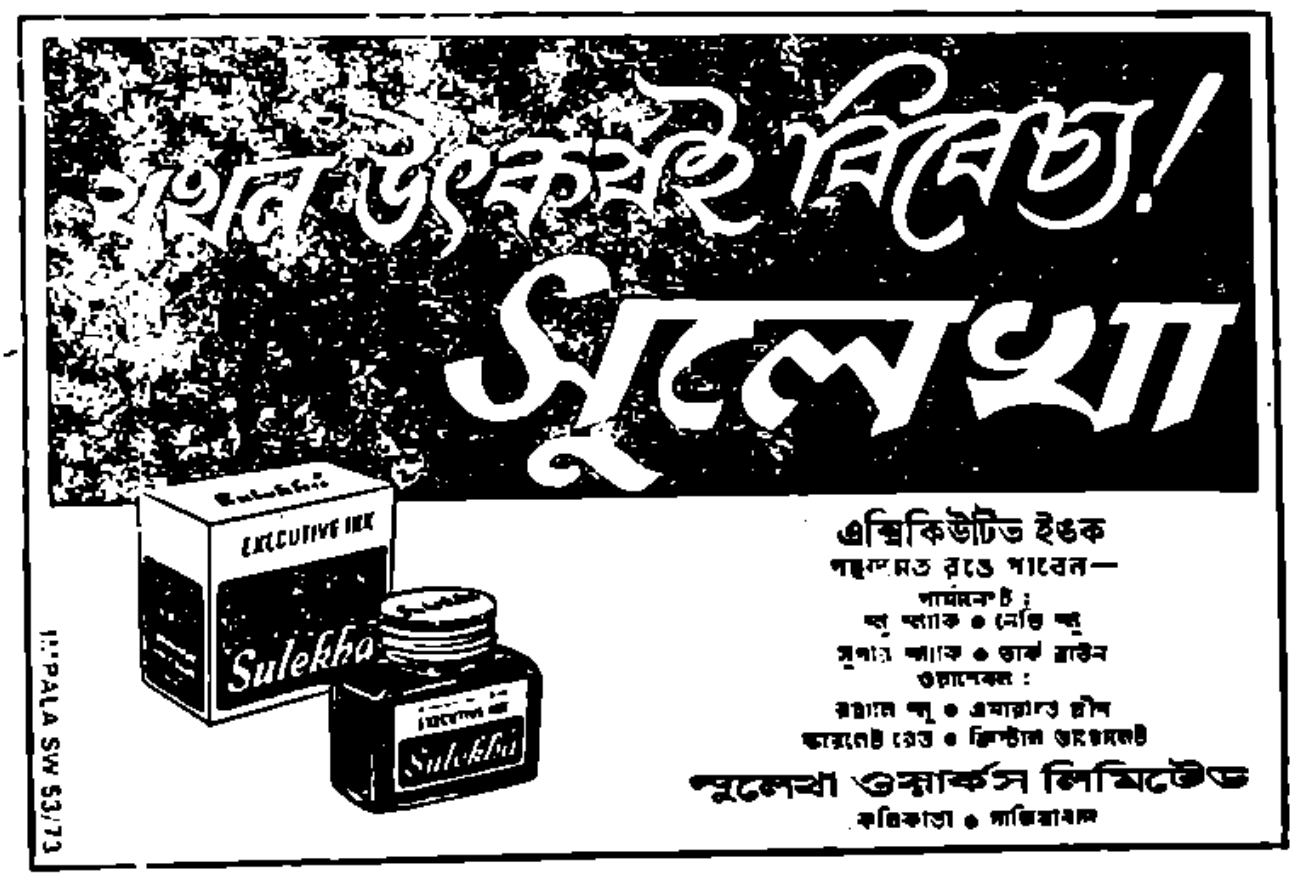

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০	ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০	বীরত্বে বাঙালী	২.৫০
কর্মযোগী	১·৫০	বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
শ্রী শ্রীচণ্ডী	১·০০	বাংলার ঋষি	৪·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০	বাংলার বিদুষী	৩·০০
Soul of India Speaks	৬·০০	বাংলার মনীষী	১·৭৫
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	জীবন গড়া	·৭৫
পকেট গীতা	৪·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
শ্রীশীলিমা ঘোষ, এম. এ., বি. টি.		আচার্য জগদীশ	২·৫০
ছোটদের শ্রীগুরু	২·৫০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বিদ্যাসাগর	৩·০০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
		রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োজনীয় নূতন বইয়ের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

২৪-পরগণা জেলার বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি

তুলা চীনাবাদাম ও সূর্য্যমুখী ফুল

চাষের উপযোগী

আমন ধান কাটার পর জমি পতিত না রেখে ঐ জমিতে তুলা চীনাবাদাম বা সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ করুন।

পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য আপনার এলাকার গ্রামসেবক বা ব্লকের কৃষি-সম্প্রসারণ অধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২৪-পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

উজ্জীবনভারত

মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৪ ২৭-তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

['লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নবনারায়ণ আশ্রম তথা 'উজ্জীবনভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর মাঘোৎসব কালে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই ইহার পূর্বাভাস যখন সেদিন সংকেতে ইহার যে-মর্ম লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। দুইদলের সঙ্গে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অন্ন্যাদর—লাঙ্গল যাহার চিহ্ন—এই সমন্বয়ন তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব এই মন্ত্রে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই দুই-ই আস্বাদন করিবে। —সঃ—উঃ ভাঃ।]

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অগ্রেই 'লাঙ্গল-চক্র ও চক্রী পুরুষের সমন্বয় করিয়া দিয়া একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের বিশেষ অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় অধি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চলে বাহিরে মনুষ্যরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি এযাবৎ নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথা স্থানে ও যথা মানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের ধ্বংসঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে ঘরাঙ্গ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজমূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রহ্মী ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম্ রূপ লইয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপসংবৃত। কৃষি ক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষী' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণক্ষেত্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ যুগ হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নবনারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'।

উজ্জীবনভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা অবনত মস্তকে তাহাকে অভিবাদন জানাইতেছি।

॥ আমাদের কথা ॥

উজ্জয়ন্তভারত পত্রিকার এই মাঘ ১৩৮০ (জানুয়ারী-১৯৭৪) হইতে ২৭-তম বর্ষ আরম্ভ হইল। গত বৎসরটি দেশের পক্ষে কিরূপ গিয়াছে তাহা বঙ্গবাসীমাত্রেই জানেন। উজ্জয়ন-ভারতকে যে তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা রক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছি ইহা প্রশংসার না হইলেও সোয়াস্তিজনক। উজ্জয়ন-ভারতের অবয়ব শীর্ণ—তাহার অস্তিত্বের সম্বন্ধেও সন্দেহ করা! কিন্তু উহার জন্য তো কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না! ধন-জনহীন একটি বিপ্লবী সংবাদকে শুধু বাঁচাইয়া রাখা যাইতেছে মাত্র! কাগজের দাম বাড়িয়াছে, প্রেসে গোলমাল চলিতেছে—এগুলি সকলেরই জানা কথা—গ্রাহক বিজ্ঞাপন এই প্রতিকূলতাতেও সংগ্রহ করিবার জন্য কাহাকেও তো সংগ্রহ করিতে পরিলাম না। উজ্জয়ন-ভারত প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আজ ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছেন—তিনি মানুষের সর্ববিধ সমস্যার গোড়ায় প্রবেশ করিয়া মানুষের জীবনকে ব্যক্তি ও সমষ্টি হিসাবে সার্থক করিতে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, অথবা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অপছন্দ তো কেহ করে না, কিন্তু অনেকখানি গভীরে প্রবেশ করিয়া এই সামগ্রিক চিন্তাধারাটি সমাজ গভীরে প্রবেশ করাইয়া দিবার মত মানসিকতার বর্তমান সময়ের এই সামগ্রিক বিশৃঙ্খলতার দিনে সৃষ্টি করিয়া তোলা সম্ভব হইতেছে না। তবু উজ্জয়ন ভারত তাহার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, যাইবে—এই নূতন বৎসরের প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই সংকল্পই সে আবারও লইতেছে। উজ্জয়ন-ভারত নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র। নর-নারায়ণ আশ্রম তাহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পুণ্য দেহ ও তাঁহার প্রদত্ত চিন্তাধারা লইয়া তাঁহার জীবনদেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের সেবাপূজা প্রাণপণ চেষ্টায় রক্ষা করিয়া যাইতেছে। আশ্রম উজ্জয়ন-ভারতসহ সমস্ত দুর্যোগের মধ্যেও সমাজের সমস্যাগুলি সমাধানের মূল কাঠামোটি মানুষের কাছে উপস্থিত করিবার প্রাণপণ প্রয়াসে সকলের প্রার্থনা সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছে।

নরনারায়ণ আশ্রম উজ্জয়ন-ভারতের মধ্য দিয়া কি কথা বলিতে চায়?

আজ সমাজ বলিয়া কিছু নাই, সরকার বলিয়া কিছু নাই, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো নিরস্ত, কেহ কাহারও পরোয়া করে না প্রত্যেকের সত্য বা স্বার্থ প্রত্যেকের নিকট—সামগ্রিক সত্য বলিয়া কিছু নাই, সামগ্রিক কল্যাণ-বোধও কিছু নাই এমন একদিন হইয়া ছিল যখন এ দেশে প্রত্যেকটি মানুষকে আত্মিক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া দিন যাপন করিতে হইত আজ সে অবস্থাটা নাই—ভগবানকে ধন্যবাদ—কিন্তু যে অবস্থা লইয়া ১৯৭৪ আরম্ভ হইল তাহা সে মৃত্যু-ভীতি হইতে কম ভীতিপ্রদ ও জীবন-নাশক নয়! প্রত্যেকে আজ নিজের প্রচুর সুবিধা করিয়া লইতে ব্যস্ত—তাহাও আবার সামগ্রিক কল্যাণের নামে। নব স্বার্থের ভাষা কাহারো মুখে শোনা যাইবে না—সকলেই পরের মুখের ভাষা ব্যবহার করিয়া পরের সর্বনাশ করিতেছে। মুস্কিলটা সেই খানে আরও বেশী হইয়াছে। এই প্রত্যেকে বলিতে শুধু একজন ব্যক্তি না-ও হইতে পারে, আজ কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা এক একটি দল। অতীতে আমরা ব্যক্তির হাতে অত্যাচারিত হইয়াছি, ব্যক্তিবিশেষের অনুশাসনে রচিত সমাজ ও ধর্ম-ব্যবস্থায় প্রপীড়িত হইয়াছি। মানুষ ভাবিয়া ছিল, একজন ব্যক্তিই অত্যাচার করে, তাই তাহারা একজনকে সরাইয়া সেখানে একটি দলকে বসাইল। উপকার অনেক দেখা গেল—মনে হইল সমাধান বুঝি পাওয়া গিয়াছে। তিরিশ বৎসর যাইতে না যাইতেই বুঝা গেল সমাধান হয় নাই—সামগ্রিক কল্যাণ আসে নাই। অত্যাচার ব্যক্তির হাতে হইয়াছে, তাহাও ব্যক্তির হাতে হইয়াছে—সে কথাটা চাপা পড়িয়া

গিয়াছিল। দলকে গদীতে বসাইয়া সোজাসুজি পার্টিতে চাহিয়াছিলাম—কিন্তু দেখা গেল এ শোষণের কাঠামো আরও শক্ত। তাই আজ বুঝিতেছি গোড়ায় সে দলের মনোবৃত্তি দূর করার ব্যবস্থা না করিলে এবং শোষণ-হীনতার কাঠামো তৈরী না করিলে যাহারাই তখন সাধারণের সুখদুঃখের কর্তাকর্তা বনিবে, তাহারাই অত্যাচার করিবে। আর এ অত্যাচার আজ দেখিতে-তো শুধু রাষ্ট্র বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঘটা নয়, সমাজে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে সর্বত্রই শোষণ।

এই সর্ববিধ শোষণ বন্ধ করিতে হইলে প্রতি ক্ষেত্রের গোড়ার কাঠামো পরিবর্তন করিতে হইবে। সে কাঠামোতে একজন প্রভু আর একজন দাস—সে সম্পর্ক কোন ক্ষেত্রেই আজ স্বীকার করা যাইবে না। সেই কাঠামো তৈরী করিতে হইবে যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রভু, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দাস। উচ্চনীচ ভেদবোধ, বড় ছোট, কুলীন অকুলীনের অসাম্যবোধ ও অসাম্যের কাঠামো ভাঙিয়া সমান সমান-এর নূতন মানসিকতা ও নূতন কাঠামো আনিতে হইবে। অসাধারণ বাগ্মী স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার প্রবল-মধুর, চিত্তস্পর্শে হৃদয়কারী কণ্ঠস্বরে একটি সরস দৃষ্টান্তে এ কথাটি প্রকাশ করিতেন। অধিকারী গান গায় প্রথমে, দোহারেরা সেখানটুকু পূরণ করিয়া যায়। গাহিতে গাহিতে অধিকারী হনুমানের নাম ভুলিয়া গিয়াছে—স্মরণ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদা ভিখাইল বেটা তার নাম কি?' দোহারেরা উত্তর দিল, 'দশ আনি ছয় আনি তার আমরা জানি কি?' সঙ্কটমোচন অধিকারীকে তখন বলিতেই হইল, 'আজ হইতে তার হইল সমান সমান', দোহারেরা তখনই উত্তর দিল, 'দাদা ভিখাইল বেটা বীর হনুমান'। উচ্চ, কুলীনের, ধনিকের, বড়র সঙ্কট আসিয়া গিয়াছে—নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যই আজ হইতে তার হইল সমান সমান কথাটি বুঝিতে হইতেছে। কেহ অপরের উপরে ছড়ি ঘুরাইয়া নিজেকে প্রভু করিয়া রাখিবে, একজনকে অক্ষিতর করিয়া আর একজন শান্তি সোয়াস্তিতে বাঁচিবে—ইহা আজ হইবার নয়। এই বোধ যা একজন ধনিক শ্রমিক উচ্চ নীচ কুলীন অকুলীন প্রত্যেকে। কিভাবে ইহা সমাজ-চিন্তায় আনা যাইবে?

চিন্তাধারার গোড়ার দার্শনিক কাঠামোতে উচ্চনীচ ভেদসম্পর্ক সিঁড়িতত্ত্ব ভাঙিয়া দিতে হইবে। যে সকল গুণ দিয়া মানুষ গঠিত—সত্ত্ব রজঃ তমো—সেগুলির মধ্যের উচ্চনীচভেদের চিন্তাধারা ভাঙিয়া দিতে হইবে। এই গুণগুলির মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ স্থাপন করিয়াছে বলিয়া সেগুলির অধিকারীদের মধ্যেও উচ্চনীচভেদ সনাতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সিদ্ধান্তে সত্ত্বগুণ কুলীন, রজোগুণ তাহা অপেক্ষা কম-কুলীন, তমোগুণের স্থান তাহা হইতে নীচুতে। এই যুক্তিকে অনুসরণ করিয়া সাত্ত্বিকপ্রধান মানুষেরা সর্বাপেক্ষা কুলীন, তারপর রজোগুণীরা, তারপর তমোগুণীরা—এই ভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া সোজার চিন্তাধারায় যে ভেদব্যবস্থা ছিল তাহা অধ্যাত্ম-জীবনকে যেমন কলুষিত করিয়াছে, তেমনি সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতি ক্ষেত্রকেও বিভেদের বিষে জর্জরিত করিয়া উচ্চনীচের মধ্যে চিরন্তন সংঘর্ষ টানিয়া চলিতেছে। তাই গোড়ায় এই বিভেদের বীজকে ধ্বংস করিতে হইবে। জানিতে হইবে, মানিতে হইবে যে, এ বিশ্বে ভগবান কাহাকেও একান্ত বড় বা একান্ত ছোট, একান্ত প্রভু বা একান্ত দাস করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—প্রত্যেকে প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া কেহ চিরজন ছোট বা বড় নয়, এবং প্রত্যেকেই অপরের অপেক্ষা করিয়াও অনপেক্ষ। এইখানেই বিশ্ব সুন্দর, মধুর, অমর।

উচ্চনীচভাবরহিত নরনারায়ণ আশ্রমের এই চিন্তাধারারই ধারক ও বাহক। সমাজের বর্তমান দুর্নীতির উচ্ছেদের বীজও এইখানে। সিঁড়িতত্ত্বের—উচ্চনীচ, কুলীন অকুলীনের—ব্যবস্থা থাকিলেই যে উপরে সে সবরকম সুযোগের অধিকারী হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে যে নীচে সে বঞ্চিত অত্যাচারিত অপমানিত হয়। এই ভেদবোধই অপরকে নিজের পরিপূরক বলিয়া মনে করাইতে শিখায় নাই—সেইখানেই জন্মলাভ করিয়াছে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি এবং রাজতন্ত্রের স্থলে সেই সমাজে যেখানে একটি ব্যক্তির বদলে একটি দলই হইয়া পড়ে হর্তাকর্তাবিধাতা—সমগ্রের

কোন সত্যকার স্থান যেখানে আজও হইল না। এ সংসারের প্রত্যেক ক্ষেত্রে—অধ্যাত্ম, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যেকে প্রত্যেককে পরিপূরক মনে করিতে না পারিলে, অপর হইতে নিজেকে পৃথক মনে করার পথেই অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজেকে সমৃদ্ধ হইতে সমৃদ্ধতর করার প্রয়াসের মধ্য দিয়া দুর্নীতি সহজ পথ পাইয়া থাকে। তোমাকে বাদ দিয়া আমার বেশ চলে, তাই তোমাকে বঞ্চিত করিবার যত রকমের পথ থাকিতে পারে—সৎ অসৎ সকল ভাবে—আমি নিজের সমৃদ্ধি বাড়াই। সকল দুর্নীতি দূর হইতে পারে যদি বুদ্ধ হইতে শিশু সকলে শিখিতে পারি অপর সকলকে লইয়াই আমি সম্পূর্ণ, অপর সকলে আমার অপরাধ। প্রত্যেকের সত্তা ও কল্যাণ যখন এবং যতক্ষণ প্রত্যেকের কাছে আলাদা এবং তাহা তাহার নিজের বা দলের সুবিধামত, তখন এবং ততক্ষণ আজ সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাহা হইতেছে তাহাই হইবে। প্রত্যেকের সত্তা এবং চিরন্তন সত্য কোথায় কোন্ কাঠামোতে সমন্বিত হয়, তাহা আজ বাহির করিতেই হইবে। সত্যকে অবশ্যই যুগোপযোগী হইতে হয়—কিন্তু কোন একটা যুগকেই একান্ত করিয়া দেখা যাইবে না—সমস্ত যুগের সাথে তো তাহার ধারাবাহিকতাও খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। ব্যক্তি বা বিশেষ কালের সত্য যখন বিশ্বহিতে ও চিরন্তন কালের হিতে সমন্বিত হইবে—সেই সত্যকেই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। যে পঞ্চকোষে মানুষের সৃষ্টি সেই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষের সত্য যেখানে সমন্বিত হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে সার্থক করিয়া সামগ্রিক সত্য হইয়া উঠিবে—সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতি অধ্যাত্ম ক্ষেত্র যখন সেই সত্যের পথে চলিবে—তখনই শুধু শোষণ পীড়ন দূর হইতে পারে, সর্বাঙ্গীণ সুস্থ হইতে পারে। বর্তমান সময়ের মত একটী সামগ্রিক অরাজক অবস্থাতেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সেদিন তাঁহার জীবনে সকল ঘটনার জীবনের যে রূপ ও তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই শোষণহীনতার তত্ত্ব ও কাঠামো—সেই শোষণহীন শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বই আজ আমাদের প্রয়োজন, আমাদের অনুসন্ধানযোগ্য—শ্রীকৃষ্ণ-জীবনধারা আয়ত্ত করিয়াই আমরা এই শোষণহীন সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতিতে পৌঁছাইতে পারি।

এই সব কথা বলিতেই নবদ্বীপধাম আশ্রমের উজ্জ্বলভারত প্রকাশ শুরু করিয়া যাইবে। আবেষ্টন বড়ই যে প্রতিকূল ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না—সমস্যা প্রেসে, সমস্যা কাগজ লইয়া—সেই সঙ্গে গ্রাহক বিজ্ঞাপনের সমস্যা তো আছেই। তবু আমরা চলিব—নূতন সৃষ্টির উপকূলে পৌঁছাইতে প্রয়াস করিব। সকলকে আহ্বান জানাই আর প্রণতি জানাই সেই শ্রীশ্রীনিতাগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে যাঁহারাই উজ্জ্বলভারতের প্রাণ, যাঁহারাই ইহার স্রষ্টা ও প্রেরণাদাতা। মানুষকে তাঁহারা আত্ম-স্বরূপ সুপ্ত-তুরীয়-তুরীয়াতীত এই পাঁচ-স্তরে সাত্বিক সার্থকতার রূপে দেখিতে চাহিয়াছেন—সেইজন্য তাঁহাদের কথা যেমন সহজ, তেমনই কঠিন, যেমন তাহা মানুষকে আবর্ষণ করে, তেমনি তাহা ঘুরে সরাইয়া দেয়। আমরা এই শোষণহীন মুক্ত জীবন-যাত্রার সাত্বিক সার্থকতার রূপকে সম্মুখে রাখিয়া পথ চলিব। জয় হোক মানুষের এই যাত্রার—প্রতি পদ-ক্ষেপে যেখানে কান্না আর হীনের গান তাহাকে প্রেরণা যোগাইতেছে!

"উজ্জ্বলভারত"-এর এই ২১-তম বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৬·· (ছয়) টাকা পাঠাইয়া দিতে গ্রাহকগণকে অনুরোধ জানাইতেছি।—সঃ, উজ্জ্বলভারত

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮৮)

২১.১১.৭৭ কলির শাস্ত্র ভাগবত—ইহাতে কলি-যুগের সাধনার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মাধ্যমে এই সাধনার কথা পৌঁছেছে···। কালীয়-দমন-লীলার ভিতর দিয়ে জীবনের কোন্ ইঙ্গিত, কোন্ তত্ত্ব ফুটে উঠেছে?- কালীয় কৃষ্ণকে পাঁচ দিয়েছেন কৃষ্ণ বলসংরক্ষণার্থায়ঃ—বল প্রকৃতির লোকদের কলিযুগে কি ভাবে সংরক্ষণ করতে হয়—তারই ইঙ্গিত ঐ লীলায় ... আক্রমণের উত্তরে প্রতি আক্রমণ—এই আমরা জানি...কিন্তু কৃষ্ণ অন্যরকম—তবে তিনি প্রথমানবপুঃ—নিজের বপুকে তিনি বাড়িয়ে তুলছেন—growing from within ··· এতে কালীয়ের অবস্থা কি হয়?···বড় হওয়ার চাপ বলেরা সহ্য করতে পারে না···। ভেতর থেকে বাড়ো —বাইরের ছিদ্র দিয়ে লড়াই করে বল লোক,বল সমাজের সঙ্গে পারা যাবে না সমাজের বুলের সুবিধা, মনের সুবিধা, জ্ঞানের সুবিধা, পাণ্ডিত্য আমার নাই এইসব অহংকারকে প্রাণ দিয়ে সুদৃঢ় করে নিতে হবে তুমি বেশে বড়, আমি তাগে বড়—তুমি দেখে মোটা, আমি না দেখে মোটা···। তীর্থযাত্রায় যাবার কালীকে প্রশ্ন করলেন শ্রীকৃষ্ণ...যারা যেন সদা নিরন্তরম্... জীবের কাছে, প্রাণের কাছে বুদ্ধির আশ্রিত ধনিক কুলীন পণ্ডিত কম।...রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করলেন কি ভাবে?...জগন্নাথের প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভু কোল দিলেন।...রাম ও তাঁর অনুগতরা নবদ্বীপবাসীকে ভালবাসেন ...আর ধনী কুলীন পণ্ডিতের অযোধ্যা রামকে বনবাস দিয়েছিল···। ধনী কুলীন পণ্ডিতের মধ্যে যারা প্রাণবান, তাদের সঙ্গে প্রেমের মধ্যে যুক্ত হয়ে চলতে হবে···সমাজ শিক্ষা শিল্প সব কাঠামোকে ঠিক রাখিয়ে সমাজকে রক্ষা করতে হবে··· আমেরিকা, ইংলাণ্ড প্রভৃতি বলের সঙ্গে আর এক বল যুক্ত হয়েছে পাকিস্তান···উগ্রপন্থীরা প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করুন···· পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে লড়াই করে উগ্রপন্থীরা স্থিতিলাভ করতে পারবে না··· তারা যদি পশ্চিমবঙ্গের সেবা করবার বুদ্ধি রাখত—কেবল আমাদের দাবী—দিতে হবে—এই বুদ্ধি নয়—তাহলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাণের মধ্যে তারা স্থান করে নিতে পারত···তা না করেই আজ অন্তর্ধারণের যাওয়ার প্রশ্ন উঠেছে.. আজ ধনী ও দরিদ্র, শ্রেষ্ঠ ও পরিষির মিলন ঘটাতে হবে, মুখ্য ও গৌণের মিলন ঘটাতে হবে—বর্ণ হিন্দুর মধ্যে আর অনুবর্ণের বৈশ্যশক্তি বা শূদ্রের মিলন ঘটাতে হবে···কলকেন বৃন্দাবনের সময় থেকে ছোট-মাছদের জন্য দুয়ার খোলা...তার আগে দ্রৌপদীর বস্ত্র শোষ করতে পার্থ সারথি অবতীর্ণ ...সহায়হীন is never too late কৃষ্ণ বলছেন দ্রৌপদী সম্বন্ধে—'ক্ষণমেতৎ প্রতুষং মে দুরয়াং বাসিদর্শিতি, যদ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্'···· আজও কৃষ্ণের সেই ক্ষণশোষের পালা চলছে—প্রজার কাছে রাজার ক্ষণশোষ করতে হবে···চাষীর কাছে জমিদারের ক্ষণ শোষ করতে হবে, নারীর কাছে নরের ক্ষণ শোষ করতে হবে—তাই রাধার চরণতলে কৃষ্ণ। কৃষ্ণই গৌর হয়ে ক্ষণ শোষ করতে, আমার সাধারণকে প্রেম বিলাতে···· এই কৃষ্ণ-গৌর-জীবনকে আজকের দিনে স্থান করে এনেছেন শ্রীনিত্যগোপাল···· দরদনারায়ণ আজও সেই বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরছে···· ছোট যদি আত্মশক্তির পরিচয় না জানে

তাহলে দাঁড়াবে কি কেবল দাবীর উপরে?...ধরার ধূলি হবে ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানুষ

২৬.১১.৪৭—'আমি'র যেমন একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এই বিশ্বেরও তেমনি একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। আমির খেয়ালে বিশ্ব চলে না, বিশ্বের খেয়ালেও আমি চলি না। বিশ্বের সঙ্গে আমির চলায় সামঞ্জস্য আনতে হবে। আমার খেয়াল মেনে আজ রাত্রি হয় না, আগুন জ্বলে না···ওদেরই একটা নিজস্ব বিজ্ঞান আছে···আমার খেয়াল মত বিশ্ব চলে না—২০০ লোক আমরা, তাদের সুবিধা মত ঘটায় হাত চালাতে হবে না···আমির সঙ্গে বিশ্বের যোগ, আমির সঙ্গে বিশ্বের যোগ খুঁজে বের করতে হবে...আমার ইচ্ছায় বিশ্বকেই ঘিরে চলে...মন আজও আমার হুকুমে চলে না··· এ দেশের লোক আমির উপর বেশী জোর দেওয়ায় ভাবুক হয়েছে, কর্ম করতে পারে না··· আবার কর্মের গোলাম হয়ে পড়াও চলবে না, আবার আবার খেয়ালেও কর্ম করা চলবে না।···এদের দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র বের করতে হবে, আত্মা অনাত্মার সম্বন্ধ বের করতে হবে।...যার দোষেই হোক, অমুক কাজটি হ'ল না, সেইটি প্রধান কথা...কেমন করে চললে কাজ হয়, সেইটা বের করা নাও···প্রকৃতির পরিবর্তন কর।···আমির সঙ্গে কর্মের যে যোগে কর্মও হয়, আমিও বিপদে পড়ি না—সেইটে কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ।···আশ্রম গড়েছ···দু রকমের ইস্কুল...মানুষের অবাধ আসার সুযোগ হয়েছে···ছেলেপুলেরা এসে ফুল ছিঁড়বে, উত্তেজিত হতে পারবে না···মনের প্রতিষ্ঠান, মানুষের জন্য পথ খোলা···কাজ না করে উপায় নেই—অর্জুনকে বলেছেন। কর্ম নৈষ্কর্ম্যের সামঞ্জস্য এনে কাজ করতে হবে।...যেমন তেমন করে বস্তুকে চালানো যায় না···তাই চাই শরণাগতি, শরণাগতি।...অহংকার থাকলে বস্তুর বিজ্ঞান ধরা পড়বে না। যদক্ষরং পরিস্রষ্টং যাজ্ঞাহীনক যৎ ভবেৎ...পূর্বং তথাস্তি যৎ সর্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর—যে অক্ষর পড়ে গেছে, যে যজ্ঞ কম পড়েছে···তা তুমি পূর্ণ করিয়ে নাও।...কর্ম শুদ্ধির কর···বুঝে শুনে কর···যেমন করে কাজ হয়।···এটা তো দশজনের কথা—তুমি বাইরে যাচ্ছ, তোমার কাজ আর এক জনকে বুঝিয়ে দিয়ে যাও···আত্মার খেয়াল যেমন অনাত্মা চলে না, অনাত্মার খেয়াল যেমন আত্মা চলে না ...এই দুই-এর মধ্যে যার ধরে গেছে, সে-ই আসুর···আমার খেয়াল মেনে মাটি চলে?···এই আদর্শের ভিতর দিয়ে জীবন চালাতে পারলে জীবনে শান্তি পাবে।...

১৪-১২-৪৭ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কালের সপ্তদশ ৫০০০ বৎসর পূর্বে যে জীবন ও দর্শন রেখে গিয়েছিলেন, আজকের অন্ধ দের কাছে তাই-ই নিয়ে এলেন শ্রীনিত্য-গোপাল কি তাঁর জীবন ও দর্শন, তা আমাদের বুঝতে হবে অন্ধযুগে কি আমরা আছি?

শ্লোকে অন্ধানুঃ সদা বসন্তেষ্বিন্ যুগে জনাঃ।

মন্দাঃ হ্রস্বমতয়ঃ মন্দভাগ্যাঃ হ্যপক্রতাঃ॥

আমরা ঘরে বাইরে কতরকম ভাবে যে উপদ্রুত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না—এদের জন্য কৃষ্ণ-কথা যে শুধুতাং রসজ্ঞানাং আহু আহু পদে পদে—প্রতি পদে আহু কৃষ্ণকথা এই সব উপদ্রুত মানুষকে শোনাতে হবে ···আমাদের কাছে জগৎটা এত dull হয়ে গেছে যে তোমাদের দিন গেলে বাঁচি, সেই রকম মানুষের কাছে রাসলীলা-কথা শোনাতে হবে··· শ্রীচার্য তাঁর দর্শনের বিরোধ কথা স্বচ্ছাস্থি সামাসিদ্ধ চ—দ্বন্দ্ব কি?—উভয় পদার্থপ্রধানঃ দ্বন্দ্বঃ ···যা contradictory—বিরুদ্ধ, বিপরীত, তা complementary—পরিপূরক—দুই ভিন্নগতি তাঁর ম্যাটার এণ্ড লাইট পুস্তকে বলেছেন. যেখানে বিরোধ সেখানেই মিথুন··· কলহা অর্থ both are indispensable to each other···। জড় অজড়, রাজা প্রজা, স্বামী স্ত্রী···সব যুযুৎসু—অথচ কারোকে না হলে অপরের চলে না। এইটে বুঝতে হবে, স্বীকার করে প্রতিদিনের জীবন যাপন করতে হবে। পাণ্ডবদের বাড়ী ঘর ছিল না, তবু তাদেরই ঘর খাবল, দুর্যোধন তার অট্টালিকায় থেকেই মরল, যেমন সমকারী রাজেরই ঘর খাবল, নিজের ঘরে বসে রাবণ মরল...। অর্জুনের দ্রৌপদীর জন্য কোন ব্যথা নাই সেখানে অর্জুন প্রজাবাদী...,

ভগবানে প্রজ্ঞা-প্রাণের সমন্বয়—বিস্তীর্ণকে গভীরকে ঘিরিয়ে ভগলক্ষণম্ ...। মায়া বলে যে বাইরেকে এতদিন আমরা অস্বীকার করতে চেয়েছি, আজ তাই আমাদের চেপে ধরেছে।...অন্তর্মুখীনতা, চোখেমুখের one side, অন্তর্দৃষ্টি ... একলা ধ্রুবর্ষি বা একলা যোগেশ্বর নীতি রক্ষা করতে পারবে না।... Truth in itself —আর truth for others মেলাতে হবে।...পাশ্চাত্য যদি তার ঐহিকের অন্তরালেই চালাতে চায় তাহলে লক্ষ্মী ওদেরও থাকবে না—এ দেশ তো তিনি অনেক দিনই ছেড়েছেন...। অরবিন্দ (আধুনিক দার্শনিক) তাই তো বলেছেন spiritual life is at the same time self-life and cosmic life ...পাশ্চাত্যের প্রবল ধাক্কায় ভারতবর্ষে তার সব বদলে গেল...। কৃষ্ণ বললেন ঘরের কথা বাইরে শোনাও, বাইরের কথা ঘরকে শোনাও ...ক্ষেত্র ও পরিধির সম্বন্ধ নূতন করে বুঝতে হবে। ...কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—নিস্ত্রৈগুণ্য হয়ার্জুন, আবার বলেছেন রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব...। গান্ধীজী হিটলারকে লিখেছিলেন, Have no more territory than you can rightly govern : (আজ হিটলার মুসোলিনী এসেছিলেন)—জিতেন বাবুকে আশ্রমের পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। রমরমে যুবকদের সঙ্গে তিনি যে ভাবে মিশে থাকেন তা শুনে আনন্দ হল—কিন্তু সমস্যা ও সমাধানটা কালঘরে সোজা থেকে বুঝতে হবে...। পরিধি কেন্দ্র, নারী পুরুষ, রাজা প্রজা সবকে যে সমন্বয় আজ দিতেই হবে...। সেইটে কোন্ চিন্তাধারায় আসবে?...বাপমাকে যে ভাল না বাসে, কোন বন্ধু তাকে রক্ষা করতে পারবে না —আবার ঘরেও তো শুধু ছেলেমেয়েদের রাখা যাবে না...। মার্ক্স বললেন, truth for us; ভারতবর্ষে এতদিন truth in-itself...ত্রিকালাবাধিত—absolute সত্য ছিল সত্য কাকে বলে?...ন যথার্থ ভাষণং সত্যং...লক্ষ্য রাখতে হবে ভূত-কল্যাণ হল কিনা...মিথ্যাভাষণের বিষকে পরিষ্কার করার কৌশল কৃষ্ণ শিখিয়ে দেবেন... এ পথ কঠিন বেনমা সুবিধাবাদ এসে পড়ে—তাই এটাতে খুব সচেতন হতে হবে...। নিত্যগোপাল সর্বসাধারণের মধ্যে সাম্যবাদের এই সামগ্রিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিয়ে পুরুষোত্তম ভারতবর্ষ রচনা করতে এসেছেন...। ভারতবর্ষে এখনও সহস্র সহস্র আশ্রম—কিন্তু সত্যকার মানুষ কই? ...যেই তিমিরে সেই তিমিরে ...বেদান্তকে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনগত করতে না পারলে দুর্নীতির হাত থেকে রেহাই নেই ...পূর্ণযোগের সঙ্গে ব্রহ্মযোগের যোগ হলে পুরুষোত্তম যোগ হয় ...বুদ্ধের সঙ্গে বেদান্তের যোগ কোথায় বের করে নিতে হবে... মানুষকে সেবা করা ঈশ্বরকে সেবা করা থেকে নয়...সঙ্ঘ রক্ষা করার অসুবিধে প্রচুর।... কৃষ্ণ গো-গোপাঙ্গনাবৃতম্ ...খণ্ডিত ভারতকে তিনি অখণ্ড ভারতে গড়বেন... কেমন করে? —প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমীকরণ ধারা, জ্ঞান-কর্মের সমীকরণধারা, ভগবানের সঙ্গে সংসারের সমীকরণধারা, বস্তুসঙ্ঘাতের মধ্যে থেকে নিস্ত্রৈগুণ্য হতে ...। সন্ন্যাসী বেদান্তকে নাগরিক বেদান্তে পরিণত করতেই হবে... জিতেনবাবু, সচ্চিৎসাবু মানুষের কল্যাণ করতে চান,...সঙ্ঘ গড়তে চান, কিন্তু বেদান্ত সঙ্গে না থাকলে man-hater হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত ... সামনে বিজ্ঞানের যুগ, পেছনে অতীত ভারতবর্ষের অন্তর্মুখতি, আত্মতুষ্টি...—দুটোর connecting link বের করতেই হবে ...কৃষ্ণ নিত্যগোপাল দার্শনিক ভাবে এইটে করে রেখে গেছেন—আমরা ধরতে পারছি না ...তারই কথা এই জড়ভড় সমন্বয় সূত্রে...। নরনারায়ণ আশ্রম এই দর্শনেরই ধারক ও বাহক...।

২৩. ১২ ৭৭—বর্তমান যুগের সাধনা হচ্ছে পাটিগণিতের ল, সা, গু.- L. C. M-এর...এই সাধনার কথাই নরনারায়ণ আশ্রম সারা জীবন ও সমাজের ভেতর দিয়ে দেবার চেষ্টা করে আসছে ...ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমষ্টির গলাগলি কি করে করা যায়? এতকাল গ, সা, গু-G. C. M.-এর সাধন করার প্রতিক্রিয়ায় আজ L. C. M এসে পড়তে চাইছে—কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারছি কই? ১, ৩, ৫-এর এক হওয়ার প্রক্রিয়া দুই রকমের হতে পারে। ১, ৩, ৫-এর ব্যক্তিত্বের ঘরের ধারা ১ এক হয়ে এক হওয়া; আবার প্রত্যেকের ১-ত্ব, ৩-ত্ব, ৫-ত্ব বজায় রেখে এক হওয়া। সাগরে নর্মদা গঙ্গা কাবেরী কারোরই ভিন্ন পরিচয় নাই।...

এই সাধনার প্রতিক্রিয়ায় বর্তমানের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারা ...স্ত্রী স্বামীর মাঝে, শিষ্য গুরুর মাঝে লয় হয়ে যায়। আজ তা নেই। ১, ৩, ৫ তাহলে নিজের কি করে? ক, খ, গুরু পথে ১৫ হয়ে—সেখানে ও তিন থেকেও বড় হয়ে আর একজনকে পেল.... ৩ ও-কেই চিনবে না, পাবে না বলে সে ১৫ বা ৪র্থ—হয়ে পাওয়া তো ঘুরের কথা। ঘুরের মধ্যে সবলে যে হতে পারে, কিন্তু আশ্রিত স্বাতন্ত্র্য কি করে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে অথচ ওতোপ্রোতভাবে না হয়ে? এইটাই হল ক, খ, গুরু সাধনা বড় হতেই হবে—পরিচিত তিন ঘরে নিজেকে অপরকে পাবে না ...যোগসূত্র ভুল কর্মনি— সেটা বড়র মধ্যে হারিয়ে যাও। ৩-এর কি প্রয়োজন ছিল ৫-এর জন্যে হতে টুকু, তার থেকে বেশী জানে ৫—১৫-র কাছে শরণাগত হওয়া মানেই ৩-এর থাকা—নিজের আত্মসমর্পণ না করলে নবীন নবীন থাকবে?...আজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে এসেছে উচ্ছৃঙ্খলতা। বড় হবে, বড়র মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করে যে আত্মস্বাতন্ত্র্য থাকছে তাতে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকবে না। এই ১৫-র সাধনার নাম সমাজতান্ত্রিক সমাজ... সমাজরূপ ১৫-তে আত্মসমর্পণ যেখানে ১, ৩, ৫ সবলেরই পৃথক অস্তিত্ব আছে।...বর্ম তোমার নয়, বর্ম বিশ্বের, বিশ্বনাথের। এ বুদ্ধিতে বর্ম না করলে বর্ম করার মধ্যে বিতৃষ্ণিতা থাকবে না।...সাগরের বিতৃষ্ণিতা নিতা..., তোমাকে বিন্দু হতে হবে সাগরে আত্মসমর্পণ করতে হবে...। আমেরিকা ইংলাণ্ড রাশিয়া কারোর দেয়ালেই চলবে না।...প্রত্যেক মানুষকে আদি পুরুষোত্তম হতে হবে।...সাধনা নিজেকে হারিয়ে ফেলা বড়র সঙ্গে, তাকেই সঙ্গ দিয়ে নিজেকে পাওয়া।...সাগরের সঙ্গে, বৃন্দের সমাজের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে বিন্দুতেই নিজেকে পাবে না... আপূর্যমাণ-অচলপ্রতিষ্ঠা becoming full ... সন্তানকে বাঁচানোর দায় সন্তানের নয়, পিতা-মাতার আমার অজ্ঞাতসারে আমার জন্য পিতামাতার মত একটি force কাজ করছে... বিশ্বের শরণাগত হও, গুরুর শরণাগত হও...বড় যে কেউ হয়েছেন সবলেই কারোর কাছে শরণাগত...,মাতৃভক্ত। শ্রদ্ধা তাদের অপরিসীম...এই শ্রদ্ধা না থাকলে কোন বৃহৎ বস্তুকে ধারণ করা যায় না—এই শ্রদ্ধা ছিল বলেই তাঁরা এত বড় হয়েছেন... নিজেকে হারিয়ে নিজেকে পেয়েছেন তাঁরা—এইখানে খ্রীষ্ট যে কথা বলেছিলেন die to live—নিজে বাঁচতে চাইলে বাঁচবে না—মরতে যদি পার তাহলে বাঁচবে—নরনারায়ণ আশ্রম এই কথা বলে যাবে।...

—সম্পাদকীয় বক্তব্য—

উত্তরভারত পত্রিকার গত অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅঞ্জলি চক্রবর্তী লিখিত 'বর্তমান-সমাজে ব্যক্তির গুরুত্ব' নামক প্রবন্ধটি নরনারায়ণ গ্রন্থাগার (গ্রামীণ)-এ প্রতি মাসে যে আলোচনা-সভাটি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে উপস্থাপিত লেখিকার বক্তব্য। এ সংবাদটি গত সংখ্যায় উল্লেখ না করা ভুল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া দুঃখিত।

হিপি-প্রিয় বাঙালী

॥ শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য্য ॥

আজিকার দিনে পথে-ঘাটে প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি দৃশ্য বোধকরি নিয়মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহা হইতেছে বর্ত্তমানকালের নূতন ফ্যাসন 'হিপি মার্কা চুল'। সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রত্যেকটি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের সেই আদিম যুগের কথা মনে পড়িয়া যাইবে। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন—ঘন সবুজ বৃক্ষের সমারোহে, পর্ব্বতের গুহার মধ্যে বা বৃক্ষশাখায় একশ্রেণীর অতিকায় মানব বাস করিতেছে। তাহাদের মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল, হাতের এবং পায়ের অঙ্গুলিতে বিশাল নখরশ্রেণি বিরাজমান। তাহাদের সেই আদিম যুগের মানবজাতির সহিত বর্ত্তমান কালের 'ইন্টালেকচুয়াল'-দের যদি তুলনা করা হয় তাহা হইলে পার্থক্য শুধু মাত্র একটাই দেখা যাইবে, আর তাহা হইতেছে সেই আদি মানবগণ গুহায় বাস করিত আর বর্ত্তমানকালের 'ইন্টালেকচুয়ালগণ' শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত গৃহের কোণে বাস করেন এইমাত্র। এই সব বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত মাথার চুলকে সযত্নে লালন-পালন করিতেছেন এবং শুধু তাহাই নহে গালের উপর [illegible] ছুঁচ্‌লো ছুঁচে চওড়া দুইটি জুল্‌ফিও দুই গালে শোভা পাইতেছে দেখা যাইবে। হায়রে বাঙালীজাতি! ইহারা কি ঘরের দর্পণে নিজেদের রূপ ইহাতে কী পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল তাহা একটি বারও প্রত্যক্ষ করেন না! হয়তো করেন এবং পূর্ব্বের চেয়ে, অন্যের চেয়ে আরও বেশী পরিমাণে 'ইন্টালেকচুয়াল' হইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাই আরও একটিবার বর্ত্তমান কালের বাঙালীজাতিকে লক্ষ্য করিয়া, দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি হায়রে বাঙালী! ইহার জন্যই বুঝি প্রবাদ রহিয়াছে 'অনুকরণ-প্রিয় বাঙালী'! স্মৃতিপটে বেশ স্মরণ হয় যে বাঙালীদের মধ্যে পূর্ব্বে এইরূপ চুল রাখিবার রীতি ছিল না। কিন্তু অন্যূন বিংশ-শতাব্দীতে দেখিতেছি যে এই সমস্ত ব্যক্তিগণ, যাহারা জন্মসূত্রে বাঙালী হইলেও 'অনুকরণ সূত্রে' হিপি হইয়াছেন, তাঁহারা 'অনুকরণ-প্রিয়-বাঙালী' কথাটিকে সত্য সত্য চুল ও জুল্‌ফি রাখিয়া সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। বিদেশীদের মধ্যে অবশ্য এই চুল ও দাড়ি বা জুল্‌ফি রাখার রীতি আছে এবং তাঁহারা রাখিয়াও থাকেন। আমাদের দেশের শিখ এবং পাঞ্জাবীগণ মাথায় চুল ও দাড়ি রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা অপরকে অনুকরণ করার প্রয়াস পান না। কিন্তু আমাদের এইসব বাঙালী বাবুদের শুধু অপরকে অনুকরণ করাই কি ধর্ম? অন্ততঃ তাহাদের দেখিয়া তাহাই মনে হইয়া থাকে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ইহাই যে আমাদের এইসব বাঙালী বাবুরা (অবশ্যই 'ইন্টালেকচুয়ালগণ') বিদেশীগণকে অনুকরণ করিতে গিয়া এমনই চমৎকার রূপ ধারণ করিলেন যে তাহারা না হইতে পারিলেন সেই হিপি, না হইতে পারিলেন পাঞ্জাবী বা শিখ। হায়রে কপাল! ইহাদের অবস্থার সহিত তুলনা করা চলিতে পারে পাঠ্য পুস্তকের সেই 'ময়ূর-পুচ্ছ' কাকের! ইহা আবার কি রকম গল্প? তবে শোনা যাক্ ……একদিন একটি দাঁড়কাক একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে কয়েকটি ময়ূরের পালক সংগ্রহ করিল। তাহার পর সে উহা নিজের পুচ্ছে লাগাইয়া লইয়া অন্যান্য বন্ধুদিগের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা দাঁড়কাকটিকে ঐ বেশে দেখিয়া তাহাকে তাহাদের দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। দাঁড়কাক নিজেকে ময়ূরের মত মনে করিয়াছিল কিন্তু ময়ূরের দলও তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার নিকট

হইতে সেই মধুরের পাত্রগুলি কাড়িয়া লইল এবং তাহাকে তাড়াইয়া দিল। ফল হইল এই যে, হাড়গোড় কোন দলে স্থান লাভ করিতে পারিল না। অগত্যের মোহের বশবর্তী হইয়া হাড়গোড় স্বজাতির নিকট হারাইল। সুতরাং সেইসব 'ইণ্টেলেকচুয়াল'গণকে বলিতেছি যাঁহারা নিজেদের 'হিপি' মনে করেন এবং পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে এবং মাথার চুলের মধ্য দিয়া সেই 'হিপি'-দের একজন মনে করেন তাহাদের মনে করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি যে ঐ 'হিপি'-দের চোখে তাঁহারা কিন্তু এখনও 'নেটিভ'।

কাশিমবাজার কুঠি দখলের সময় সিরাজদ্দৌলা তাঁহার সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া যখন কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণ করিলেন, তখন ইংরাজগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দুর্গের ফটক বন্ধ করিয়াছিল। সেই সময় প্রায় চাকর দু'এক বাঙালী দুর্গদ্বারে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং অনুরোধ করিতে লাগিল যাহাতে ইংরাজগণ দুর্গের ফটক খুলিয়া তাহাদের আশ্রয় দান করে। কিন্তু ইংরেজগণ তাহাদের কথায় কর্ণপাতমাত্র না করিয়া বলিল—'তোমরা তো ইংরাজ নও, তোমাদের এখানে আশ্রয় দেওয়া যাইবে না।' তাহারা বলিল—'কিন্তু আমরা এতদিন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তবের সঙ্গে তোমাদের মতই আচরণ করিয়াছি, সর্বোপরি তোমাদের 'খ্রীষ্টান' ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, এখন আমাদের বাঁচাও।' কিন্তু দুর্গের ফটক খুলিল না। এরপর যখন বাঙালীরা আসিল, তখন তাহারা আসিয়া ইহাদের বলিল—'তোমরা তো বাঙালী নও, 'ইংরাজ অনুকরণকারী', কাজেই তোমরাও আমাদের শত্রু।' যে সমস্ত 'হিপি'দের দেখিয়া আমাদের দেশের বাঙালী 'ইণ্টেলেকচুয়াল' বাবুরা তাহাদের অনুকরণ করিতেছেন, শেষ পর্যন্ত সেই 'হিপি' গণই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একদিন বলিয়া বসিবে—'তোমরা আমাদের অনুকরণ করিয়াছ কেন? আমরা তো তোমাদের মাথার দিব্যি দিই নাই! আমাদের মতো চুল রাখিলে—গাঁজার কলকে টানিলে কি 'হিপি' হওয়া যায়? আবার বাঙালীদের নিকট হইতে শুনা যাইবে—'তোমরা তো 'হিপি' অনুকরণকারী! আমাদের সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই, পথ দেখ'। অতএব, হে 'হিপি' অনুকরণপ্রিয় বাঙালী! 'হিপি'দের অনুকরণের মোহ সময় থাকিতেই পরিত্যাগ করা ভালো। কারণ তোমরা যতই 'ইণ্টালেকচুয়াল' হও না কেন বাঙালী মাত্রই অন্য কিছু নয়।

সমর্পণ

॥ শ্রীগণেশ চক্রবর্তী ॥

জীবন সায়রে যখনই এসেছে ঢেউ
পেয়েছি আমার চলার ছন্দ পেয়েছি
তুমি ছাড়া তাহা জানিতে পারেনি কেউ
তাইতো আজিকে তোমারি দ্বারে এসেছি।
হে আমার প্রিয়, হে আমার চিরসাথী
তুমি যে আমারে ডেকেছ এসেছি তাই
এনেছি শুধু যে অশ্রুকণের বীথি
নাই কিছু আর এ ছাড়া কিছু যে নাই।
তুমিই আমার জীবনের মহাশক্তি
তোমার মাঝেই পেয়েছি আমার পথ
উদ্যম গতি তোমাতেই পায় স্থিতি
শ্রান্তির মাঝে তুমিই আমার রথ।
হৃদি-মন্দিরে পেয়েছি তোমার দেখা
বিরহের মাঝে পেয়েছি তোমারে কাছে
চির দুদিনে তুমি কাছে থেকো সখা
এ অধম আজি এই শুধু ভিখ যাচে।
বিশ্বের মাঝে তুমি চির নির্ভর
বেদনার মাঝে তুমি এ জীবন প্রিয়া
হে প্রাণের প্রিয়, গাহি আমি তব জয়
যা আছে আমার সকলি তোমারে দিয়া।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(৪৮)

—১৯৫৪—

নিত্যগোপাল, প্রাণধন আমার, প্রাণে বুঝিতেছি তুমি মহানির্বাণ মঠ ও সম্প্রদায়ের প্রাণহীন আবেষ্টনের মধ্যে কি ভাবে পীড়িত হইতেছ। আমি তো যতদূর পারিয়াছি তোমার মুখপানে চাহিয়া তোমার মতামত ও সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধতা আনিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পারিলাম কই? এখানে তো কেহ কাহারও সঙ্গে সহযোগিতার কথা ভাবেও না। অথচ তোমার শেষ উপদেশে তো তাহাই ছিল। কোথায় তুমি আর কোথায় ইহারা? তোমার মঠের ধ্বংস আনিতে ইহাদের প্রাণে কিছু বাজে না। তোমার সোনার দেহ তো ঐ ধানেই আছে। আমি যে বড় রিক্ত। শূন্য সঙ্গ করিয়া চলিয়াছি। মানুষকে ভালবাসিয়াছি, তবুও 'অপেক্ষা' আমার নাই। তোমার সঙ্গে অনন্ত হইব। যাকে তাকে দিয়া তোমার সেবা করাইবার গোঁজামিল আমি দিতে পারি নাই। তোমার সেবা চোখের জল ঝরাও হয়। তুমি আমায় বুকে রাখিও। সকালে মঠে যাই। যুগান্তর আনন্দবাজার অমৃতবাজার হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রতিবাদ বাহির হয়। মঠের লোকেরাই যদি হিসাবের বন্দোবস্ত করিতে পারে, কুবেরকে দিতে চাই না। এদিকেরও তো অনেক কাজ আছে। আর ওখানে কাজ করা খুব শক্ত। নীতি ও শৃঙ্খলা বলিয়া ওখানে কিছু নাই।...কে আছে এ মঠের? শুধুই তাহাদের পিছনে—আলেয়ার পিছনে—ঘোরা।...তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিলে মানুষের ক্ষমতার দম্ভ চূর্ণীকৃত হয়। আমার জীবন শূন্য-পথ ধরিয়া চলিয়াছে। পূর্ণত্বের সন্ধান পাইতে আটকায় নাই। আমি জানি শূন্যের মহিমা, 'ন'-এর তত্ত্ব। আমি নিষ্কম্প, তাই কাহারও কাছে ব্যর্থ মাথা নোয়াইতে আমার হয় নাই। তাঁহার প্রসাদে মাথা উঁচু রাখিয়াই চলিয়া আসিয়াছি। হরে মুরে

নিত্যগোপাল, তুমিই শ্রীকৃষ্ণ, যে-জীবনে অবতারবাদের মূলতত্ত্ব পরিপূর্ণ ভাবে আস্বাদিত হইয়াছে, সেই তুমিই আমার গৌর। শ্রীকৃষ্ণরূপে তুমি মায়ার ধ্যানে, প্রকৃতির ধ্যানে বিভোর। প্রকৃতিকে পাইবার জন্য তীব্র তপস্যা করিলে, ধরা পড়িয়াও প্রকৃতি ধরা পড়িলেন না, সমস্ত বিকার পরিত্যাগে মাখিয়া তুমি নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ আস্বাদন করিয়াছ ব্রহ্মও প্রকৃতির কাছে অধর, প্রকৃতিও ব্রহ্মের কাছে অধরা দুই জনের এই ধরা-দিবার প্রচেষ্টার মাঝেই এই বিশ্বসৃষ্টি দুই-ই দুইয়ের সংযোগবন্ধ, অথচ দুই ই দুইয়ের কিছু নয় ও পরস্পরীয়—ইহাই বিশ্বরহস্য। প্রকৃতির মান বাড়াইয়াই তুমি প্রকৃতির চরণতলে, প্রকৃতির দ্বারে দ্বারী। ওগো প্রকৃতি-ভক্ত পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার-বরিষ্ঠ অবতারী নিত্যগোপাল তোমার জয় হউক। রেণু পুণ্ডরীকাক্ষ ডাক্তার বাবুর বাড়ী যায়.... আমি সকালে মঠে যাই, কিরি ১০ টার পর ...রেণু ৩ টার পর প্রেস হইয়া আশ্রম ওখানে যায়। সে ৫ টাকা দেয়। ৪ টার পরে মঠে যাই ভূধর সহ। রেণু ৯ টা নিয়া আসে। লোক কেন পাওয়া যায় না, তাহার কারণ সম্বন্ধে অমূল্য ও তারিণীবাবুর মধ্যে বচসা হয় যে পর্যন্ত না 'সাম্য' প্রচারিত হইতেছে, যে পর্যন্ত সাধু কর্মীর মর্যাদা স্বীকৃত হইতেছে, যে পর্যন্ত সন্ন্যাস কৌলীন্য স্বীকৃত থাকিতেছে, যাহারা এই মঠের কেহ নয় ততদিন পর্যন্ত তাহাদের পিছন পিছন ঘোরা বন্ধ হইয়াছে, এক কথায় যে পর্যন্ত নিত্যগোপাল-তত্ত্ব এখানে প্রচারিত না হইতেছে, ততদিন এ মঠের কল্যাণ নাই

তারিণীবাবু আজিও সন্ন্যাসী-গৃহী। পুথক সাহিতে থাকিয়া অনুসন্ধান করেন; বলেন যে, সন্ন্যাসীর জাত নাই, যাহাদের জাতি নাই তাহাদের সঙ্গে জাতিওয়ালারা মিশিবে কেন? সন্ন্যাসীদের জাত গিয়াছে। জাতি যদি গিয়াছে তাহা হইলে পৃথক আসন কেন? কেন ব্রাহ্মণ-বৈরাগী, নম বৈরাগী এক সাহিতে যায় না? যুগের বিরুদ্ধে চলিলে উহার মৃত্যু অনিবার্য। ২৩শে মার্চ

নিত্যগোপাল, আমি তোমাকে জীবনে—দেহে প্রাণে মনে বুদ্ধিতে অহরহ আত্মস্থ—ধারণ করিব, এই অধিকার আমায় দেও। তোমাকে ধারণ করিবার উপযোগী দেহ প্রাণ মনও দেও। তোমাকে বুকে পুরিয়া বিশ্ব মানবের কাছে তোমাকে উপস্থিত করিব। আমার অন্তরে নিত্য-গোপাল, বাহিরে নিত্যগোপাল, সামনে পশ্চাতে ডাইনে বামে ঊর্ধ্বে অধোতে তুমি আমাকে আবরণ করিয়া আছ। তুমি আমার আমি। তুমি-আমি এক-তনু। আমার তোমার পৃথক বুদ্ধি গলিয়া যাউক। আমার দেহ তোমার দেহে লয় হউক, আমার প্রাণ তোমার প্রাণে, আমার মন তোমার মনে, আমার অহম্ তোমার অহম্-এ, আমার আত্মা তোমার আত্মাতে লয় হউক আমি তুমি-ময় হইব। তোমার মাঝে লয় হইয়াই আমি আমার সত্য আমিকে পাইব। আমার জীবনে তোমার আসন রচিত হউক। সকালে মঠে যাই, কিরি ১১ টায়। আমি রেণু ও সোণা ৫ টার পর মঠে যাই। রেণু ক্লেশ হইতে ঘুরিয়া আসে। মঠের অনাচার বলার নয়। হস্তগত শনি। আমূল পরিবর্তন না হইলে কিছুই হইবার নয়।.. মহানির্বাণ মঠ সকলের মুটের ভারণা। যে যাহার সুবিধা করিবার জন্য এখানে আসে, এখানের স্বার্থ কাহারও নয়। কি আবেষ্টনের মধ্যেই ঠাকুর তুমি আছ। তোমার সমাধিস্থ হইয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। সমাধিস্থ হইয়া থাকিলেই রক্ষা। জাগ জাগ। আমি তোমাকে বুক দিয়া আগলে রাখিব। আমাকে তেমন শক্তি দেও। যে সেবা নিয়া এত বজ্জাট, সে সেবা কি কাহারও তৃপ্তি দান করে? 'সে যে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'।...রেণু ২৫০৲ টাকার চেক ট্রেজারি বুক কমিটী হইতে পাইয়াছে। ২৪শে মার্চ

নিত্যগোপাল, আমার দেহ-রথের সারথি, তুমি-আমি একই রথে সমাসীন হইয়া সংসার-রণাঙ্গনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভাঙিয়া গড়িবার জন্য। আমাকে দিব্য নয়ন, সমগ্র দৃষ্টি দেও। 'শিষ্যস্তেঽহম্'—আমি তোমার শিষ্য। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমাতেই অর্পি। তোমার অর্পিতে তাঁর মিলাইয়া তোমার সৃষ্টি আমি গড়িয়া তুলিব। সৃষ্টির যোগ, পালন-পোষণের যোগ, প্রলয়ের যোগ, কৌশল আমাকে শিখাইয়া দেও ওগো যোগেশ্বর। তোমার যোগে, পুরুষোত্তম-যোগে আমি যোগী হইব। আমার ঐকদেশিক দৃষ্টি দূর কর, সমগ্র দৃষ্টি দেও। তোমার নয়নে আমি সব-কিছু দেখিব; পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখিলেই সব যায়া, মায়াহীন। তোমার নয়নে দেখিলে সবই ব্রহ্মময়। আমি তুমি, তুমি আমি; নর নারায়ণ, নর নারায়ণ। রেণু, তারিণীবাবুরা ৩ টার পর রাজভবনে প্রফুল্লবাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যায়। তরুণ কান্তি ঘোষের ওখানেও যায়। কুমার সকালে যাইয়া যাওয়াআসি যায়। আমাদের ওখান পর্যন্ত অরিণ করিতে আসে নাই। সকালে আজ আর মঠে যাই নাই। ৪। টার পর রেণু সহ মঠে যাই।...২ বৎসর মঠে যাইতেছি। মন্দিরে যাই না। বারান্দায়ই বসিয়া থাকি। আর যাইব না ভাবিতে দুঃখ লাগে। তাঁহার সেবার জন্যই গিয়াছিলাম। ঠাকুরকে ঘর হইতে জনসাধারণের মধ্যে আনিতেই প্রাণপণ করিয়াছি। পারি নাই। ব্যর্থতার বেদনা আজ খুব পীড়া দিতেছে। ভেদের বেড়াজাল তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। কে তাঁহাকে বাহিরে সর্বসাধারণের মধ্যে আনিবে? বেদনা বুকে লইয়া কয়েক দিন পরেই চলিয়া আসিব। বাঁধনছেড়া ছিলে তুমি, আমিও বাঁধন ছেড়া হইয়া তোমাকে বুকে লইয়া সংসারময় বিচরণ করিব। ২৫শে মার্চ

ঠাকুর, আমার বড় ব্যথা। আমাকে এই অসহায় পরিস্থিতির মাঝে ফেলিয়া কোথায় তুমি? আমি সর্ব-সাধারণের হইতে চাহিয়াছি। মানুষ হওয়া ও করা চাহিয়াছিলাম—শিক্ষিত-অশিক্ষিতের, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের, সন্ন্যাসী-সংসারীর ভেদ আমি মানিনা। মানুষ হইলে

সবই হওয়া হয়, তাই মানুষ হইতেই চাহিয়াছি। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ভেদে এ যেন ডুবিয়াছে। মাটিতে বসিতে পারিলে খাটে বসি নাই, জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়াছি, পরিয়াছি। আর ইহারা সব বিষয়ে জন-সাধারণ হইতে কত পৃথক! মঠের পৃথক ঘর। তোমাকে তালাবন্ধ করিয়া রাখিলেও তুমি দেওয়াল ডিঙাইয়া বাহিরের মধ্যে গিয়া উঠিয়া থাকিতে। তোমার সেই বাহির-মধ্যবর্তী ছলই আমার ভাল লাগে। আমাকে তোমাময় করিয়া লও। আমার দেহের স্বামী, প্রাণের স্বামী, মনের স্বামী, আত্মার স্বামী তুমি। আমি সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা তোমার সেবা করিব আমার সকল বৃত্তি ব্রহ্মময়ী হউক সকালে রেণু সুবোধ দেওঘর এখানে যাক, অপর্ণার এখানেও যাব, পারুলা। সুবোধ যে সব আসে। সুবোধ যে এখানে ছুপুরে প্রসাদ পায়....ছুমার ১১টার পর হনহন হইয়া বাওয়াআটি যায়। ঘরিল পায় নাই। আমাদের জমি মাপা হয় নাই। ৪টার পর আমি রেণু ও গোপা মঠে যাই। সেখানে ঔষধিনী মন্ত্র ও তাহার পুত্রবধূ আসিয়াছিল। আমি সকালেও মঠে যাই। জ্ঞানস্বরূপানন্দ আজ লোকজনসহ আসিয়াছে। নিত্যপদানন্দ আসিয়াছে গত পরশু। মঠে সকালে ঘরিপালের অন্তর্গত হবিবপুরের নারায়ণ সরকারের সঙ্গে দেখা। ঠাকুরের সঙ্গে আমার চেহারাগত সাদৃশ্য আছে, আমাদ্বারা ঠাকুরের কাজ নিশ্চয় হইবে ইত্যাদি বলিল। ...নিত্যপদানন্দ বলিল, মঠ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, আমাদ্বারা আসিয়াছে। তারিণীবাবু আমার উপর নারাজ। কি আর করিব? তিনি সনাতনপন্থী। ঠাকুর বাড়ীর ঠাকুর কায়দাই নিত্যগোপালকে তাঁহারা রাখিতে চান। আমি চাই তাঁহাকে বিশ্বজনের মধ্যে স্থান করিতে। বৃন্দাবনেই নারায়ণের কাঁধে নয়। ঐশ্বর্যের বেশে নয় তো দাস। মনে পড়িতেছে, 'রাজার ছদ্মবেশে রাখালের প্রাণ আমার হাসিয়ে উঠেছে'—মথুরায় কৃষ্ণের এই কথা। নিত্যগোপালের মথুরায় রাজবেশ আমি চাই না। ২৩শে মার্চ

নিত্যগোপাল, তুমি সর্বভূতাত্মা, সর্বভূত ছিল তোমার আত্মা যেমনা সর্বভূতের তুমিই আত্মা। তুমি সর্বভূতের সকল অপমান, সকল লাঞ্ছনা সকল অনাদর গায়ে মাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইলে সর্বভূতের মাঝে। ওগো বৈরাগী, তুমি কাল যাও নাই, কাল পর নাই। কোনও অপেক্ষা তোমার ছিল না। তুমি চাও নাই, কিছু পাও নাই। শুধু দিয়াই গিয়াছ অকাতর বাণী। অনাদরের বরণে তুমি দিয়াছ আদর 'একলা যাইব মুখ না পাইবে'—ইহাই ছিল তোমার জীবনব্রত। বিশ্বের অন্তরের, মান মর্যাদার সম্মান করিতেই তুমি দার্শনিক ভাবে স্থাপন করিলে মানুষের ব্রহ্মমূল্য, ব্রহ্ম নিরপেক্ষ স্বয়ংমূল্য। ওগো, ভাগো, ভাগো। আমি ও রেণু ট্রামে উঠি, রেণু যায় সুবোধ দের বাসায়, আমি যাই মঠে মঠে যোগেন সহকার যান, ১১টার পর বৃষ্টির মধ্যে দুজনেই ট্রামে উঠি তিনি কাশীপুর যাইবেন। রেণু আমাকে ৪।৫ টার পর মঠে দিয়া আসে কিন্টু ও জলের টাঙ্ক মঠে আসিয়াছে, পুকুর জলে পূর্ণ।—পারাজয় দৃষ্টি লইয়া নিত্যগোপাল জীবন বর্ষন, তাঁহার মঠ ও সম্প্রদায় গড়িতে চাহিলে যথার্থতায় তাহা পরিণত হইবেই। যুগের সঙ্গে চলিতেই হইবে যুগকে গড়িয়া তুলিবার জন্য। ছুমার নীরদবাবুর ওখানে সন্ধ্যায় যাব, আসা হয় নাই। কাল ৭।৮টার পর যাইবে। ২৭শে মার্চ

বিশ্ব আজ প্রলয়পয়োধি জলে নিমগ্ন। তুমি বেদ ও তাহার ঘনীভূত চরিত্র নিয়ে আসলে। তোমার ব্রহ্মময় আচরণ আমার হউক তোমার চরিত্রে চরম-রূপ হইয়া বিশ্বে বিচরণ করিব, সকল আচরণের মধ্যে তোমার ব্রহ্মরূপকে জমাইয়া তুলিব। সকল অপ্রাকৃত প্রজ্ঞাকে বুকে ঘন হইবে, mysticism অনন্ত সম্ভাবনাময় ব্রহ্ম-logic-এর রূপে উদ্ভাসিত হইবে। তুমি প্রাক্-বিপ্লব নিয়া আসিয়াছ, সকল বেদ—পাণ্ডত-মূর্খ ভেদ, ধনী-নির্ধন ভেদ, কুলীন-অকুলীন ভেদ, আকাশ-মাটি ভেদ ভাঙিয়া বাস্তবের বুকে এক অদ্বৈত সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ যে নির্ভর অন্ধ ছিল সর্ব জাতির ভাগ্যে, তুমি সেই অন্ধকে সর্ব জাতি সমন্বয়ের বুকে স্থাপন করিলে। আমি তোমার সেই রূপকে ধারণ করিব ওগো ব্রহ্মরেণু।

আমার হৃদয় তুমি, সকল সাগর খুঁজিয়া তোমায় পাইয়াছি ওগো আমার বুকের ধন। ৭।০টার পর আমি ও রেণু মঠে যাই। কুমার বাগুইহাটি যায়। আজ অর্পিত হইয়াছে কুমার ফিরিয়াছে সন্ধ্যার পর মঠে। আমি ১১টার পর মঠ হইতে ফিরি। রেণু ৪।০টার পর পত্রিকা অফিস গুলিতে যায়, ফেরে কাজ সারিয়া ৮ টার মধ্যে।... নিত্যগোপালানন্দ বলে, 'আপনার originality আমারও নাই আপনি চলিয়া গেলে আমরা অসহায় হইব'। আরতির পরে কালিকার অহোরাত্র কীর্তনের অধিবাস হয়। আমিও ঠাকুরের সামনে বসিয়া 'নিত্যগোপাল প্রাণারাম, গুরু জ্ঞানানন্দ নাম'—এই নাম করি। কে একটি মহিলা আসিয়া তপালে চন্দন ও একটি যুঁই ফুলের মালা আমার গলায় পরাইয়া দেয়—মন্দিরের ঠাকুরের গলার মালা! আমি মালা পরিয়া বসিয়া আছি। মনে হইতেছিল, ঠাকুরেরই গলার মালা আমার গলায়! ঠাকুর, আমি তোমার শক্তি, তোমার আবরিণী। তোমাকে বিশ্বের বুকে প্রচার করিবার অধিকার দেও। ৯টার পর রেণু ও কুমারসহ চলিয়া আসি। কুসুম আসে ১২ টার পর। ২৮শে মার্চ

নিত্যগোপাল, তুমি কৃষ্ণ-সংসারবাসনা-বদ্ধ শৃঙ্খলা শ্রীরাধা-ভাব অঙ্গে মাখিয়া আসিয়াছ। শ্রীরাধা সৃষ্টি-রচনার ব্রহ্মময়ী শৃঙ্খলা। তুমি সেই শৃঙ্খলার দর্শন, ছন্দের দর্শন চড়াইয়া দিতে আসিয়াছ। ঐ যে প্রলয়পয়োধি জল ভেদ করিয়া নবীন বিশ্ব তোমাকে মস্তকে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছে। তোমার প্রভায় বিশ্ব উদ্ভাসিত। তোমা হইতে অনন্ত কর্ম, অনন্ত জ্ঞান, ও অনন্ত ভক্তি মূর্ছিত হইতেছে। তোমাকে বন্দনা করি সকল দেহ মন প্রাণ দিয়া। দিকে দিকে তোমার বন্দনা-গীতি উচ্চারিত হইতেছে—'নিত্যগোপাল প্রাণারাম গুরু-জ্ঞানানন্দ নাম'। ৮টার কুমার ও আমি মঠে যাই। অহোরাত্র কীর্তনে আর যাইব কেহ্যা হয় নাই...কীর্তন চলিয়াছে। আজিকার পত্রিকাগুলিতে (আনন্দবাজার ছাড়া) উৎসবের কর্মসূচী ছাপা হইয়াছে। ১১টার পর ফিরি, ৪টার পর যাই। সন্ধ্যার পর শরদিন্দু রায় যান। ব্রহ্মসূত্র পড়িয়া তিনি খুব খুশী, প্রেস ও প্রাচীকর্ম আশ্রমে নিপুণ প্রচারের কথা বলিলেন... ঠাকুরের দর্শন জীবন আলোচনা করি। ধীরেনবাবুও ছিলেন। দুইজনের কাছেই উৎসবে আর্থিক সাহায্যের কথা বলি। দিবেনও। চিঠ্ঠ এক এক্সপ্রেস চিঠিখানা জানাইয়াছে, তাহারা স্বামী স্ত্রী বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে দীক্ষা নিবে জীবন তাহে ক্লান্ত হইয়া। ঠাকুর, তুমি তার নিও, সর্বজীব কল্যাণ করিও। আমি তোমার শ্রীচরণে সঁপিয়া দিব। রেণু ২।০টার প্রথমে Free lance, পরে অন্য পত্রিকাগুলিতে যায়। ক্রীন্যাজের সুরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। ২৯শে মার্চ

নিত্যগোপাল, বিশ্ব যখন মনের স্তরের পারস্পরিক সম্বন্ধে প্রান্ত, ক্লান্ত, মুমূর্ষু, তখন তুমি প্রাণ-প্রাবন লইয়া ধরার বুকে অবতীর্ণ হইয়াছ পারস্পরিক সম্বন্ধকে পারস্পরিক সম্বন্ধে গড়িয়া তুলিবার জন্য। তোমার আবির্ভাবে বিশ্ব মহামৈত্রী বন্ধনে বদ্ধ হইবে। আজ তোমার জন্মের অধিবাস। পরস্পরবিজিগীষ মতবাদ, সম্প্রদায়, জাতিকে অধিকার করিয়া তোমার আবাসভূমি রচিত হউক। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'—জগতের মাঝে যত ছোট ছোট জগৎ, সব তোমার সত্তা চৈতন্য আনন্দদ্বারা বাসিত হউক, আচ্ছাদিত হউক। আমি তোমার বিশ্বের ধাত্রী হইব, তোমার বিশ্বগৃহের গৃহিণী হইব, তোমার ঘরের ঘরণী হইব। জগন্নাথ নিত্যগোপাল, জগন্নাথ নিত্যগোপাল, জগন্নাথ নিত্যগোপাল। সকালে মঠে যাই, ফিরি ১০ টার পর। নবদ্বীপের ধীরেন ডাক্তার আসেন, দুপুরে এখানে প্রসাদ পান। ৪টার পর চলিয়া যান। রেণু পত্রিকাগুলিতে ঘুরিয়া ফেরে ৮ টার পর। আমি ৪।০ টার পর মঠে যাই ...মঠে অমরেশ (নবদ্বীপ) বাবুর সঙ্গে দেখা। বন্দোবস্ত একরূপ সমাপ্ত। যোগানন্দকে হিসাব লিখিবার সাহায্য করি। কুসুম উদ্বাসিনী, নীলু ঘরে সুব্রত নরেন লীলা মঠে যায়। সন্ধ্যায় নীলুর সঙ্গে আসে। চিঠ্ঠ ও তাহার স্ত্রী দীক্ষা নিবে, কাল আসিবে। তাহার বাগানের কিছু তরকারী নীলুর সঙ্গে

পাঠাইয়া দেয়। রাধু আসিয়াছে।...মনে হইতেছে, 'পরে মন, হবেই হবে'। কে আটকায় নিতাগোপালকে? জনসাধারণের যাহাতে প্রয়োজন, তাহাকে কায়েমী স্বার্থ-সম্পন্ন সন্ধানী বা অন্য কেহ বাধা দিলে তাহা কি টিকিবে? ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইবে। ৩০শে মার্চ

শ্রীনিতাগোপাল-আবির্ভাব বাসন্তী অষ্টমী

শ্রীনিতাগোপাল, তোমার আবির্ভাব তমসাযুক্ত হউক। নিম্নের মানুষের জগৎ তুমি রাখিয়া দিয়াছ তুমি 'I am a cosmopolitan'-বাণী। প্রতি মানব বিশ্বনাগরিক হইবে, বিশ্বমানব হইবে, তোমার আবির্ভাব তাহারই মূর্তিমতী সূচনা। মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ভেদের প্রাচীর ভাঙিয়া যাইবে। তোমার সত্তাকাজলে বিশ্বমানুষ সঞ্জীবিত হইবে, এক-বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে—আজ তাহারই জন্মদিন। বিশ্ব নূতন বিশ্ব হইবে। তোমার বিশ্বকে তোমারই ছাঁচে গড়িয়া তোমার চরণে নিবেদন করিবার মত 'বল' আমায় দেও। চিত্ত পরিমল ও ব্রহ্মত দীক্ষা নেয় চিত্তকে প্রথমে 'দিতে হবে পাড়ি' রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা পড়িতে দেই। শিল্প আমি করি না, চাকর আমি রাখি না, আমি চাই সহযাত্রী। নিতাগোপাল আদি পথযাত্রী, আমি অকূলে অকূল বাঁধিয়া চলিয়াছি। যে আসে তাহাকেই সঙ্গে লইয়া চলিব, বুকে রাখিয়া চলিব। সকলে হাঁটিয়া মঠে যায়...আমরা ২৷৷০ টায় মঠে যাই, উপরের সকলে যায়। মঠে যাওয়া লইয়া গোলমাল হয়। পাড়ার ছেলেরা নাকি রাস্তার পাচককে মারপিট করিয়াছে। ৪৷৷০ টায় সভা আরম্ভ হয়। রমাপ্রসাদ বাবুর আসিতে একটু দেরী। নীলু উদ্বোধন সঙ্গীত গায়। পরে আমি কিছু বলি। 'I am a cosmopolitan'—ইহাই নিতাগোপাল-প্রদত্ত মহাবাক্য, বিশ্ববাসীকে প্রতি জনে জনে এই মহাবাক্য মুখস্ত করাইতে হইবে, রক্তের মত ছুটিতে হইবে, প্রাণে আনিতে হইবে। শ্রীনিতাগোপালই বর্তমান যুগের আদি মানব। তিনি বর্তমান যুগ-সমস্যার সমাধান-মূর্তি। পরে নিত্যপরমানন্দ বলে। পরে সভাপতির ভাষণ। সভাপতি মহাশয় আমার সর্বপথ সংরক্ষার হয়ত আদৌ ধরিতে পারেন নাই পথের পার্থক্যে লক্ষ্যস্থানও পৃথক হয়। সভার পর কালীকীর্তন হয় আমি উদ্বোধনকে অভিনন্দন করি ও ১৬ই-র কর্মসূচী শুনাইয়া দেই। নব-দ্বীপের অমরেশ ভট্টাচার্য সকালে ও বিকালে আসে। সে সন্দেশ ও সোডা খাওয়ায়, প্রণাম করে। আজ প্রথম সে পায়ের ধুলি নিল, 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিল। বুকস্টল প্রথমতঃ দুমার দেখিতেছিল, সঙ্গে রাধু সেন্ট, প্রভৃতি। বহুনা আসে অমরেশ কাল আশ্রমে প্রণাম পাইবে, এজন্য ৫০০ টাকা দিল। তাহার মা আসিয়াছিল, তাহা সারাদিন ছিল। সুধাংশু আমাকে ২০০০ টাকা দেয়। ঈশ্বর প্রামাণিক আসিয়াছিল। ৩১ শে মার্চ

নিতাগোপাল, তোমার প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন। তোমার ইচ্ছাই আমার আস্থা। তোমার প্রয়োজন, তোমার ইচ্ছা আমার দেহ মন প্রাণে জন্মিয়া উঠুক। তোমার দেহে মনে প্রাণে আমি মহানির্বাণ লাভ করিব। আমি নিশ্বিয়া যাই, তুমি আমার জীবনে উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ কর। তোমা হইতে আমার পৃথকত্ব ঘুচিয়া যাক, এই পৃথকত্ব আমি আর সহ্য করিতে পারি না। ওগো আমার আমি, নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ। ওগো আমার আমি! আজ জন্মেজয় উৎসব। জন্মেজয়-কুমার আমার জীবন-সর্বস্ব। পিতা জন্মেজয়, তোমার পুত্র আমার জীবাতু। ঝড় নামিয়া আসুক, তোমার প্রেম-প্রাবনে বিশ্ব ডুবিয়া যাউক। প্রেমের প্লাবন ছাড়া এত ব্যাপক দুর্নীতি দূর হইবার নয়। মঠের ভিতর যত pocket সৃষ্টি হইয়া সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে। চূর্ণ কর এই পরিচ্ছিন্নতা। ওগো ঝড়, নামিয়া এস। ৮৷৷০টায় মঠে যাই, ১১৷৷০ টায় ফিরি। অমরেশ আসে ১২৷৷০ টায় পর। উপরের নীচের ছোটরা আগে প্রসাদ পায়। ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুধাংশু ছিল। নীলু আসে। ৪টার পূর্বে আমি মঠে যাই। চপলাবাবু ৫৷৷০ টায় পর আসেন। ...আমার সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়। চপলাবাবু আবিলে

তিনিই সভাপতি হন। সভাতে প্রফুল্ল সেন আসিয়া জানাইয়া যান যে বৈকালের সভায় তিনি আসিতে পারিবেন না। বিজ্ঞানানন্দ প্রথমে বলে ··· সুরেশবাবুর যে উদ্বোধন সঙ্গীত কোন সহযোগে গায়—শেষ মিষ্টি হইয়াছে। বীরেনবাবুর গ্রন্থ খুব ভাল হইয়াছে। বিবেকানন্দের জীবন ও প্রচার শ্রীনিত্যগোপাল দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয়, ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা হয় না—ইহাই তাঁহার বলার তাৎপর্য। চপলাবাবু বিশেষ কিছু বলেন না, তবে নিত্যগোপাল অবতার-পুরুষ ইহা বলেন। পূর্ণেন্দু ঘোষ ভাগবত পাঠ করেন।...৯।০টার পর চলিয়া আসি ১লা এপ্রিল

নিত্যগোপাল, তুমি এক-দিন পড়িবার দীক্ষা লইয়া আসিলে। তোমার প্রেরণায় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাস্তব আস্বাদন লাভ করিবে। তুমি সকল ছ'টি ঢেউ ভাঙিয়া সকলকে সমত্বসনে টানিয়া লইলে। তুমি 'ভাঙিয়া রাখিয়াছ', 'বাঁধিয়া রাখ' নাই। তুমি সকলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সঙ্ঘ রচনার মন্ত্র দিয়া গেলে। বিশ্ব ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। তোমার শ্রীচরণ হইতে বিশ্ব নূতন ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার শক্তি লাভ করিয়াছে ...সকল লাঞ্ছনার মাঝে, অভিযুক্তদের মধ্যে মুক্তিধন তোমাকে পাইয়াছি। পায়ের অঙ্গুলির ক্ষতটা বাড়িয়াছে ....৩০ টার পর মঠে যাই। সুধাংশুকুমার আসেন নাই, কোন খবরও দেন নাই। আমাকেই সভাপতি হইতে হয়। শ্রীসুধীরবাবু এক ঘণ্টার অধিক বলেন আগা-গোড়া inconsistent। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মধ্যেও নাকি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখা যায় ও গিয়াছে। তবে আর কেন তাহার ঘোষিত 'সমাজ বিজ্ঞানের' প্রয়োজনীয়তা? কেন যুবকেরা আসে না তাহাদের 'ধর্ম'-র জন্য? এতটা কথা বলিয়াছেন আজ প্রয়োজন উৎকট, উহাকে সামলাইতে ধর্মের সঞ্জীবনতম আস্বাদন প্রয়োজন। বীরানন্দ বলে। 'মায়া'-কে নিত্যা বলা ঠাকুরের বিশেষ অবদান। ইহার পর কর্পোরেশন কাউন্সিলার শ্যামল দত্ত বলে। 'সমগ্র মূর্তি নিত্যগোপাল' বই তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। সে ইহার মূল দুইটি বলিয়া চমৎকার বক্তৃতা দিয়াছে।···আমার বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে 'চেতানন্দ প্রভৃতি উদ্বোধন প্রণোদিত আবৃত্তির বাজনা সুরু করে। নির্গুণ বাউলের গান হয় নাই। বাউলের গান হয়। পরে এক জন ভাবসমাধি বিশেষ ভজন গান হয়। প্রায় ১১টায় আসি আমি ও কুমার।... ২রা এপ্রিল

নিত্যগোপাল, জীবনের ক্ষণতারা, বিচিত্র ও বিষম ঘটনা-সংঘর্ষেই এই সংসারের মধ্যে তোমার জীবনের দিকে চলিয়া চলিয়াছি। তোমার মত এত বিষম ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া ব্রহ্মস্বভাব বজায় রাখিয়াছে এমন দ্বিতীয়টী কেহ নাই। ওগো বিষমের বুকে সম! তোমার সামঞ্জস্য সর্বোত্তম ও বিস্তীর্ণতম। তোমার প্রাণধারার মধ্যে শঙ্কর-বুদ্ধ-চার্বাক সব মিলিত। তোমার মুখ ও মুখনিঃসৃত বাণী সংযোগনে হৃদয়ে বহন করিয়া চলিয়াছি। কে তোমার বিশ্বরূপী জীবনের গাথা শুনিবার জন্য তোমার জনদের মধ্যে আছে? কাহার কাছে বলিব? আচারের বেড়াজালে তুমি আজ বন্দী তুমি সব কিছু আচারের মাঝে প্রাণসঞ্চার করিতে আসিয়াছ। তোমার চারধারে আজ প্রাণহীন আচার। ···৮টার পর মঠে যাই ভক্তসভা ১১টা পর্যন্ত ... ব'দুয়া, নরেনরা আজ যায়, যমুনাও যায়।···মাঠে যাই ৪টায়। ৫টায় সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি হন শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী। মোহিনী ভট্টাচার্য আসেন। ডাঃ জে, সি, মুখার্জী আসেন সভাশেষে। বজবজ গিয়েছিলেন, বৃষ্টিতে আটকাইয়া যান। প্রকাশানন্দ ও অনিমেষ চৌধুরী বক্তৃতা দেন। সভাপতি মশায় 'অভক্ত-বৎসল' শব্দটীর উপর জোর দেন। তিনি বলেন—শ্রীকৃষ্ণ পুতনা বধ করেন, আর শ্রীনিত্যগোপাল ভারতকে, সব পতিতাদের কোলে তুলিয়া লন। কৃষ্ণ হইতেও তাঁহার লীলা 'মহত্তর'। 'মহত্তর' বিশেষণটী তিনিই দেন। সভাশেষে ত্রিপুরারীবাবু ১।০ঘণ্টা 'মহাভারত' পাঠ করেন। ই শব্দটী ছিল না। বেশ গার্হস্থ্যিক আলাপ চলে। বলিলাম, 'ভাই, প্রাণন আসিতেছে। পুরুষোত্তম-জীবনে দেখকে ডুবাও। যিনি ৫ হাজার বৎসর পূর্বে কৃষ্ণগোপাল, তিনিই নিত্যগোপাল।

এই স্থানেই বিশ্বসংগঠনের শক্তি রহিয়াছে। তুমি পারিবে।' বলিলেন, 'পারিব'? বলিলাম, 'নিশ্চয়ই'। বলিলেন, 'না হইলে কিন্তু দাদাকে চাপিয়া ধরিব'। এক-বিশ মিনিটের দীক্ষা নিতাগোপালই দিয়া গিয়াছেন পরে কীর্তন হয়। 'সম্বর-মূর্তি নিতাগোপাল' বইটী যে কি কাজ করিল, আশ্চর্য! আশুবাবুর উপরও ইহার প্রভাব পড়িয়াছে, ইহা তাঁহাকে পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল। জে দি মুখার্জী আরতির ওখানে সব সময় দাঁড়াইয়া ছিলেন। ত্রিপুরারীবাবু ও মুখার্জীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। নীলু সভার আরম্ভ ও সমাপ্তি সঙ্গীত গায়। ২২ৎসরের প্রচেষ্টার আজ পরিসমাপ্তি ৩রা এপ্রিল

নিতাগোপাল, শত আক্রমণ লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়া তুমি আমার হাত ধরিয়া লইয়া আসিয়াছ। তুমি নিজ মুখে বলিয়াছ, 'শরৎ, যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি'। সুখে দুঃখে সারা জীবন তুমি অগ্রসর করাইয়াছ। ...ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিশ্বকে তুমি এক বিন্দে গড়িয়া তোল। ...সকালে মঠে যাই, ৯টার মধ্যে ফিরি। কুমার ৯টার পর দমদম দিয়া রেজিষ্টীকৃত দলিল নিয়া ফেরে ১টার কিছু পূর্বে। নীলু-সুব্রত ৭।০টার পর দক্ষিণেশ্বর যায়। রেণু ৫টার পূর্বে পত্রিকাগুলিতে যায় চার দিনের বক্তৃতার রিপোর্ট দিতে। ফেরে ৭।০ টার পর আমি ৫ টার পর ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউটে যাই সতীন সেনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রার্থনা করিবার জন্য। অতি বালক নচিকেতার মত একদিন সতীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া যম-পুরিতে প্রবেশ করিয়া ছিল। তাহার জিজ্ঞাসা ছিল, 'অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্র অধর্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃত-কৃতাৎ'। 'তৃতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যামি তদ্বদ'—ইহাই ছিল সতীনের সারা জীবনের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর সে পাইয়াছিল ও পাইবে 'বৃহৎ ব্রহ্মতি' ও 'যাতি সর্বত্র'-এর ক্ষেত্রে। সে নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করিয়া গিয়াছে। আমরা শুধু তাহার জীবনে জীবন মিলাইয়া তাহার অগ্রগতির জন্য উদ্গাহিত করিব ...অন্তরের মুখে শুনিলাম, আমি ট্রাস্টী হই নাই। এই ট্রাস্টি resistence-এর মধ্য দিয়া অবিচল থাকিয়া চলিতে হইবে। ঠাকুর, সঙ্গে থাকিও। ৪ঠা এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার ডাক (বাঁশীর গান) ও লাঞ্ছনা ইহাই আমার সারা জীবনের সম্বল। 'ক্ষুরস্য ধারে নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম পথ কবয়ো বদন্তি তথা'। তোমার ঘরেও আমার স্থান হয় নাই। বেশ, তোমার বিশ্বে আমায় স্থান দিও। আমার বল বুদ্ধি সব তুমি। এই পথে চলিবার উপযোগী বল বুদ্ধি সুযোগ আমাকে দেও। তোমাকে তোমার তত্ত্বসহ ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিব ইহাই আমার সংকল্প। আমার মাথা তো কোনও দিন নীচু হইতে দেও নাই। যে দিন কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া ধরিত্রীর বুকে 'স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ' গড়িয়াছিলাম, সেদিনও আমার 'মান' রাখিয়াছিলে। আমার 'মান'-রাখা তুমি। তোমার মানে আমার মান। 'নূতন উপকূলে দিতে হবে পাড়ি বাঁচি আর মরি।' লাঞ্ছনাই আমার ভূষণ, বাধাও তোমার সৃষ্টি। সকল বাধা পরিষ্কার করিবার মত শক্তি আমাকে দেও। বাধা আমার জীবনে রাখা হউক। আজ আর মঠে যাই নাই।...বৈকালে হেমনলিনী দেবী (অতীন্দ্রবাবুর স্ত্রী) দক্ষিণেশ্বর হইতে আসেন আগামী ১লা বৈশাখ তাহাদের আশ্রমে অনুষ্ঠেয় সভার সভাপতি হইবার অনুরোধ-পত্র লইয়া। যাইব বলিয়া দেই।...সকালে 'ভগবান বুদ্ধ ও ভগবান শঙ্করাচার্য' প্রবন্ধ লিখি বৈশাখ সংখ্যার জন্য। মঠের অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছি। উহারা তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। শাস্তি দিয়াছে। ২০ মাস শতবার্ষিকী উপলক্ষে মঠের সেবা যথাসম্ভব ধন জন শারীরিক প্রমদ্বারা করিয়াছি। তাহার 'পুরস্কার' মিলিয়াছে। ওখানে আমার 'স্থান' নাই, উহারা আরামে থাকুন। আমি আছি, বাঙ্গালা আছে, আর আছেন বৃহত্তরা আমার নিত্যগোপাল জগন্নাথ। আমার সেবা করিবার অভিলাষ তো কেহ কাড়িয়া নিতে পারিবে না। প্রস্তাবের উত্তেজনা আবার বাড়িল...। ৫ই এপ্রিল

ঠাকুর, নিজের জীবন তোমার ছাঁচে গড়িতে চাহিয়াছি। আশে পাশে যাহারা ছিল তাহাদেরও তোমার

হাতে পড়িতে চাহিয়াছি। টানাটানি করিয়াছি, সেই কাজে দুঃখও দিয়াছি তাহাদের দিয়া আমার কোনও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রয়োজন পূরণের কথা তো কোনদিন মনে উদিত হয় নাই যে-যে প্রতিষ্ঠানে ঘুরিয়াছি তাহার বিস্তৃতি আনিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি সেই অপরাধে আমি সকল প্রতিষ্ঠান হইতে একরূপ বিতাড়িত —তোমার মঠ হইতেও। তোমার মঠ তুমি দেখিবে, আমি কে? সে কথা ঠিক। তবুও চোখের সামনে ইহার সঙ্কট দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি নাই। দেশবন্ধু দাসের কংগ্রেসও আমাকে একদিন বরদাস্ত করে নাই। তোমার মঠের বর্তমান ট্রাস্টীগণ (কয়েক জন ছাড়া) আমাকে বরদাস্ত করিল না। আমি ট্রাস্টী হইবার যোগ্য নই—কেননা গুরুগিরিতে বিশ্বাসী নই, সন্ন্যাস-কৌলীন্য আমি বুঝি না, মানুষে মানুষের ভেদ আমাকে পীড়া দেয়। বুজ-রুজা দেদনা লইয়া তোমার চরণতলে আমি শরণাগত। আজও মঠে যাই না। কুমার কলিকাতা ঘুরিয়া আসে, যাহে যায়। কেবল অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদনটায় খসড়া করে। বৈশাখের জন্য 'ভগবান বুদ্ধ ও ভগবান শংকরাচার্য' লিখি, কুমার প্রেসে দিয়া আসে। বীরেনবাবুর প্রুফ সহ এনভেলাপ আসে।... প্রথমে মঠে সংস্কার চাহিয়াছিলাম তারিণীবাবুকে আশ্রয় করিয়া। তাহা হইল না। পরে চাহিয়াছিলাম ট্রাস্টী হইয়া ভিতর হইতে ধাক্কা দিয়া সংস্কার করিতে। উহারা তাহা দিলেন না। নিজেদের উচ্ছৃঙ্খলতা চালা রাখিবার জন্যই আমাকে ঢুকিতে না দেওয়ার প্রচেষ্টা। কাজেই সংস্কার করিতে হইলে বাহির হইতে ধাক্কা দিবার পথ উহারা করিয়া দিলেন। মঠের প্রতি ঠাকুরের প্রতিটি অক্ষরের দায়িত্ব আছে। উহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। উগরা ২০ মাসের কাল মিটাইয়াছে, আক্রোশের বশবর্তী হইয়া চরম শাস্তি দিয়াছে। আমাকে যাহে পাইয়া ছাড়িবে কেন? দাপরধি হইতে ধারার আরম্ভ, ট্রাস্টী কমিটীর রাজে তাহার পরিসমাপ্তি। ঠাকুর ভালই করিয়াছে। ট্রাস্টী হইলে তাহাদের কৃত দোষরাশির অংশীদার হইতে হইত। আমার সার্বজনীন কীর্তনের উপর অন্তরিতা বর্তাইত। কর্তৃত্ব আমার জন্য নয়। বুকের রক্তে পুষ্ট কংগ্রেসও একদিন বাহির করিয়া দিয়াছিল। তখন কংগ্রেস ছিল সি আর দাস ও সতীন সেনদের হাতে। সেখানেও সেদিন স্থান হয় নাই সব constitution-ই steel-frame উহার মধ্যে জীবন্ত বিপ্লবী মানুষের স্থান হয় না ওই এপিল

ঠাকুর, তুমি নিজ শ্রীমুখে শুনাইয়া দিয়াছ, 'শরৎ, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন, জগদম্বা অন্তর্যামী রূপে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছেন, তাহা কি জান না'? প্রতি পদক্ষেপে তাহা সারাজীবন অনুভব করিয়াছি। এত বিচিত্র বিষম ঘটনার সমাবেশ আমার জীবনে, আমি কি পথ পাইতাম, আজও অক্ষত শরীরে চলিতে পারিতাম, আমার মাথা কি থাকিত যদি না তুমি আমার বুদ্ধির গোড়ায় থাকিয়া প্রেরণা দিতে? ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—ওগো সবিতার বরণীয় পুরুষ আমার নিত্যগোপাল, আমার বুদ্ধির প্রেরণা-দাতা, আমার বুদ্ধির লয় হউক। তোমার বুদ্ধিই আমার বুদ্ধি হউক। ওগো আমার আমি, তুমি থাক আমার সব কিছু ব্যাপিয়া। রমাপতিবাবু আনেন 'আপোষে'-র কথা লইয়া। চরম শাস্তি দেওয়ার পর আলাপ আলোচনার অবসর নাই, ট্রাস্টী নিযুক্ত হইবার পূর্বে আলোচনা হইলে জানাইত। 'গরু মেরে জুতো দান' চলে না। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু 'মমতাময়ী নিত্যগোপাল' পুস্তিকায় নাকি সমালোচনা প্রকাশ করিলেন। ঐ বই যে শতাধিকী কমিটী কর্তৃক প্রচারিত? এক বৎসর পূর্বে তাঁহারা কোথায় ছিলেন? অচিন্ত্যবাবুর নিত্যগোপালকে লইয়া লেখার প্রতিবাদ করিবার শক্তি নাই, আছে ঘরের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার? তারিণীবাবু ও তুলসীবাবু ভোট দানে বিরত ছিলেন। আমার পক্ষে ভোট দিয়েছেন আশুবাবু, খগেনবাবু, রমাপতিবাবু ও নীলরতনবাবু। নৈতিক জয় (moral victory) আমার হইয়াছে। আমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন ভাস্করেশ্বরানন্দ, হরিস্বরূপানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, কালীপদানন্দ, ভূলাবাবু ও নরেনবাবু পূজারী। তারিণী-

বাবু বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন। নরনারায়ণ আশ্রমের ট্রাস্টী কাহারা? যাহারা আমার সাধনার পথে বুকের রক্ত দিয়াছে, তাহাদের স্থানে ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে হইবে মানুষের যে অবস্থা, তাহাতে হয়তো উহারাই ousted হইতে পারে বক্তৃতা দিয়া অন্যে যখন সম্মান পায়, তখন বোঝা হই বা না হই, কেন আমরাও বক্তৃতা দিব না? অশ্বিনীবাবু গলায় হাত দিয়া মানুষের সঙ্গে পথ চলিতেন কেউ কেউ বলিত ইহাতে আর মাতব্বরী কি? গলায় হাত দিলেই হয়। মানুষের গলাও আছে, তোমার হাতও আছে—দিলেই তো হয় হাত দিবার যোগ্যতা লাগে! বোঝা না হইয়া মানুষ খরচদাতা করিতে চায়—ইহা বিড়ম্বনা। রেণু ২টার পর বাহির হয়, ফেরে ৬টার পর। ৪পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে ···আমার প্রাণটা রেণু প্রভৃতি নেয়—ইহাই তো আমি চাই অমি যেরকম করিয়া সকলকে বুকের মধ্যে রাখিয়াছি, তেমন বুক ইহাদেরও হউক—ইহাই আমার কামনা ২৭ এপ্রিল

নিত্যগোপাল, যীশু আমার, বিশ্বের 'sin' (পাপ) তুমি নিজ জীবনে ভোগ করিয়া তুমি crucified হইলে, বিশ্বকে পাপমুক্ত করিলে। উইলিয়ামস্ সাহেব তোমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'Here is my Jesus'; বিশ্বের লাঞ্ছিত মানবের লাঞ্ছনার মূর্ত বিগ্রহ তুমি যীশু, God the son, মেষীনন্দন। তুমি ক্ষমার মূর্তি, প্রেমবিগ্রহ। তোমার flesh and blood পান করিয়া বিশ্ব নির্মল হউক, নিরাময় হউক। 'Father, father, forgive them, they know not what they do'—সমস্ত লাঞ্ছনার মাঝে মানুষ ততখানি সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল থাকিয়া পারে ও থাকা উচিত, তুমি তাহার দৃষ্টান্ত তোমার জয় হউক। আজিও মঠে যাই নাই। নীলু ও অতীনবাবুর কাছে রেণু পোস্টকার্ড দেয়। ১লা ৩৸৹ টায় এখান হইতে রওয়ানা হইব, বাসস্টাণ্ডে যেন উহারা থাকে। ৩৸৹ টায় হরিদাসীর ওখানে যাই।··· পত্রিকার টাকা দেয়। যাওয়াআসির ভাড়ার কথা বলি। সেখান হইতে মন্নুর ওখানে যাই।···এখানে যাহারা থাকিবে তাহাদের আমার মধ্য দিয়াই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে হইবে, আমার বাহিরে কাহারও সঙ্গে কোনও সম্বন্ধের আত্মিকতা চলিবে না। যে সব শিশু আসিবে, তাহাদের অভিভাবক আমি। তাহাদের সাংসারিক অভিভাবক তাহাদের জন্য কিছু করিতে চাহিলে সকলের মধ্য দিয়াই তাহাদের জন্য যাহা কিছু করিতে হইবে। দুই স্তরগোপীর মাঝে কৃষ্ণ ইহাই সমন্বয়ীকরণের কৌশল। 'They must complete, by excluding, each other'—Broglie দুপুরে খাইতে বসিয়া ইহা আলোচনা হয়। আমার সঙ্গে নিত্যগোপালের যে সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধ তিনি স্বীকার করিয়াছেন সেই দিকে চাহিয়া আমার চলিয়া যাইবার পর আমাকে ঠাকুরের বামপাশে রাখা চলিতে পারে। "আমাকে রাধারূপে বামে রাখিয়া তিনি কৃষ্ণরূপে আমাকে দর্শন দিয়াছেন"—এ সমস্তই ঠাকুরের প্রকট কালে দেখা। ইহা তাঁহার কাছে আমি বলিয়াছিও। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যখন তখন যার তার কাছে ইহা বলিও না'। মোটা উজ্জলকারত্বের সর্ববিধ ভার, অর্থসংগ্রহ এবং অর্থব্যয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অধিকার রেণুর থাকিবে। আয় সম্পূর্ণই তাহার, তবে উহাদ্বারাই সে নরনারায়ণ আশ্রমের সেবা করিবে, শ্রীনিত্যগোপালের সেবাই করিবে আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ বাহিরে খরচ করিতে পারিবে না। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন উহাদ্বারাই মিটাইবে ৮ই এপ্রিল

শ্রীনিত্যগোপাল, আমি আমাকে অতিক্রম করিয়া, ডিঙাইয়া, উর্ধ্বে উঠিয়া তোমাতে স্থিত হইব, তবেই না আমার সত্তা চৈতন্য আনন্দ সার্থক হইবে? আমার জীবন তোমাকেই প্রতিপাদন করুক, তুমিই আমার পরম অর্থ হও। আমি তোমাকে ছায়ার মত অনুসর্পণ করিব, তোমার আনন্দ পূরণত্ব খুঁজিয়া যাউক। তোমার দেহই আমার দেহ, আমি বিদেহী, তোমার প্রাণই আমার প্রাণ, আমি অপ্রাণ, তোমার মনই আমার মন, আমি অমনা, তুমিই আমার অহং, আমি অনহম্। আমাকে এমন করিয়া তোমার জীবনে এক করিয়া লও। আমি তুমি বলিয়া যাইব, ওগো আমার 'আমি'।

ব্রহ্মসূত্র সমন্বয় ভাষ্যের সহজীকরণ

। শ্রীসত্যব্রত ঘোষ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাহাদের পক্ষে মহালক্ষ্মীর স্তরের সাধনায় আটকাইয়া না থাকিয়া ঐ স্তর অতিক্রম করিয়া মহাসরস্বতীর স্তরে পৌঁছান সম্ভব হইয়াছে এক কথায় অবিদ্যার সর্ব অঙ্গের সমন্বয় দর্শন লাভ হইয়াছে তাহাদের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকার হয়। মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান আছে। পূর্ব মীমাংসা দর্শন সমাজ তৈয়ারীর একটি ব্যবস্থা। আর্যেরা এই ভাবে সমাজবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া ছিলেন। সাংখ্য দর্শনে অন্য আর এক প্রকার সমাজ তৈয়ারী ব্যবস্থার কথা বলিয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী নামক গ্রন্থে যে অসুর সমাজের উল্লেখ আছে সেই অসুর সমাজের ভিত্তি ছিল এই সমাজ-ব্যবস্থা। আরবদেশে মহামতি হজরত মোহাম্মদের নেতৃত্বে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার ভিত্তি হইল সাংখ্যমত। বৈশেষিক দর্শনে অন্য আর এক প্রকার সমাজ তৈয়ারীর কথা বলা হইয়াছে। রামায়ণ বর্ণিত লঙ্কা দেশের রাজা রাবণ যে সমাজ তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তি ছিল বৈশেষিক মতবাদ। বর্তমান কালে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে সমাজ ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা বৈশেষিক-বাদের আধুনিক রূপ। ন্যায়দর্শনে অন্য আর এক প্রকার সমাজ তৈয়ারীর কথা বলা হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত রাম রাবণের যুদ্ধের পর রামের নেতৃত্বে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার ভিত্তি ছিল ন্যায়দর্শনের মতবাদ। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ দর্শনেও সমাজ তৈয়ারীর একটি ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে—বর্তমান কালে রুশ এবং চীন দেশে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধ মতবাদের আধুনিক সংস্করণ। এই প্রকার অবস্থায় যে একাধারে সর্বপথ এবং মতবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কেবলমাত্র তাহার পক্ষে প্রত্যেক পথের পরিচয়ের কে কোন্ অঙ্গে উপযুক্ত এবং কি ভাবে তাহাকে কোন্ কাজে লাগাইলে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত না হয় তাহা বোঝা সম্ভব। প্রত্যেক পথের পালকেরা একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট এই প্রকার অবস্থায় তাহাদের সকলকে যদি এক যোগে কাজে লাগাইতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেকের চলার পথকেই কিছু বদলানো প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যিনি সর্ব পথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নহেন তাহার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভবপর নহে। একাধারে পূর্ব মীমাংসা দর্শন সাংখ্য দর্শন বৈশেষিক দর্শন এবং ন্যায় দর্শন এবং বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ তিনি ঋষিত্বের আখ্যা পাইবার যোগ্য। অন্য পক্ষে একাধারে রাজযোগ পূর্ব মীমাংসা দর্শন সাংখ্যদর্শন বৈশেষিক দর্শন ন্যায় দর্শন এবং বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ তিনি যোগেশ্বর আখ্যা পাইবার যোগ্য। এই কারণে সমন্বয় বস্তুই হইতেছে ব্রহ্মবস্তু এবং তাহা মহা সরস্বতীর স্তর অতিক্রম করা না হইলে পাওয়া সম্ভব নহে।

পূর্বোক্তমের টানে পড়িবার পর তাহার কাজের সঙ্গী হিসাবে যাহাদের মহাসরস্বতীর স্তর পর্যন্ত আসা সম্ভব হইয়াছে তাহাদের পক্ষে রাজযোগ বিষয়ক কর্ম করা সম্ভবপর না হওয়ার হেতুতে তাহাদের পক্ষে পুরাপুরী সমন্বয়ধর্মী হওয়া সম্ভবপর নহে। এই প্রকার ব্যক্তিদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকার হইয়াছে কিন্তু তাহারা ব্রহ্মবস্তু নহেন। এই প্রকার অবস্থায় যোগেশ্বর-এর সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে ঋষিত্বলাভের পক্ষে পুরাপুরী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব পর হয় না।

গীতার ভাষায়—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্দ্ধর পার্থ বর্ত্তমান সেই খানে ধ্রুব বিজয় ধ্রুব নীতি এবং ধ্রুব শ্রী পুরুষোত্তমের ভাষ্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একাধারে সর্ব্ব জড় সম্বন্ধে জ্ঞানী, পক্ষান্তরে পুরুষোত্তম একাধারে সর্ব্ব জড় এবং অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তি। শ্রীনিত্যগোপালের ভাষায়—'পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান—সর্ব্ব জড় এবং অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান'।

ঈশ উপনিষদের ভাষায়—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে।

একাধারে বিদ্যা এবং অবিদ্যার যাহারা অধিকারী তাহারা অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু জয় করে এবং বিদ্যাদ্বারা অমৃত আস্বাদন করে এই প্রকার ব্যক্তিরাই যোগেশ্বর। কিন্তু যেহেতু যোগেশ্বরের উপস্থিতি সর্ব্ব সময়েতে থাকা সম্ভবপর নহে এবং যেহেতু যোগেশ্বরের উপস্থিতি না থাকলে কেবল মাত্র ধনুর্দ্ধরের দ্বারা সমস্যার দুই সমাধান সম্ভবপর নহে সেই হেতু আচার্য্য শংকর বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে বিপ্লব-বাদের কথা বলিলেও বিপ্লববাদের পথে যাহারা মহা সরস্বতীর স্তরে শিক্ষা পৌঁছাইয়াছেন, তাহাদিগকে ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের পরমার্থিক মূল্য দিয়া যান নাই। তিনি বিপ্লববাদের কথা বলিলেও তাহার অনুগামীদের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান পাইবার জন্য রাজযোগ গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলি যোগ-দর্শনের পথে যে উচ্চতম অবস্থা পাওয়া যায় আচার্য্য শংকরের মতে তাহাই শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। আচার্য্য শংকরের এই মতবাদে এই দেশের বৈষ্ণব সমাজ মানিয়া নিতে পারেন নাই বৈষ্ণবদের মত হইল ষটচক্র ভেদ করিয়া যাহার পক্ষে উচ্চতম অবস্থায় যাওয়া সম্ভব হইয়াছে তিনি যদি আবার সেই অবস্থা হইতে নামিয়া আসিয়া এই জগতের কাজে লাগিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠতম অবস্থা পাইয়াছেন বলিতে হইবে। এক কথায় এই দেশের বৈষ্ণব সমাজের লোকেরা তন্ত্র সাধনার পথের অনুসরণ ব্যবস্থার পক্ষপাতী। তন্ত্র সাধনার পথে ষট চক্র ভেদের পর নামিয়া আসিবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে উচ্চতম স্তর হইতে নামিয়া আসিতে হইলে মহাকালী মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতীর এই তিন ধাম অতিক্রম করিয়া নামিয়া আসিতে হইবে। যদিও এই কথার সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের কথার অনেক মিল আছে তাহা হইলেও উচ্চতম স্তর হইতে নামিয়া আসার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে রাষ্ট্রবিপ্লবের কাজকে গ্রহণ করা হয় নাই। এইখানে বেদান্তের সঙ্গে তন্ত্র-শাস্ত্রের তফাৎ। যেহেতু রাষ্ট্রবিপ্লবের কাজকে বৈষ্ণবেরা সাধনার অঙ্গ হিসাবে গণনা করে নাই সেইহেতু প্রচলিত বৈষ্ণবদের পথ দ্বারাও ভারতবর্ষকে পরাধীনতার হাত হইতে বাঁচান যায় নাই এবং ঐ মতবাদদ্বারা এই দেশের স্বাধীনতাও আনা সম্ভব হয় নাই। বৈষ্ণবদের সাধনার পথও ব্যক্তি-গত আধ্যাত্মিক মুক্তি পাইবার পথে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আচার্য্য শংকরের মত এবং বৈষ্ণবদের মতের মিল না থাকিলেও ঐ দুই দলের সাধকদের আসল কথা হলো আত্মজ্ঞান পাইতে হইবে।

ঈশ উপনিষৎ কথিত একই সঙ্গে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই গ্রহণ করা হইলে অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু জয় এবং বিদ্যাদ্বারা অমৃত আস্বাদন করিবার কথা বলা হইয়াছে। তাহা তাহারও পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

পতঞ্জলি যোগের পথে ষটচক্র ভেদ করিয়া সর্ব্ব সময়তে যোগে নিরুদ্ধ থাকা অথবা তন্ত্র শাস্ত্র-কথিত ষটচক্র ভেদ করার পর সেখান হইতে নামিয়া আসা রূপ যে দুই পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও পক্ষেই একই সঙ্গে বিদ্যা এবং অবিদ্যার সকল শাখা সম্বন্ধে জ্ঞানী হওয়া সম্ভবপর নহে আমাদের এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগের পথে ষটচক্র ভেদের পর সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া ছিলেন, এমত অবস্থাতেও তাঁহার পক্ষে টাকা ছুঁইলে হাত বেঁকিয়া যাইত যদি কাহারও পক্ষে একই সঙ্গে বিদ্যা এবং অবিদ্যার উপাসনা করিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে যোগের পথে হৃদয় গ্রন্থি অবধি যাইবার পর সেখান হইতে মহাকালীর স্তরের তম, মহালক্ষ্মীর স্তরের রজ এবং মহাসরস্বতীর স্তরের সত্ত্বের সহায়তায় নামিয়া আসা প্রয়োজন। আমাদের এই যুগে উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের

বাধক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—যোগের পথে হৃদয় গ্রন্থি পর্যন্ত যাইবার পর আরও উপরে যাইবার কথা বলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আপত্তিতে আর উপরে যান নাই এই অবস্থার পর পূর্ব মীমাংসা ভিত্তিক কর্মের সহায়তায় নামিয়া আসিবার চেষ্টা চলিয়া ছিল তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই জাতীয় লোকদের পক্ষে সমাজ বিপ্লবের নেতা হওয়া সম্ভব শ্রীঅরবিন্দও ঐ পথের পথিক ছিলেন তিনি যোগের পথে গ্রন্থি ভেদের পর সেখান হইতে ভগবতীর দ্বারা মহাকালী এবং মহালক্ষ্মীর স্তর অতিক্রম করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে মহাসরস্বতীর স্তর অতিক্রম করা সম্ভাপর হয় নাই। ফলে তাঁহার পক্ষে সক্রিয় রাজনীতিতে আসা সম্ভব হয় নাই।

এই প্রকার অবস্থায় এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে যোগের পথে হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ করার পর সেখান হইতে রাজনৈতিক কর্মের উপযুক্ত হইয়া নামিয়া আসা সম্ভব নহে। সর্ব দেবতাদের তেজ হইতে দেবী দুর্গার উৎপত্তি হইয়াছিল এই কথা আমরা চণ্ডী গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি। সর্ব দেবতাদের তেজের অর্থ হইল দেবী দুর্গার দেহে বহু দর্শনের প্রধানেরা একীভূত হইয়াছিল বর্তমান সময়ে সর্ব মতবাদের প্রাধান্য এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে এই প্রকার অবস্থায় তাহাদের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়ধর্মী ব্যক্তি হইতে গেলে তাহার পক্ষে রাজযোগের ষট্‌চক্রের মাত্র এক চক্র ভেদ করার পর সর্ব মত-ভিত্তিক কর্মের সহায়তায় সেইখান হইতে নামিয়া আসা প্রয়োজন। এই যে সমন্বয়ধর্মী ব্যক্তি তাহার পক্ষে সর্ব মতবাদের প্রধানদের একটি সংগঠনের ভিতর নামিয়া কাজ চালানো সম্ভব। সর্ব প্রধানদের সাহায্যে নির্ভর এই যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাহার দ্বারা সহজেই রাষ্ট্র চালান সম্ভব। কাহারও দেহে রাজযোগের মাত্রা ছয় ভাগের এক ভাগের বেশী থাকিলে তাহার পক্ষে রাজনৈতিক কর্মের উপযোগী পূর্ণ সমন্বয়বাদী হওয়া এই যুগে সম্ভবপর নহে।

গীতায় কর্মের কৌশলকে যোগ বলার দ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে। বর্তমান কালে শ্রীনিত্যগোপাল এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন—যদিও তিনি নিজে রাজযোগের সর্ব স্তর সহজে অতিক্রম করিয়া ছিলেন তাহা হইলেও তিনি তাঁহার কোন শিষ্যকে রাজযোগে যাইবার পরামর্শ দেন নাই। তিনি তাহার সঙ্গে ভক্তি যোগে যুক্ত থাকিয়া মহাকালী মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী স্তর অতিক্রম করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সংসার আশ্রমের পরে কুমার যোগ পরবর্তী কালের স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত নিত্যগোপালের কাছে সংসার ত্যাগী হইবার কথা বলায় তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য বৃন্দাবন যাইয়া থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং এই ভাবে তাঁহাকে মহাকালীর স্তরের সাধন শিখাইয়াছেন। বৃন্দাবনে ছয় সাত মাস থাকার পর সেখান হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়া মহালক্ষ্মীর স্তরের সাধনায় নিষ্কিত করিয়া তুলিবার জন্য সংসার আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন পরে কুমার বরিশালে শিক্ষকতার কাজে আট বছর নিযুক্ত থাকার ফেরত দিয়া মহালক্ষ্মীর স্তরের সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পর মহাসরস্বতীর স্তরের সাধনার জন্য তাহাকে বরিশাল ছাড়িতে হইয়াছে। মহাসরস্বতীর স্তরের সাধনার পক্ষ হিসাবে তিনি বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য লিখিয়াছেন। এই ভাবে তাঁহাকে ঐ স্তর অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহার পর জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বিপ্লববাদী রাজনৈতিক কর্মীদিগকে শিক্ষিত করিবার পথ হিসাবে শ্রীনিত্যগোপাল দেবার কথা ও পথই হইতেছে সর্বোত্তম পথ, তাহা হইলেও অন্নের নিদন সমস্যার সমাধান এইপথে সম্ভবপর হয় নাই। এই যুগে অন্নের নিদন সমস্যার সমাধান হইয়াছে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যাহারা ভক্তি যোগে অথবা অভক্তি যোগে যুক্ত হইয়াছে তাহাদের সহায়তায়। গান্ধীজীর জীবনে এই বিজাতীয় তত্ত্বের সমন্বয় দেখিয়া স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ গান্ধীজীকে নিত্যগোপালের দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া মানিতেন। গান্ধীজীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তাঁহার জীবনে রাজযোগের মাত্র ছয় ভাগের একভাগ বর্তমান ছিল। পূর্ব মীমাংসা ভিত্তিক কর্মের ছয় ভাগের একভাগ তিনি

গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সাংখ্য দর্শনে দুঃখের কথা বলে সেই সাংখ্য দর্শনের দুঃখ তিনি নিয়াছিলেন তবে তাহা ছিল অহিংস ভাবে। এক কথায় সাংখ্য দর্শনের ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন যে বৈশেষিক দর্শনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে খুব উঁচু আসন দেয়, গান্ধী তাহাও কতক পরিমাণে নিয়াছিলেন। তবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা বড় বড় কল কারখানার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি ছিলেন কুটির শিল্পে বিশ্বাসী এক কথায় বৈশেষিক দর্শন ভিত্তিক কর্মের ছয় ভাগের এক ভাগ নিয়াছিলেন যে বৌদ্ধ দর্শনের আধুনিক রূপ কমিউনিজমে সব কলকারখানা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চালাইবার পক্ষপাতী তাহারও কিছু নিবার পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধীজী তাঁহার বিবেচনায় যে সব শিল্প পণ্য ছোট ছোট কল কারখানায় তৈয়ারী সম্ভবপর নহে তাহা সরকারী নিয়ন্ত্রণে চালিত বড় বড় কল কারখানায় তৈয়ারী করা উচিৎ এক কথায় বৌদ্ধমতবাদের ছয় ভাগের একভাগ গ্রহণ করিবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। যে ন্যায় দর্শন ভগবান রামচন্দ্রের চলার পথকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি হইয়াছে গান্ধীজী তাহারও কিছু নিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রাম ভক্ত, রাম রাজত্বে বিশ্বাসী কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালাইবার বেলা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রধান হিসাবে রাজাকে রাখিবার মতে বিশ্বাসী ছিলেন, এক কথায় ন্যায়দর্শন ভিত্তিক ব্যবস্থার ছয় ভাগের এক ভাগ তিনি নিবার পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মহাকালীর স্তরের বিপ্লবীরা ছিল, ছিল মহালক্ষ্মীর স্তরের গঠনকর্মীরা, ছিল মহাসরস্বতীর স্তরের রাজনীতিজ্ঞরা, ছিল সাংখ্য দর্শনের আধুনিক রূপ ভিত্তিক মুসলমান সমাজ, ছিল বৈশেষিক দর্শনের আধুনিকরূপ ভিত্তিক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং ব্যবসায় দল, ছিল ন্যায় দর্শন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হিন্দু মহাসমাজ কর্মীরা, ছিল বৌদ্ধ ধর্মের আধুনিক রূপ ভিত্তিক সমাজ তান্ত্রিক ও কমিউনিষ্টদের দল, ইহা ছাড়া ছিল সমন্বয় ধর্মে বিশ্বাসী গান্ধীবাদী কর্মীরা, ছিল ব্রহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী বর্তমান যুগের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাবলম্বী আমিটাই মতবাদে বিশ্বাসী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু পণ্ডিত জহর লাল নেহরু প্রভৃতি নেতারা।

উপরি উক্ত সব সমন্বিত দলের সহায়তায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসিয়াছে। একই সঙ্গে বিদ্যা এবং অবিদ্যার উপাসনা হইতেছে উপনিষদ এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয়। একই সঙ্গে বিদ্যা এবং অবিদ্যার সমন্বয় যে বস্তুতে তাহাই হইতেছে ব্রহ্মবস্তু।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া

॥ শ্রীহরিরঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

ভারতের আকাশ তখন তমসাচ্ছন্ন। দিকে দিকে অধর্মের ধ্বজা উড্ডীন—ধর্ম গহন গুহায় মুখি অবলুপ্ত। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য গোলোক হ'তে অবতীর্ণ হন তাই শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়রাজ্যে। অল্পকালের মধ্যে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে আবির্ভূত হন সনাতন মিশ্রের আলয়ে—সেই পুণ্য দিন চৌদ্দশ পনের শকাব্দের শুক্লা পঞ্চমী। ধীরে ধীরে এই লাবণ্যময়ী বালা শরতের শুক্ল পক্ষের শশীকলার ন্যায় রূপের পাপড়ি মেলে ফুটে উঠেন। কবি পুরোত্তম কালিদাসের ভাষায় বলা যায়ঃ—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লক্ষ্যেষয়া চান্দ্রমসীব লেখা
পুপোষলাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নাস্তরাণীব কলান্তরাণি ॥

গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মাঝে গৌরাঙ্গ-জননী শচীদেবী এই বিদ্যাৎবর্ণা কন্যাকে দেখে বিমোহিতা হন। লক্ষ্মীস্বরূপাকে আপন আলয়ের গৃহলক্ষ্মী করার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেন

ব্যাকুলিতা। তাই কাশীনাথ মিশ্রকে শচীর সনাতন ভবনে রক্ষার জন্য এই প্রস্তাবে শচীর শঙ্খের রেখা হাতে পান অন্তর্যামী লক্ষ্মী-নারায়ণের দিব্য ঘটে মধুময় যামিনীতে সনাতনের পুণ্যাঙ্গনে।

তবে লক্ষ্মী অন্তর্ধান প্রভুর চরণে
মালা দিয়ে তুলিলেন আত্মসমর্পণে। —শ্রীচৈতন্য-ভাগবত

'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'—তাই বুঝি অনাবিল আনন্দ একদিন অকস্মাৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন থেকে বসুন্ধরার মত উবে যায় ধরিত্রীর বুকে ধ্রুবধরায় লাঞ্ছিতা ধরিত্রী হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে দেখেন প্রাণের দেবতা অন্তর্হিত —কেঁদে উঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ—

যুক্তি অভাগিনী সকল রজনী জাগিল প্রভুরে লৈয়া
প্রেমেতে বান্ধিয়া ঘোরে নিদ্রা দিয়া প্রভু গেল পলাইয়া:
—লোচন দাস

গৌরাঙ্গ-জায়ার আকুল আর্তনাদে গগন পবন ব্যাকুলিত হয়ে উঠে নিখিল প্রকৃতিও যুক্ত করায় ফেটে পড়ে সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে যান শ্রীচৈতন্য। তাই প্রিয়াজীর প্রাণ বিহঙ্গ পক্ষ মেলে দে দিকে উড়ে যেতে চায়। কিন্তু শক্তিময়ী অচিরেই অন্তরে শক্তি ফিরে পান। বিশ্বের কল্যাণে জীব উদ্ধারে তিনি উৎসর্গ করেন প্রাণের দেবতাকে। অতঃপর নবদ্বীপের আপন আবাসে বসে নাম জপে ব্যাপৃত থাকেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া নব বালা হাতে লয়ে জপমালা
কণ্ঠে কহে জপে হরিনাম।
নবীনা যোগীনী ধনী বিরহিণী বাঙ্গালিনী
প্রণময়ে নীলাচল ধাম।
—বলরাম দাস

অতঃপর গত হয় সৌরাঙ্গ রাজের জননী অন্নপূর্ণা দর্শনে গৌড়রাজ্যে। গঙ্গার এ কূল ও কূল ধরে জনস্রোত সেই স্রোতে ডুবিয়ে মাধবদাসের গৃহ-প্রাঙ্গণও হয় প্লাবিত। পরদিন প্রভাতে মিশ্র-নিকেতনের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ান ভক্তিমতী জনকয়েক গৌড়ীয় সন্ন্যাসী সকলে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ এক রামা চৈতন্যদেবের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন পুষ্প লতিকার ন্যায় আর্তি নিবেদন করেন, 'অবলা নারী আমি কি নিয়ে থাকব? দিয়ে যান দেবতা নিকৃষ্ট পূত-রেণু'। গৌরাঙ্গ গম্ভীর কণ্ঠে জানান, "আমি তো নিঃস্ব সন্ন্যাসী, কি চাও তুমি আমার কাছে?" তারপর প্রভু পাদপদ্ম থেকে খুলে পাদুকা দুখানি খুলে দিয়ে বিদায় দেন গৌরাঙ্গনার মাঝে।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন খাঁটি পাদুকা দুখানি আপন গৃহমন্দিরে। গৌরাঙ্গের প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে গৌরাঙ্গ-গৃহিণী পথহারা মানুষকে মুক্তি মার্গে প্রবাহিত করেন। তবু কিন্তু তিনি গৌড়ীয় সাহিত্যে উপেক্ষিতা আজ তাঁর অমৃত কাহিনী পরিবেশন করতে গিয়ে চিত্তবীণায় বুঝি বেহাগের সুর ধ্বনিত হয়।—

বিরাজিতা তুমি নও মা জননী কবিরাজ ভাবাশ্রয়ে
হয় গৌরাঙ্গী জীবন-সিন্ধুতে তুলেও না সুধা মন্থে।
পদকর্তারা বিদায়েতে শুধু প্রাণপদ্মের গন্ধ।
ওঁদের কৃপায় পিয়েছি তোমার অন্তর মকরন্দ
অন্তর দিয়ে ফুটায়েছ যাদো তত্ত্ব অবোধের আঁখি
কর এই দাসে তব পদ রজের অধিকার অনুগতী।

সূচীপত্র : উদ্বোধনভারত, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮০

১। সাধন-সাহিত্য বৈষ্ণবিক পতাকা ১
২। আমাদের কথা ২
৩। প্রার্থনাকালীন ভাবন ৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
৪। হিন্দি-প্রিয় বাঙালী ৯
শ্রী অসিত ভট্টাচার্য
৫। সমর্পণ (কবিতা) ১০
শ্রী গণেশ চক্রবর্তী
৬। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী—১৯৫৪ ১১
(৪৮)
৭। ব্রহ্মসূত্র সমন্বয় ভাষ্যের সহজীকরণ ২০
শ্রীসত্যব্রত ঘোষ
৮। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ২৩
শ্রী হৃদয় রঞ্জন ভাদুড়ী

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

কৃষাকে কৃষির মধ্যে উদ্বর্তিই উদ্বর্তির পূর্বতা। দেহগীন আত্মা যেমন অবাস্তব, কৃষিহীন কৃষ্টি উদ্ভাস্তও তেমনিই অর্থহীন। কৃষ্টিকে একত্র করিয়া পাওয়াই সাধনার চরিতার্থতা। সে সাধনা আছে মানুষের মনোভূমিতে। 'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the expolitation of man by man'

'Occasional Speeches' Radhakrishnan

—মানুষ কি করে শ্রেষ্ঠী হতে পারে, কি করে [illegible] দুঃখের ঘনো আত্মের শেষের দুঃখ করার কাছে ভিক্ষুক হতে পারে, তার খোঁজ পাওয়া মানুষের সাধনা।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। [illegible]
[illegible] ২.০০
[illegible]
[illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible]
[illegible]
৭। [illegible] ২·৭৪
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩·০০
মুণ্ডকোপনিষদ
৯। শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে ৩·০০
১০। খাদ্যের পূর্ণরূপ ০·৫০
১১। গীতালহরী ০·০৬
১২। উজ্জলভারত (পুস্তিকা) ০·৫০
১৩। মহাত্মাজী [illegible] সম্বন্ধে
পুরুষোত্তম-সৃষ্টি রবিতে আলোচনা ৩·০০
(গান্ধী-সাহিত্যনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২·০০

পাণ্ডুলিপি

[illegible] ২ [illegible]
[illegible]

*প্রতিভা রায়ের

[illegible] ১·০০
[illegible]
[illegible] ০·৫০
৩। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দ ৫·০০

শ্রীযুক্তা রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়ধর্মী শ্রীনিতাগোপাল ০·৬২
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ৩·০০
পপিউলার বুক কোং প্রকাশিত
৪। রবীন্দ্র-হৃদয় ৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পো: অশ্বিনীনগর, (তারা—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক

"এই বিশ্বই আমার মহাস্থা

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮০-৮১, ১৯৭৪ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ২৭-তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

আবেদন

= শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, নরনারায়ণ আশ্রম ও উজ্জলভারত সম্বন্ধে
ধরণী বাক্তিদের প্রতি =

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৮ বৎসর আগে এই বাগুইআটি গ্রামে নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের সেবাপূজা ও তাঁর সর্বসমন্বয়ের তত্ত্ব-প্রচার এই স্থানে আরম্ভ করার দুই বৎসর অন্তেই নিত্যধামে প্রয়াণ করেছিলেন। তাঁর আরব্ধ কাজগুলি হচ্ছে, তবে তাঁর তত্ত্বপ্রচারের মুখপত্র 'উজ্জলভারত' ও তাঁর লিখিত গ্রন্থানত্রয়ের ভাষ্যগুলির প্রচার-কার্য অর্থ ও লোকাভাবে মন্থরগতি। তাঁর পরিকল্পনামত একটি গ্রন্থাগার, একটি মেয়েদের সেলাইশিক্ষাকেন্দ্র ও দুইটি শিশুদের স্কুলও দীর্ঘ ১৬ ও ১০ বৎসর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। সামগ্রিক জীবন-ধর্মের প্রস্থাপক তাঁর লিখিত ভাষ্যগুলি সব প্রকাশিতও এখন পর্যন্ত হয় নি। বর্তমানে ছান্দোগ্যোপনিষৎখানি ছাপাতে প্রয়াসী হয়ে আপনাদের আবেদন জানাই যে, যিনি যেমন পারেন সাহায্য পাঠিয়ে নূতন জীবনচেতনাদ্বারা সমাজ গঠন-প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

আশ্রমের জন্য আরও একটী আবেদন আছে—আশ্রমের গৃহাদির কিছু সংস্কার সাধন করার ও রান্নাঘরের মেঝেটা পাকা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এজন্যও আপনাদের কাছে অর্থ বা প্রয়োজনীয় বস্তু সাহায্য প্রার্থনা করছি।

বিনীত

নরনারায়ণ আশ্রমের সেবক-সেবিকাবৃন্দ।

CALCUTTA UNIVERSITY

উদ্বোধন

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮০-৮১ বঙ্গাব্দ, খ্রী: ১৯৭৪ ২৭-তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

একশ উনিশ বৎসর আগে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম বেণীমাধব শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত। তিনি মাত্র সাতাশ বৎসর দেহে ছিলেন। যতদিন ছিলেন ততদিনও খুব সঙ্গোপনে দিন কাটিয়েছেন। সমাধিস্থ হয়েই তাঁর বহু সময় জীবনে ব্যয়িত হয়েছে, সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, বই পড়ে ও বই লিখে তাঁর স্বল্প জীবনের সময়টা কেটে গিয়েছিল। সেদিন তিনি যে ধারায় জীবন যাপন করেছিলেন বা যেসব কথা লিখে রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি প্রচলিত আচার আচরণ ও চিন্তাধারার সঙ্গে এমন বেমানান ছিল যে তাঁর সঙ্গোপনে জীবন যাপন করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাঁকে সেদিন বুঝবে কে? তাঁর অপূর্ব লাবণ্যময় দেহ-সৌষ্ঠব, তাঁর প্রাণের স্পর্শ, তাঁর সমাধি, তাঁর অনুধ্যান বিভূতি বহু লোককে আকর্ষণ করেছিল কিন্তু সমগ্র শ্রীনিত্যগোপাল যা, সেই তিনি ছিলেন একেবারে একক—একাকী। তাই তিনি বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে, 'বিবে, আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব'। পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্য শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে তাঁর তত্ত্বসহ উন্মোচিত করবার প্রাণপণ প্রয়াস করে বলেছিলেন, 'আমি তাঁর কাঁথার আবরণ তুলে ফেলব'। শ্রীনিত্যগোপাল নীরবে নিভৃতে দিন কাটিয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর লেখাগুলি তিনি তখনই ছাপাতে নির্দেশ দিয়ে রেখে ছিলেন এবং যদিও তাঁর শেষ সময়ের দিনগুলি তাঁর হুগলি ও নবদ্বীপ মঠে কেটেছিল এবং দেহরক্ষাও করেছিলেন তিনি হুগলি মঠে, তবু তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন যে তাঁকে যেন কলকাতায় তাঁর বালীস্থিত মঠে সমাধিস্থ করা হয় যেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করুন না কেন। শ্রীনিত্যগোপাল সঙ্গোপনে থেকেও জনসমক্ষে প্রচারিত হবার ব্যবস্থা যে তিনি করেছিলেন তার কারণ তাঁর জীবনযাপনের ধারা এবং তাঁর চিন্তাধারা উভয়ই ভবিষ্যতের জন্য। তিনি যখন তাঁর 'জাতিদর্পণ' নামক গ্রন্থে লিখলেন, "...সেইজন্য বলি সেই ব্রহ্মা নামক পরম বৃক্ষের ব্রাহ্মণ নামক ফলে যে পরিমাণে ব্রহ্মত্ব এবং ব্রহ্মতেজ আছে, সেই পরিমাণেই সেই বৃক্ষের ক্ষত্রিয় নামক ফলে, বৈশ্য নামক ফলে এবং শূদ্র নামক ফলে আছে। সেইজন্যই যদি ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে চারি বর্ণেরই সমত্ব। চারি বর্ণই ব্রহ্মপুত্র, চারি বর্ণেরই ব্রহ্মগোত্র, চারি বর্ণই ব্রহ্ম সংজ্ঞীয়, চারি বর্ণ ই ব্রহ্মার অঙ্গী, চারি বর্ণই সেই ব্রহ্মার আত্মজ। অতএব আমাদের বিবেচনায় চারি বর্ণের মধ্যে কেহই হেয় নহে, কেহই অবজ্ঞেয় নহে। চারি বর্ণের কারণান্বেষণ করিলে চারি বর্ণেরই এক কারণ বলিয়া চারি বর্ণ ই একেরই চারি প্রকার বিকাশ বলিয়া চারি বর্ণ ই এক বর্ণ, চারি বর্ণই এক জাতি।..."—তখন একথা প্রচার করবার চেষ্টা করলে কে বুঝত? আজই বা কজন বোঝে?

কিংবা শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর 'সর্বধর্মনির্ণয় সার' গ্রন্থে যখন লিখে গিয়েছিলেন, 'পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জানই পূর্ণজ্ঞান' কিংবা 'শিখাসূত্র ত্যাগে সন্ন্যাসী হবে কি? দণ্ড কমণ্ডলু ও কৌপীন ধারণে সন্ন্যাসী হবে

কি ? কতটুকু সন্ন্যাসী হও। সন্ন্যাসীর ত্যাগ আর্য ও আচরণ তোমাতে প্রকাশিত হউক। বিবাহের ত্যাগ না করিলে তোমার সন্ন্যাসের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না, দণ্ডকমণ্ডলু ও গৈরিক গৌপীনও তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারে না। কেবল বেশটাই সন্ন্যাস নয়। সন্ন্যাস মনে। সন্ন্যাসীর বেশধারণ অতি সহজ, কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া অতি কঠিন। প্রকৃত সন্ন্যাসীর বিবাহের ত্যাগেরই বা প্রয়োজন কি আর গৈরিক গৌপীন ও দণ্ডকমণ্ডলু ধারণেরই বা প্রয়োজন কি ?' কিংবা 'গৃহস্থাশ্রমে থেকে যিনি সন্ন্যাস রক্ষা করিতে পারেন তিনিই পাকা সন্ন্যাসী। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তাঁহারই বৈরাগ্য হইয়াছে। বৈরাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বৈরাগী সন্ন্যাসী যিনি তাঁহার আর সংসারে ভয় কি ?'—সেদিন কি এ কথাগুলি কেউ বুঝত না মেনে নিতে পারত ? আজই বা এসব কথা কজন বোঝে বা মানে ? কিংবা শ্রীনিত্যগোপাল যখন তাঁর 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে লিখলেন, 'এক দীপ হইতে বহু দীপ বিভাসিত হইলেও যেরূপ সেই এক দীপের কিঞ্চিৎ মাত্র কমে না, তদ্রূপ সেই একই প্রেমের অনন্ত বিকাশ হইলেও তাহার বিন্দুমাত্র কমে না,—তদ্দ্বারা তাহার বিন্দুমাত্র অতিক্রম হয় না। তাহা যেরূপ সেরূপই থাকে। একটী দীপ হইতে বহু দীপ প্রকাশিত হইলে, সেই একটী দীপ বহু ভাগে বিভক্ত হইলেও তাহা যেরূপ অবিভক্তবৎ রহে, তদ্রূপ বহু বিকাশদ্বারা প্রেম বিভক্ত হইলেও তাহা অবিভক্তবৎ রহে। সেইজন্য যদি সেই নিত্যপ্রেমের অনন্ত বিকাশ হইলেও তাহার নিত্যতার লোপ হয় না'—তখন তা কে বুঝেছিল আর আজই বা তা কজন বুঝছে ?

কিংবা শ্রীনিত্যগোপাল যখন তাঁর 'সাধনরহস্য' গ্রন্থে লিখলেন, 'পরমেশ্বরের যে আকার জন্য তাঁহাকে বাসুদেব বলা হয়, তাঁহার সে আকার নিত্য। যখন তিনি সেই আকারবিশিষ্ট হইয়াই অবতীর্ণ হন তখন তাঁহাকে বিভূতি বলা হইলেও তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। কারণ তখন তিনি পূর্ণই রহেন। তখন তিনি বিভূতি এবং পূর্ণ উভয়ই বটেন। নিত্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। গোপালতাপনী শ্রুতিমতে, নারায়ণোপনিষৎ মতে, অথর্বশিরোপনিষৎ মতে, মহাভারত মতে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে, ব্রহ্মপুরাণ মতে, কূর্মপুরাণ মতে এবং নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি সব মতে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ঐ সমস্ত শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে পরং ব্রহ্ম পরমেশ্বরই বলিতে হয়, তখন আকার যে নিত্য আধ্যাত্মিকতার শেষ মীমাংসাতেও, সেদিন তা কে বা মানত, আজই বা কজন মানে ? তাই শ্রীনিত্যগোপালকে সেদিন সাবধানেই থাকতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ—বিচিত্র এর ব্যাপক গভীর অনুভূতি উপলব্ধি—অতীন্দ্রিক বিচিত্র এত গভীরতা ব্যাপকতা সত্ত্বেও জাগ্রত জীবনে—সমাজ-জীবনে—এর চূড়ান্ত অনৈক্য অনস্বীকার্য। এর মর্মীয় ক্ষেত্রেই বা বৈচিত্র্য কত। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তাঁর ঐ 'জাতিদর্শন' গ্রন্থে লিখছেন,..... আর্যদিগের চরকসংহিতার শাস্ত্রানুসারে যাহা অবৈধ, শাস্ত্রানুসারে তাহাকেই বৈধ বলিয়া প্রমাণ করা যায়। একই বিষ্ণুসহস্রনামের ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ের অবস্থা বিশেষে গোমুখকে অপবিত্র এবং পবিত্র উভয়ই বলা হইয়াছে ঐ প্রকারে নানা আর্ষশাস্ত্রানুসারে সর্বজাতির বিভিন্নতা এবং অভিন্নতা প্রমাণ করা যায়। তবে ঐ প্রকার বিভিন্নতা এবং অভিন্নতা বুঝিবার ক্ষমতার প্রয়োজন। ...." অতএব দেখা যাচ্ছে বিচিত্র এই ভারতবর্ষের খুব সহজে তল পাওয়া যাবে না। যে ভারতবর্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই ব্রহ্ম বলছে, সে সমাজ-জীবনে জাতিভেদের বিষে জর্জরিত। এবং তা আজও বেশ ব্যাপকভাবে। এ জাতিভেদের আবার নানা রকম আছে। সমাজ যত রকম ভেদের বিষে জর্জরিত তাতে শুধু জাতিভেদ বললে সবটুকু বোঝান হয় না। এ দেশে ভেদবাদ শুধু জাতিতে জাতিতে নয়—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে ভেদ, ধনী নির্ধনে ভেদ, নরনারীতে ভেদ—সবরকই ছোট বড়র, ভেদ উপাদেয়ের ভেদাভেদির এক বিশ্রী পরিবেশ। এই ভেদবাদেরই চূড়ান্ত রূপ আজকের দিনের রাজনীতিতে। তাই এত জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যাত্মবাদের সম্পদ থাকতেও আজকের ভারতবর্ষ

যেমন অসুন্দর, দুর্নীতিপরায়ণ—এমন বুঝি বিশ্বের কোন জাতি নয়। শ্রীশ্রীনিতাগোপাল এক জায়গায় লিখেছেন, উদারতাও বটে। ভারতবর্ষের উদার হৃদয়ের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি উদার হতে গিয়ে নিজের দাঁড়াবার জিনটুকুও যে সে হারিয়ে ফেলেছে তার পরিচয়েরও অভাব নেই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আজও সে সচেতন নয়। এত দোষ ও দুর্দ্ধির অধিকারী হয়েও মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তি যে ধর্ম সেই ধর্মকে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ ধরে রেখেছে, বন্ধন বলে মনে করেছে; আজ তো ধর্মকে একেবারেই বাদ দিয়ে জগতের আশায় আকাশের দিকে সে তাকিয়ে বসে আছে। ধর্ম না করে কেউ জীবনে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে? পারে না যে সে কথা ভারতবর্ষ জানত বলেই উপনিষদ্ এক নিঃশ্বাসে বলেছেন, "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"—অবিদ্যাকে জেনে মৃত্যু অতিক্রম করতে হবে, বিদ্যাকে জেনে অমৃত পান করতে হবে। অবিদ্যা-ক্ষেত্র এই জগৎকে জানতে হবে, একে পরিপাক করে এতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে—তবেই না মৃত্যু অতিক্রম করে অমৃতকে পেতে পারা যাবে? তা কি ধর্মকে নিবিড় সঙ্গে না করলে সম্ভব হবে? তাই তো এই জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বেদান্ত উপনিষদ্ গীতা ভাগবত এতটুকু ছোট করে দেখেন নি। কিন্তু আগেই বলেছি বিচিত্র এই দেশ—তাই এই দেশেরই পণ্ডিতদের হাতে এই জগৎ নিন্দিত হয়েছে, একে হেয়, অবজ্ঞেয় করে ব্রহ্মজ্ঞানকে জগতের বাইরে টেনে নিয়েছে—তারই ফলে হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ কর্মকে বন্ধন বলে জানতে শিখেছে—শেষ পর্যন্ত আজ এই দাঁড়িয়েছে যে আজ সে তার রুটি রোজগারের ভিত্তি এই দৈনন্দিন কর্মটাকে যতটা বেশি সম্ভব ফাঁকি দিয়ে তার মরণের গহ্বর তৈরী করে চলেছে। পৃথিবীর কোন জাত এমন করে নিজের অস্তিত্বের ভিতকে ধূলিসাৎ করে না—কর্মকে তারা ফাঁকি দেয় না—পরম শ্রদ্ধায় সে দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদন করে। তাই তো আমাদের মত দুর্গতি আর দুর্নীতি পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। আবার ভেবে দেখলে দেখা যাবে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলার অভ্যাসের একটা সুফলে ভারতবর্ষ সকলকে যতটা হৃদয়ের মধ্যে সহজে নিতে পারে, সকলের কল্যাণের কথা যেমন করে ভাবতে পারে, বিশ্বের আর কেউ বুঝি তা পারে না।

এই যে আজ ভারতবর্ষের পদে পদে অসঙ্গতি, এই সকলকেই একটা সঙ্গতির মধ্যে, একটা সু সামঞ্জস্যের কাঠামোর মধ্যে রূপ দেবার কথা বলতে ও আচরণ করতে ১১২ বৎসর আগে এসেছিলেন শ্রীশ্রীনিতাগোপাল। জীবন্ত জীবনের মধ্যে বিপরীত বিরুদ্ধ যে যেখা মিলে মিশে আছে বলেই জীবনটা আছে এবং সেইজন্যই যে সেটা এমন রহস্যময় সুন্দর আর অশেষ তার এত বৈচিত্র্য আর বিপর্যয় নিয়েও—জেনে শুনেও যা ভারতবর্ষ ভুলে ছিল—শ্রীনিতাগোপাল তাঁর জীবনের আচরণ দিয়ে তাই প্রমাণ করে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যাকে দীর্ঘ বছর ভারতবর্ষ বিরুদ্ধ বিপরীত বলে মেনে নিতে না পেরে বাদ দিয়ে সহজ করতে চেয়েছিল জীবনের সাধনা, সেই বাদ দেবার ভুলের প্রতিক্রিয়া থেকে জাতিকে বাঁচাতে হবে এক সামগ্রিক সমন্বয়ের জীবন-চেতনার দ্বারা। তাই তো তিনি লিখেছেন, 'পূর্বজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্বজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান—সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জানই পূর্ণ জ্ঞান'। তাই তো তিনি লিখেছেন তাঁর সর্ব সমন্বয়ের কথা যা এই 'উজ্জীবন-ভারতে'র প্রথম প্রবন্ধে প্রতি মাসে ছাপা হচ্ছে। শ্রীনিতাগোপালের জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কেমন আশ্চর্যভাবেই বিপরীত তাঁর মধ্যে সহজ হয়ে গিয়েছিল।

মানুষকে আনন্দিত হতে হবে—এইটে মানুষের কামনা। ভগবান অনেক মালমশলা দিয়ে মানুষকে এ সংসারে পাঠিয়েছেন—সেই মালমশলাগুলি যথাস্থানে যথা মানে কাজে লাগিয়ে মানুষকে আনন্দিত হতে হবে। কাজটা যেমন সহজ, তেমনি কঠিন। কেমন করে আনন্দিত হব? মানুষ যখন সচেতনভাবে জীবন আরম্ভ করল তখন তার সামনে প্রশ্ন—পথ কোথায়? নিজের ভেতরের এবং বাইরের বিভিন্ন রকম চিত্তবৃত্তি ও পরিবেশ মানুষকে দিশেহারা করে। আবেগের সঙ্গে যুক্তিকে, ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে বিশ্ব-জীবনকে মিলিয়ে দেবে কে? এরা কি কেউ

বিরুদ্ধ, না এরা মিলে মিশে তৃতীয় একটা সুখময়তর অবস্থাকে জন্ম দিতে পারে? তার দৃষ্টান্ত দরকার। বহু নিন্দা প্রশংসার সাগর পার হয়ে সুদূর অতীত থেকে একটী মধুর মানুষের কত কত মধুর কথা ও কাহিনী আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তাঁর জীবনের বহু বিরুদ্ধ বিপরীত সহজ হয়ে মিশেছেন—তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। আবেগ কি করে কল্যাণধর্মী হয়ে ওঠে, ব্যক্তি-জীবন কি করে ব্যক্তি-জীবন থেকেও বিশ্ব-জীবন হতে পারে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ও শ্রীকৃষ্ণ-কথা তারই নিশানা দিয়েছে—এই কৃষ্ণ-কথাই বর্তমান কালের আবেষ্টনে বর্তমান কালের ভাষায় রূপ নিল শ্রীশ্রীনিত্যগোপালে।

অর্জুনকে কৃষ্ণ কিভাবে জীবন যাপন করতে কিছুতেই দিলেন না—অর্থাৎ পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবন বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত ভালমন্দ দিয়ে মানুষ সম্পূর্ণ নয়, ব্যক্তিগত মুক্তি সত্যিকারের মুক্তি নয়—এটা বলবারই নামান্তর মাত্র। কৃষ্ণের এই কথাকেই শ্রীনিত্যগোপাল আজকের ভাষায় বললেন,—আমি ব্রহ্মবিদ এটা যেমন সত্য, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সত্য আমি বিশ্বনাগরিক। বিশ্বকে বাদ দিয়ে ব্রহ্ম হওয়াও যায় না। অর্থাৎ একবার ঘরে আমাকে অন্তর্মুখী গতিতে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে, আর একবার ঘরে বহির্জীবনে আমাকে বিশ্বের সাথে একাত্ম হতে হবে। কোন একটা অবস্থা দিয়ে মানুষ গঠিত নয়, তাই কোন একটাকে আঁকড়ে ধরেও মানুষ আনন্দিত হতে পারে না, সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনায় আমাকে জড় জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতার সাধনায় আমাকে সব কিছু নিরপেক্ষ একটা আনন্দিত অবস্থা লাভ করতে হবে। কোন এক দিককে একান্ত করে ধরলেই প্রতিক্রিয়ায় আর এক দিক আমাকে ঠেলে ধরবে। তাতে জীবনের আনন্দ কোথায় পালিয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণে এই দুইটি দিকই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাঁকে পুরুষোত্তম করে দিয়েছে। বর্তমান যুগের পরিবেশে শ্রীনিত্যগোপালেও এই দুইটি দিকের প্রকাশ রয়েছে—তাই তো তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি, 'টাকে টাকা আর সমাধি এক মাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব'। শ্রীনিত্যগোপাল একদিকে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হচ্ছেন—আবার যখন জাগ্রত জীবনে ফিরে আসছেন তখন সকলের সুখদুঃখের জন্য তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সকলের কল্যাণ-কামনার ঘণ্টা দিয়ে তাঁর সহজ সুস্থ মধুর জীবনধারা। তাই তিনি দিনের পর দিন এক কাপড়ে কাদা বেলপাতা খেয়ে বিংশ না খেয়েও কাটাতে পারেন আবার ইচ্ছে হলে নানা উৎকৃষ্ট ভোজ্যও পরম তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিতে পারেন। এমন ঘটনাও তাঁর জীবনে ঘটেছে যে মায়ের প্রসাদ বলে বাঁচা মাংসও তিনি খেয়ে বসে আছেন। জীবনের ছোটখাট ব্যাপারেও তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি—বাগানের ঘাস তুলিয়ে রেখেছেন বর্ষার জ্বালানীর জন্য, লিখবার পেনসিল ছোট হয়ে গেলে বাগজ মুড়ে সেই ছোট পেনসিল দিয়ে লিখেছেন, আবার নিজের বা পরিবেশের সম্বন্ধে কোন সচেতনতা না রেখেই তাঁর কেটে গেছে বহুদিন। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ—গোপগোপস্ত্র্যাবৃত; শ্রীনিত্যগোপাল জাগ্রত জীবনে খাওয়ার পরম তাঁর পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম এবং একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—commoner; সামান্য বস্তুও শুধু তাঁকেই দেওয়া নিতে পারতেন-ই না, 'একেলা খাইব সুখ না পাইব'। সর্ব সাধারণের সঙ্গে এক হবেন বলেই বাইরের দিকে তাঁর ঐশ্বর্য ছিল না—ঐশ্বর্য তাঁর অন্তরে—সেখানে তিনি অনন্য অসাধারণ, একক। অন্তরের অনন্যসাধারণ যোগ্যতায় তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন—এমন সমাধি যখন কোন চেতনাই তাঁর থাকে না—আবার এই দেহেই তাঁর মন অবতরণ করে—তিনি সকলের ক্ষুদ্রতম সুখ-দুঃখেরও অংশীদার হন। উত্তরণ ও অবতরণ, আরোহ ও অবরোহ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে অদ্ভুত সহজ এবং এই দুই-ই অহোরহই তাঁতে ঘটত।

সর্বত্রই তিনি সহজে বিচরণ করতে পারেন কোন আসক্তি বিদ্বেষের টানা পোড়েন না রেখে, তিনিই বর্তমান কালের যুগ-দেবতা। বাস্তবের দিকে চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাবে যে আজ সকলেরই সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এক ক্ষেত্রের সঙ্গে আর এক ক্ষেত্রের water-tight প্রাচীর তুলে দিয়েই মনুষ্যত্বের পূর্ণতায় আমাদের

পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমরা আসক্তি বিরক্তির টানা পোড়েনে দণ্ডে মরি—অন্তর্মুখীন গতিতে ডুব দিতে চাইলে বহির্জীবনে বোকা হয়ে থাকি, বহির্জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে স্থির হয়ে বসে কখনও আত্মজিজ্ঞাসা করতে অক্ষম হয়ে পড়ি, ঘটনার পাকচক্রে প্রাণের মুখে পা তালিয়ে জীবন কাটাই, কোথাও নিজেকে স্থাপিত করলে প্রয়োজনে সেখান থেকে সরে আসতে পারি না, নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার তাগিদে সামিক কল্যাণবোধ আমাদের অন্তরে তলিয়ে যায়।

শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর জীবনের আচরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, তাঁর লিখিত রচনাবলীতে লিখে রেখে গেছেন যে—আজকের মানুষের কাছে আহ্বান সর্বক্ষেত্রে সহজ বিচরণ করে সহজ জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য, এই সহজ জীবনের অধিকারী মানুষ হতে পারে এবং হলে তা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের পক্ষে পরম কল্যাণকর হয়। মানুষী সত্তাটা তৈরীই এই পরস্পর বিপরীত ভাবসমন্বয় দিয়ে—তাই বুদ্ধির দৃষ্টিতে অনেক কিছুকেই কেবল পরস্পর বিপরীত মনে হলেও আবার তারা পরস্পর পরিপূরকও বলেই জীবনটাকে তারা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের মূলের এই পরস্পর বিপরীতত্ব ও পরস্পর পরিপূরকত্বকে মিলিয়ে সামঞ্জস্যীভূত করে যে নিতে পারল, তার কাছে 'এই বিশ্বটাই মহানন্দ' হয়ে উঠতে পারে, আর এদের মধ্যেকার সামঞ্জস্যের সূত্র না পেয়ে এদের মধ্যের অন্তর্হীন দ্বন্দ্বসংঘর্ষেই যে দেখল, তার কাছে 'এ সংসার অতি ভীষণ স্থান' হয়ে পড়েই। জল আগুন প্রভৃতি বাইরের প্রকৃতির যা কিছু যেমন আমাদের জীবন রক্ষা করছে, তাদের সম্বন্ধে ব্যবহার-কৌশল না জানলে সেই সব কিছুই আবার আমাদের জীবন-হানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পরস্পর-বিপরীতত্ব ও পরস্পর-পরিপূরকত্ব এই দুইয়ের মিলনকে জীবনের মধ্যে যতটা বেশী মাত্রায় রূপ দেওয়া যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে—এই প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষের এ সংসারে আর কোন কাজ নেই।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল এই দুইয়ের মিলন কি ভাবে সম্ভব তারই জীবনগত ও দার্শনিক চিত্র প্রস্থাপন করে গেছেন। তাঁর সম্বন্ধে তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁর 'শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তত্ত্ব-দৃষ্টিতে শ্রীনিত্যগোপাল নিত্যানিত্যসমন্বয়মূর্তি, জ্ঞানাজ্ঞানে সমন্বয়মূর্তি, চৈতন্যাচৈতন্যসমন্বয়-মূর্তি, সাকার আকার নিরাকার সমন্বয়মূর্তি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মবস্তু। প্রকাশক্ষেত্র তাঁহার প্রজ্ঞাচুম্বিত প্রাণ-স্তরে তিনি কোনও বিশেষ মতবাদের নন। তাঁহার জীবনে সর্ব ধর্মের, সর্ব মতবাদ, সর্ব গুণ, সর্ব কর্ম, সর্ব জাতি হাত ধরাধরি করিয়া অন্যোন্য মিলনের ভিতর দিয়া এক রাসচক্র গড়িয়া তুলিবে। তাই তিনি শ্রীমুখে বলিতেন, 'I am a cosmopolitan—আমি বিশ্ব-নাগরিক'। তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে নরত্ব ও নারায়ণত্বের সমন্বয়ে—তাই তিনি নরনারায়ণ। নরের দাবী ও নারায়ণের দাবীর স্বয়ংমূল্য দিয়া পরস্পরকে পরস্পরের মাঝে সৃষ্টি করিবার 'যোগ' (কৌশল) তিনি শিখাইয়া গিয়াছেন, তাই তিনি পরবর্তী জীবনে 'যোগাচার্য'। তিনি সর্ব সংস্কার-বর্জিত; তাই তিনি চতুর্থ আশ্রমে 'অবধূত'। তিনিই সকল করিয়াছেন মনীষী Whitehead-এর বাণী, "It is as true to say that God transcends the world as that the world transcends God. It is as true to say that God is immanent in the world as that the world is immanent in God"।

এই অনুপম প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের ১২০-তম জন্মতিথি ১৩৮০ বঙ্গাব্দের ১৭ই চৈত্র রবিবার বাসন্তী অষ্টমীতে—অন্নপূর্ণা পূজা দিনে—তাঁকে আমাদের সর্ব সত্তায় প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর সম্বন্ধে সেদিন এই আমাদের ধ্যানের ভাষা হোক—'সর্ব মতবাদ' সর্ব বৃত্তি, সর্ব গুণক্রিয়া অর্থাৎ সর্ব বিশেষের সমন্বয়ে রচিত নির্বিশেষ সমন্বয় তত্ত্বকে বর্তমান বিশ্বের কাছে জীবন ও দর্শনের মধ্য দিয়া প্রাণের স্তরে স্থাপন করিতে শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব। এ তত্ত্ব তর্কের বিষয়ীভূত নহে, ইহা জীবন দিয়া উপলব্ধি করিবার বিষয়। স্থিতি থাকিলেই গতি থাকিবে, আলো থাকিলেই অন্ধকার থাকিবে, নির্গুণ থাকিলেই সগুণ থাকিবে, সুষুপ্তি থাকিলেই জাগ্রৎ থাকিবে, ব্রহ্ম থাকিলেই মায়া থাকিবে—এই সহজ তত্ত্বটিকে সমগ্র জীবনের আলোকে নিত্যগোপাল মিলাইয়া দিতে আসিয়াছেন।

প্রাণধারে অধিষ্ঠিত হইয়াই এবার তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈশাখীতোর এই সুস্থতর সবলতা তত্ত্বের ও বুদ্ধিপ্রধান ঐক্যেশিক সভ্যতার কাছে প্রাণধারার প্রবর্তক শ্রীনিত্যগোপাল আমুক্ত হউন'। সহজ জীবনে জীবিত এই প্রাণপুরুষ শ্রীনিত্যগোপালের অমৃতময় জীবনকথা মানুষকে শুনাতে প্রবাসী আজরা আজিকার দিনে সকলকে আহ্বান জানাই —সর্বসংস্কারমুক্ত জীবনসাধনার আনন্দের প্রয়াসী মানুষ এই সুধাধারা পান করে তৃপ্ত হোন, আজকের এই যে বিকৃত বিদীর্ণ কলুষিত সমাজ-জীবন—শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনালোকে দেখুন এরই মধ্যে নূতন জীবন-সৃষ্টির বীজ কোথায়। আজ যে জাতি ধর্ম-বর্ণ অর্থ-শিক্ষা-নিরপেক্ষী সব কিছু নির্বিশেষে প্রতি মানুষের তার রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিকশিত হয়ে ওঠার অধিকার স্বীকৃত হয়ে গেছে—সমস্ত কলুষতার মধ্যেও এইটাই কি নূতন জীবন-চেতনার ইঙ্গিতবাহক নয়? বহু প্রচলিত দীর্ঘস্থায়ী বহু কুসংস্কার যেমন অনেক কেটেছে, তেমনি সর্ব সংস্কারমুক্ত সহজ জীবনে ব্যক্তি পরিবার সমাজ কোথায় কিভাবে কি নিয়মে চলবে তার কোন মুক্ত বিধি-বিধান সকলের কাছে উপস্থাপিত করা হয় নি বলেই অসৌন্দর্যই সর্বত্র প্রকাশিত। ব্যক্তি-স্বার্থ বা দল-স্বার্থ আজ শেষ কথা নয় একথা বুঝতে পারা গেলেও সার্বিক স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হয়, মানুষের কাছাকাছি স্বার্থবোধকে কিভাবে রূপান্তরিত করা যায় তার বিধি-বিধান তৈরী না করায় বিশ্বের আজ সমাজের সম্মুখে। শ্রীনিত্যগোপাল মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজের সেই বিধি বিধানের মূল সূত্র রেখে গেছেন। তাইতো তাঁকে আজ বড় প্রয়োজন। সার্বিক কল্যাণের নামে মানুষের অন্তঃস্থ স্বার্থবোধ যে যে কল্যাণের স্বাসরোধ করে দিচ্ছে, সেখানে ক্ষুদ্র মুক্তিতে চায়াতে হবে সর্ব-সংস্কার মুক্ত, আসক্তি বিহীন স্বার্থবোধমুক্ত সহজ জীবনের অধিকারী হতে হবে। আজকের দিনের সর্বক্ষেত্রের ব্যাপক ভাঙনকে শুরু করে দিতে মুক্ত ও সহজ জীবনের শক্তি চাই। এতদিন একের দ্বারা অপরকে অধিকৃত করাটাই নিয়ম ছিল; আজ সেই নিয়মটাই নিয়ম হিসাবে যে ভেঙেছে সেইখানেই পরম আশা। এখন এই মুক্ত অঙ্গনে ব্যক্তি ও সমাজকে কি করে সুস্থভাবে বিকশিত করা যাবে তারই ইঙ্গিতবাহী শ্রীনিত্যগোপাল, তাই 'যোগাচার্য' হয়েই তিনি বিশ্ব-নাগরিক। আজ তাঁর এই জন্ম-স্মরণ ক্ষণে তাঁকে সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি। জয় হোক শ্রীনিত্যগোপালের, জয় হোক শ্রীনিত্যগোপালের এই সমন্বয়-মূর্তিকে যিনি উন্মোচিত করেন সেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের, জয় হোক মুক্ত জীবন-প্রয়াসী বিশ্বের মানুষের।

"...সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে একান্ত গণতন্ত্র বা একান্ত একনায়কত্ব দুই-ই অচল। গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে দুই-ই পরস্পর-বিরোধী। একনায়কত্ব জনসাধারণের উপর অবদমিত শাসন চালাইয়া তাহাকে সুসংবদ্ধ, সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ রাখে, ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোনও স্থান নাই। অথচ এই শাসনের উপযোগিতাও ততদিনই থাকিবে যতদিন রাষ্ট্রের প্রতিটী মানুষ নিজের ভার নিজে বহন করিবার দায়িত্ব না নেয়, শুধু তাহাই নয়; সমাজের অন্যান্যের স্বার্থসম্বন্ধে যতেই সচেতন না হয়। যতদিন মানুষ নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইবে এবং অপরের স্বার্থকেও নিজ স্বার্থ বলিয়া ভাবিতে না শিখিবে, সমাজের প্রতিটী মানুষ যতদিন সমাজভাবাপন্ন না হয়, প্রতিটী মানুষ যদি ভিতর হইতে বড় হইয়া (growing from within) সমাজ বনিয়া না যায়, ততদিন কঠিন ব্যক্তিস্বার্থে বিভোর মানুষগুলির জন্য অবদমিত শাসনশক্তির চাপের অবশ্যই প্রয়োজন ক্ষুদ্র স্বার্থগুলিকে সংযত করিয়া ব্যষ্টিভাবমূলক 'একত্ব' প্রতিষ্ঠার জন্য। ইহাতে অন্তরের ঐক্য গড়িয়া না উঠিলেও বাহিরের একটা 'ঐক্য' সাধিত হওয়ার পর রাষ্ট্রের শাসন এরকম চালানো সম্ভব হয়।..." —শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভূমা কি

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ॥

"উপনিষদের 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি' এই মন্ত্রের সুব্যাখ্যা করে আমরা সমাজকে আজ জোর দিতে বলেছি। যা ভূমা, তাই ত সুখ, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থ, সম্মান, দেহ কিছুই কি ভূমা? রাবণের দেহ অপেক্ষা রাবণের দেহ অবশ্যই ভূমা ছিল, কিন্তু রাবণের কি তাতে সুখ হ'য়েছিল? দেহ অপেক্ষা প্রাণ ভূমা, প্রাণ অপেক্ষা বিজ্ঞান ভূমা, বিজ্ঞান অপেক্ষা আনন্দ ভূমা। যারা দেহকেই ভূমা করতে চায় তারা রাবণের মত ওজনটা সমর্থ হলেও পরিণামে তাদের ভাগ্যে জুটবে সংসর্গে নিধন, সাধের সোনার লঙ্কায় পতন। আবার দেহকে অসম্মান করেও কি ভূমার খোঁজ পাবে? দেহকে প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দের মন্দিরে দাঁড়িয়ে দেও, দেহ ছেড়ে আকাশে উড়ে বড় হতে চাইলে আছাড় খেয়ে মারা যাবে। আকার ছেড়ে, ছোট ছোট আচার ছেড়ে যেদিন নিরাকারের রাজ্যে উড়ে ভূমানন্দের খোঁজ করতে ছুটেছি, সেদিন থেকে আমরা ছায়ায় পরিণত হয়েছি। দাঁড়াবার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত বাকী থাকবার নিলাম হয়ে গিয়েছে, মায়া এসে অল্প মূল্যে কিম্বা বিনা মূল্যে ভারতবর্ষকে নিলামে খরিদ করেছে। প্রাণের আবেগে দেহই ভূমা, মনের চুম্বনে দেহই ভূমা, বিজ্ঞানের স্পন্দনে দেহই ভূমা, আনন্দের প্রবাহে দেহই ভূমা। দেহকে ছেড়ে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ সব ঠাঁসি, সব ভূমা। আজ ভূমার আসনে বসেছে ভূমা। দেহও ভূমা নয়, আবার দেহ ছেড়েও ভূমাকে পাবে না। তাই অন্ন দেহ ও ভূমা অনন্তের যুগল মিলনেই হল ভূমা। হয়ত অনন্ত ব্রহ্মবাদীর দল বলবেন—ছোটর ভজনায় কি আমরা দিন দিন ছোট হব না? আমরা বলি—ছোটর ভজনায়ও ছোট হই, ছোটকে উপেক্ষা করলেও তেমনি ছোট হই। ছোটকে ভজনা করতে আমরা বলিনা, কিন্তু ছোটকে বড় করে দেখতে বলি; ছোটর অন্তরের বিরাট প্রাণ, মান, জ্ঞান ও বিরাট আনন্দের আবিষ্কার করতে বলি। অন্নকে ভূমা করে যেমন আমরা রস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, শুক্রাদির অধিকারী হই, দেহকে ভূমা করার কৌশল শিখলে তেমনই আমরা জগতে সর্ব্ব ব্যাপারে বীর্য্যবান্ হব। অন্ন না খেয়ে যেমন জঠরাগ্নির ভিতর থেকে তেমন বল পাওয়া যায় না, ঐ ছোট দেহকে অস্বীকার করেও তেমনি আমরা বলবান হতে পারিনে।"—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত 'ছোটর মূল্য' প্রবন্ধ হইতে।

...নীতদের, মধ্যে পরিচালিতদের মধ্যে নায়কত্বের ভাব, বৈধর্ম্যের ভাব, স্বাতন্ত্র্যের ভাব জাগ্রত করিতে এবং যাহাতে এই সব স্বতন্ত্র 'বৈধর্ম্য'গুলি আবার পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈধর্ম্যের অপমান করিতে না পারে এমন একটী সেবকস্বভাবও উদ্বোধন করিতে নায়ক বা চালক প্রয়াসী হইবেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটী unit (ইউনিট) যেমন নায়ক হইবেন, নিজের ও অপরের দায়িত্বভার নিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকের সব স্বতন্ত্রের সঙ্গে ভাব-বিনিময়, মান-বিনিময়, ধর্ম্ম-বিনিময় এক কথায় জীবন-বিনিময় সাধনের জন্য যত্নশীল হইবেন। নায়ক তখনই হয় একনায়ক যখন সে অপরের নায়কত্বকে ভরিয়া লইয়া ও অপরকে দাসে পরিণত করিয়া নিজ নায়কত্বকে ভোগ্য বস্তু করিয়া তোলে। যে-নায়ক নিজ নায়কত্বকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের হাতে হরির লুট লাগাইয়া দিবার জন্য পথে পথে ছুটিয়া বেড়ান, তিনিই সত্য বাস্তব 'একনায়ক' হইবার অধিকারী। সার্থক একনায়ক হইবেন সর্বনায়কের সমন্বয়-মূর্ত্তি। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মত একনায়কও যেমন নাই, তাঁহার মত একসেবকও কেহ নাই। সকলের সকল নায়কত্বকে সার্থক করিয়াই যিনি নায়ক, তিনিই সত্যবাস্তব একনায়ক। —শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৯০)

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

২৮. ১১. ৪৭, ১৩ই পৌষ ১৩৭৪

আজ শ্রীমৎ প্রেমানন্দ অবধূত মহারাজের জন্মদিন। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর...তিনিও শ্রীনিত্যগোপালেরই আশ্রিত। তাঁর জীবনে শ্রীনিত্যগোপালের কৃপা আলোচনা করব। শ্রীনিত্যগোপালের একটী বিশেষ কথা—মানুষ যখন প্রার্থনারত নিশ্চেষ্টতা, তখনই তিনি কোলে তুলে নেন। ...দাদাকে শ্রীনিত্যগোপালের কাছে দিয়ে যাবার নিমিত্ত হতে পারার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।.. শ্রীনিত্য-গোপালকে তিনি মা বলে ডাকতেন··ঠাকুর বলতেন দাড়িগোঁফওয়ালা মা ···একদিন আনন্দের স্বরে দাদা শ্রীনিত্যগোপালের কোলে উঠে বসেছিলেন ···সেদিন দাদাকে প্রথম নিত্যগোপালের কাছে নিয়ে যাই সেদিন নিতাই পাল মহাশয় ছিলেন সঙ্গে। শ্রীনিত্যগোপালের সমাধি দেখে দাদা বিস্মিত হলেন...তাঁর আশ্রয় নিলেন··· ক্রমে দাদার পূর্ব স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয়ে এল— তারপরে তিনি সন্ন্যাসীও হলেন।···সাহস ও সরলতা দাদার জীবনের বিশেষ কথা·· অনেক গান লিখেছেন ···এই শুধু কইতে ইচ্ছে করে আমার নিত্যগোপাল সোনার মানুষ— এমনটি বুঝি আর হয় না।...সংসারের বিপর্যয়ের compensation শুধুমাত্র আদর্শ দিয়ে হয়।···পথ ভুলে যে বিপর্যয় ...গুরু সেখানে পথ দেখিয়ে দেন।···এতবড় বিরাট বিশ্বে মানুষ কর্মহীন হতেই পারে না ...তাই বলি, সকল দুর্যোগকে দুর্যোগ রাখিয়া যিনি সুযোগে গড়িয়া তুলিতে পারেন, তিনিই যোগেশ্বর।···দুর্যোগ যত বেশী, কল্যাণও তত বেশী।...দাদার জীবন আমার জীবন নিত্যগোপালের সেই কৃপালাভের দৃষ্টান্ত। সবাই ছেড়েছে যারে নাই যার কেহ, তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ—এ কবিতা শ্রীনিত্যগোপালের পক্ষে খুব সত্য—তিনি আছেন—যখন যেখানে আছি সঙ্গে সঙ্গে আছেন···এ সংসার অতি ভীষণ স্থান যদি চলবার কৌশল না জানি—কে দুঃখ দেবে যাতে 'এই বিশ্বই আমার মহামঠ' হয়ে ওঠে নিত্যগোপাল ছাড়া?···সংসারে প্রত্যেকের দায়িত্ব কি রকম, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক কি রকম সব শ্রীনিত্যগোপাল শিখিয়ে দিয়ে গেছেন ...শ্রীনিত্যগোপাল কর্মের সাগর, জ্ঞানের সাগর, ভক্তির সাগর···· প্রচলিত বৈরাগ্যের পরেও আর একটি বৈরাগ্য আছে—সংসারে সকল কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকা যায়—ঊর্দ্ধে থাকা যায়। কেমন করে তাই-ই তো বলতে চাই।···শরীর আজ ক্লান্ত···ভালবাসতেই তো চাই— ভালবাসতে মানুষ দিল কই?···তোমরা আমায় ব্যর্থ করো না।···সকলের দায়িত্ব নিয়ে সকলকে মুক্তি দেব···। শ্রীনিত্যগোপাল তো আমার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই সকলের দায়িত্ব নেবার সাহস আমার হয়।···কিন্তু দিন তো ফুরিয়ে এল...আর তো বেশীদিন নাই।···নিত্যগোপাল, দাদাকে তুমি নিয়েছ, আমি আজও আছি···। দিয়েছিলে তো অনেক কিছু জ্ঞানভক্তি···তোমার তত্ত্ব-জীবনের অতল রহস্যের খোঁজ...সে সব তো দিয়ে যেতে পারলাম না—নিত্য-গোপাল এই দুঃখ ছাড়া আর তো কোন দুঃখই নেই ···দাদা আমাকে ভুবিশ বলে ডাকতেন ...এ জগতের মানুষ তো ভালবাসতে জানে না ঠাকুর, তোমার এই প্রেম নৃ-লোকে না হয়।···প্রেম নিয়ে, সম্পর্ক নিয়ে সংসারের লোক ছেলে-খেলা করে···। তোমার ধনকে আমি বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব।···ভালবাসার বেদনায় ব্যর্থ হয়ে আজ শ্রান্ত...। দাদা আমার···যতটুকু পেরেছি সেবা করেছি···। তুমি মায়ের কোলে গেছ, থাক।...আমিও যাব।

১লা জানুয়ারী ১৯৫৮—আজ ইংরেজী বর্ষারম্ভ। আজ আশ্রমে অনেক বন্ধু এসেছিলেন। আজ নিত্যগোপালের সেই 'কয় কি, টেনে তুলব' মন্ত্র স্মরণ করি ....কয় করি নি —জীবনের কর্মের জটিলতায়, রসের আবর্তে, জ্ঞানের শুষ্কতায় ডুবে যেতে পারতাম ...নিত্যগোপালের বিয়োগে এতদিন যখন কাঁদছিলাম···, তখন বলেছিলেন, 'বৎস, তুমি কি জান না তুমি যখন যেখানে আছ আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি' ?—হাঁ, সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।···নিরাশ্রয়, আত্মীয়হীন কয়েকটী মানুষ নিয়ে আজ আমায় চলতে হচ্ছে। কর্মের ক্ষেত্রে আঘাত, স্নেহের ক্ষেত্রে আঘাত সইতে সইতে এ পর্যন্ত এসেছি। জীবনের এই সায়াহ্নে, ঠাকুর, তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারলাম না সেই বেদনায়ই অস্থির লাগছে।···সংসারে সন্ন্যাস যুক্ত না হলে, সন্ন্যাসে সংসার যুক্ত না হলে জীবন অর্থপূর্ণ হবে না···সংসার বিশ্বেশ্বরের, সংসার জগন্নাথের—জগন্নাথ বাদ দিয়ে সংসার তুচ্ছ।···ছোট সংসার অনেকদিন ভাসিয়ে দিয়েছি···। নিত্যগোপাল, তোমার সংসার গুছাব, তোমার সংসারের আমি গৃহিণী হব ; আমি নদী, তুমি সাগর।...যারা খেতে পায় না তাদের অন্ন না দিয়ে আমি অন্ন খাই কি করে ?···এস ভগবান···সামনে কাজ আমায় ডাকে···কানাইবাবুরা বলছিল আশ্রমকে নেতা করে আমরা চলতে চাই ···আশ্রমের এরা কি নেতৃত্বের জীবন লাভ করবে ?···[গোপা সংগচ্ছধ্বং মন্ত্র উচ্চারণ করে।]···সকলকে তুমি সংহত কর। সারা জীবন এই চেয়েছি···ঘরের লোকের সঙ্গে বাইরের লোককে মিলিয়েছি...। সত্যিই তো আমি পাগল...। জগন্নাথের সংসারে ব্যক্তিগত সংসার ডুবে গেলেই তা সত্যিকারের সংসার হবে...। নিত্যগোপাল, আমি তোমার সংসারে থাকব···দিন ফুরিয়ে এল...., আমার সারা জীবনের ঋণ তুমি গ্রহণ কর।...তুমি আমি, আমি তুমি।

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৮—শনিবার। আজ আশ্রমে ১০ জন সব মিলে। আশ্রমের যা আর্থিক যোগাড় তার থেকে অনেক বেশী সাহস করে আমরা নেমেছি। সংসারী লোক এ সাহস করে না...করেছি ঐ নিত্যগোপালের দিকে চেয়ে। ১৯১৯ এ যেদিন এ জনকে নিয়ে পথে নেমেছিলাম সেদিনও এই দুঃসাহস করতে পেরেছিলাম।··· সেদিনের থেকে আজ ঘটনা ও আয়োজন জটিলতর···। নিত্যগোপালের আশীর্বাদ পেয়েই আছে নিশ্চয়, কিন্তু সেই সঙ্গেই তা রাখতে পারে যে অনুগত ...কলসী উপুড় করে রাখলে বৃষ্টির জল ধরা যাবে না। কৃপা ধরতে হলে অনুগত হতে হবে।...অন্তঃ অর্পণস্তু মুখম্ ··· সেদিন যে ঐ দুঃসাহস করতে পেরেছিলাম তা সম্ভব হয়েছে—সংহতি তার কারণ ...। শ্রীনিত্যগোপাল-সাগরের জল আমি পেয়েছি।···আজ এত লোক এল কার ·· কাজ এসে গেছে··· যোগ্য হলে, সময় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে ·· মুখ বুজে পারস্পরিক প্রীতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাও ···প্রকৃতি বেলের সাধনা গ্রহণ কর।... কেবল মনে মনে জপতপ আর কতগুলি আচার আর সংস্কার—তা আমার নেই···টাকার তহবিল আমি নামি নাই···। নেমেছি ঐ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্ মন্ত্রের শক্তির জোরে ....এ আমি কত দিন বললাম। কিন্তুতেই কি তোমাদের এক করতে পারব না ?...একমত না হলে কিন্তুতেই কিছু করতে পারবে না।...নিত্যগোপালকে পেতে হলে, তাঁর কাজ করতে হবে, মন সমান, সমিতি সমান, চিত্ত ও মন সমান করতে হবে।···তোমাদের মধ্যে পরস্পরকে শত্রু না করে কথা কাটাকাটি হয়! আর একজন মনে আঘাত পায় এমন ভাষা তোমরা যেন ব্যবহার করবে ?...রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, কলিকালে সব লোক কীর্তন করিবে, নাচিয়া গাহিয়া শেষে নরকে যাইবে।··· আমি এমন কীর্তনের ব্যবস্থা করি নাই···। আমার পুঁজি শূন্য ...শূন্যের থেকে আরম্ভ করে যতদূর হয়েছিলাম, আজও শূন্যের মধ্যেই আছি ···নয়ন বা যোগেন কাউকেই আমি টাকার তহবিল আনিনি ।···আমি গুরুজন হয়েও বলি তোমরা একমত হও, মিলিত হও ···এমন কথা কেউ বলো না যাতে কথা কাটাকাটি হতে পারে ···মন সুস্থ থাকলে পুঁজি আয়ত্তেই হয়। আত্মতুষ্টি পোড়াতে না থাকলে সংসারে শত ভোগ করেও তৃপ্ত হতে পারবে না···। এখনও প্রকৃতি বদলাও ···লক্ষ নাম জপ করেও মানুষ প্রতি ক্ষেত্রে জীবনকে সমাজকে ফাঁকি দেয়···নয়নারায়ণ আশ্রম শোষণ করবে

না, পোষিত হবে না ...কোন আচারের উপরেই আমি জোর দেই না—সহজ জীবনের কথা আমি বলি। ...সুন্দর সাহিত্য—যিশু—(সহিত+ক) রচনা করতে হবে এই ধরায় যেখানে ঠাকুর নেমে এসেছেন ...ধরার ধূলিকে মাটীর সমাজকে ব্রহ্মধূলিতে ব্রহ্মসমাজে গড়ে তুলতে চাই। ...ঘরে ঘরে নারায়ণের মন্দির গড়ে তুলতে চাই।...বিশ্বই আমার মহামঠ...। জগন্নাথ নিত্যগোপাল...এই জগন্নাথের পীঠস্থানে রচনা করব আমি এই আমার সংকল্প।...

১৬।১৪. গীতায় বলেছেন, যোগস্থ কুরু কর্মাণি... যোগ কাকে বলে?—সাগরের সঙ্গে নদীর যোগ—নদীর কাজ সাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া...সাগরের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে নদীর কাজ ক্রমে ফুরিয়ে যায়... নদী তখনই নদী যখন সাগরের জল তার বুকে নিয়ে সে নাচতে নাচতে ফেন উর্মি করে চলে...। এটা নদীর একটা কাজ...সাগরের কথা, সাগরের জল তত্ত্ব জনপদে ছড়িয়ে দেওয়া—নদীর অন্য কাজ জনপদের বিত্ত, মনিষ্ঠতা —দুঃখীর দুঃখ, সাহিত্যের অবদান সব সাগরে পৌঁছে দেওয়া...মানুষের প্রাণে নদীর জল দৃষ্টিত হয়—জনপদের ব্যথা সাগরে পৌঁছানো...জ্ঞানকর্মপ্রেমভক্তির সাগর নিত্যগোপালের কথা মানুষের কাছে পৌঁছাবো, মানুষের ব্যথা বেদনা নিত্যগোপাল-সাগরে পৌঁছে দেব।...১৩১২ সনে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম আমার বুকে বান ডাকল...জনপদের পর জনপদে ঐ সাগরের কথা পৌঁছে দেবার জন্য ঘুরেছি—ঘরিশাল ময়মনসিংহ ঢাকা রাজসাহী...সব জেলা...। চোখের জলে সব জায়গার মাটি সিক্ত করেছি...তোমরা এসেছ · যুক্ত থেকো বলে গেলাম। বাল তোমরা শাখানদী সব নদীর সঙ্গে যুক্ত ...feeder...। সাগরের সেবা করবার জন্য আমি ডেকেছি, অন্য কোন অভিসন্ধি আমার নেই ...সংসারে অভিভাবক সন্তানদের বড় করে অভিভূতের আশায়—আমি সে আশায় বিন্দু করি না— কেবল তোমাদের জীবনে নিত্যগোপাল-সাগরের জল প্রবেশ করুক, তোমরা তাঁর কথা নিয়ে ছড়িয়ে পড়, বড় হও...তাই-ই শুধু আমার আশা। নিত্যগোপাল জীবনব্রত ...। আমি একদিক দিয়ে রিক্ত...কিন্তু আর এক দিক দিয়ে আমি রিক্ত নই—তাই নগেন্দ্র যখন এসে বলে আসতে চাইল, আমি না নিয়ে পারলাম না। রাস্তাটা নরনারায়ণ আশ্রমের স্পর্শে যেন হয়ে যায়।... এ গ্রামের জলাবদ্ধতা একদিন যাবে...এসেছে যদি মানুষ হও ... প্রাণ খুলে নিত্যগোপালের সেবা কর...পুকুর খাল শাখা নদীর মধ্য দিয়ে নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাগরে পৌঁছাবে ...। আমি সে সুযোগ করে দিতে এসেছি।...প্রাণপণ করে অনলস থেকে অকপট হয়ে সেবা-বুদ্ধিতে কাজ করলে ভগবান তার আর দেখেনই। যুক্ত থেকো। নরনারায়ণ আশ্রমের সার্থকতা মানুষের সেবার জন্য ...নিত্যগোপাল যেন এখানে এনেছেন দেড় বছর পরে তার একটু আভাস পাচ্ছি ...তাঁর আসাকে সার্থক করতে হলে মানুষ হতে হবে।...পিতের কাছ শুধু নেন, শুধু তার যেন বিত্ত নেয়...; সন্তানের তার তো পিতা নিয়েই থাকে, পিতার কাছ যেন সন্তান নেয়... অহংকারের থেকে বড় বোঝা আর কিছু নাই...। কলিযুগে আর সব সাধনা শেষ হয়েছে, কেবল অহংকার বলি দেওয়া বাকি আছে...। অহংকার ছেড়ে দিয়েছি নিত্যগোপালের চরণতলে—আজ ৪০ বৎসর এই ভাবে চলছি— আমি নিত্যগোপালের পাদুকাবাহী...তুমি আছ আমি নাই।...আশীর্বাদ নেবার যোগ্য হও ...। নগেন, মানুষ হও ...আশ্রমোচিত জীবন যাপন কর...। ভগবান খোঁজেন মানুষ—সেখানে চাড়াল ব্রাহ্মণ নেই...মানুষ হতে হবে। .. নিত্যগোপাল, শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জনে...। নূতন জীবন গ্রহণ করে এসেছ যদি ...এ গ্রামের সর্ববাধীনস্থত মত নরনারায়ণের স্পর্শ ব্যতীত এই রাস্তা এত সহজে হতো না।...যারা আশ্রমে আছ, আশ্রমোচিত জীবন যাপন কর...। ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ।...

১৭।১৩৫৮ শ্রীভগবান মানুষকে অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তি, অনন্ত সুযোগ দিয়েছেন এবং সেগুলিকে কাজে লাগাবার যোগ্যতাও দিয়েছেন। ...কাজে লাগাতে না পারলে ভগবানকে দোষ দিয়ে লাভ হবে না।...ছন্দ জানা চাই। কাজে লাগাবার ছন্দ না জানলে কেবল

মানসমন্ত্রণা পেলেই তো হবে না।...সময় অনুযায়ী, কয়জন তাকে কাজে লাগালে? মানুষের মেরুদণ্ডই বল, আর এই বিরাট বিশ্বই বল—কি বিরাট নিয়মের অধীন।...মানুষ নিয়মের বাইরে যেতে পারে সেইখানে তার যোগ্যতা, পশু নিয়মের বাইরে যেতে পারে না।...। কিন্তু নিয়মের বাইরে এই যেতে পারার ক্ষমতাকে তো কাজে লাগাতে হবে ...নিয়মশৃঙ্খলা মানতেই হবে সেখানেও যেখানে প্রচলিত নিয়মের বাইরে তুমি গেছ। সময়মত খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি কাজ করার পক্ষে, দেহ রক্ষার পক্ষে বিশেষ কলদায়ক। জীবনে পাঁচশ তিন হাজার বক্তৃতা দিয়েছি—একদিন কিংবা দুদিন লেট হয়েছি·· তাও একেবারে নিজের দোষে নয় ···বলগড়া থেকে বালোয় যাব --যে প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করছি গাড়ী সে প্লাটফরম থেকে না ছেড়ে অন্য প্লাটফরম থেকে ছেড়ে গেল ··। আজকাল কেউ সময় রক্ষা করে চলার দায়িত্ব নেয় না...। কাল (Time)-এর মাথায় সামনের দিকে চুল—সেই চুলের মুঠি ধরে তাকে আয়ত্তে রাখতে হয়। পিছন দিকে তার তেলচেলে মাথা—তোমার দিকে যখন তার পিছন পড়ল—আর তাকে ধরতে পারবে না—ধরবে কিসে? —তাই To take time by forelock...কালকে সদ্ব্যবহার করো···অভ্যাস দিলেই জীবন গড়ে না...ওতে আনন্দ হয় না ···শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের ঠাকুর—কয়েক হাজার বছরেও তাঁকে ভোলা গেল না।···অক্ষিতাবকের মত বলছি ···বিনা ছন্দে শক্তি স্ফুরিত হয় না···খোল আর কাশ বেলাতে গেলেই ছন্দের প্রয়োজন···চেঁচাতে ছন্দের দরকার নেই, কিন্তু সুর আনতে ছন্দ চাই, নাচতে হলে ছন্দ চাই। ...সবই সাধনা করতে হয়।...ছন্দ রক্ষা করলে এতোক কর্ম হয় দেখা।···সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যা কিছু করি, তা আমার তোমার পূজা হোক ··। খাওয়া বেড়ান ঘুমান সবকেই সেবায় পরিণত করা যায়···। বড় লোভ ছিল ১০০টা ছেলেকেও যদি এই ছন্দ শিখাতে পারতাম।...অশ্বারোহণে riding. swimming, running সব কেন পারছেন? —শৃঙ্খলা মেনে চলেন বলে।···শৃঙ্খলা না থাকলে আয়ু থাকে না ..। নগেন কাল আরম্ভিতে খোল বাজিয়েছে—আজ সে নেই।···আমি তো টাকার জোরে কাউকে রাখিনি ···শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে, যুক্ত হয়ে কাজ করবে তোমরা···। পৃথিবী শুদ্ধ তো তুলো বিছানে থাকেনা—নিজের পায়ে তুলো দিয়ে নাও···। অমুকের জন্য ভাল হতে পারলাম না এ ছেলো যুক্তি আমায় শুনিয়ো না···। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন —অপরে অধম হইলেও আমি উত্তম হইব না কেন?··· দুনিয়া চোর হলেও আমি সাধু হতে পারি এ শক্তি ভগবান মানুষকে দিয়েছেন ···ঘরে ফিরে এস···ঘুরে বেড়, ঘরে বসে হেস ···বাইরে বড় ভাল জিনিস নয়—সেখানে বিচরণ করতে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন—যদি মানুষের মত বিচরণ করতে চাও—ছাগল গরুর মত নয়।···'আছি তব ভবনে'—এইটে বুঝতে শেখ ···সমস্ত অনাদির চলুক, তবু এক জায়গায় আমার অবাহত আছে··· প্রত্যেককে আমি বলছি—শৃঙ্খলাবদ্ধ হও···, কুলের শৃঙ্খলা রাখা···, ঘরে যার মা নেই, পথে তার পিছন নেবেই ।·· School friend সম্বন্ধে Tennyson সাবধান-বাণী বলে গেছেন। ···এসেছ যদি এইখানে, লেগে থেকো...শৃঙ্খলা মানলেই আনন্দের ব্যাঘাত হয় না। সংযমই আনন্দ···। তব কথামৃতম্—তোমার কথা অমৃত হয় না কেন? তোমার কথা দিয়ে অন্যকে জানাও, নিজেও জান। ..তাঁর কথা যদি অমৃত হয়, তোমার কথা অমৃত হবে না কেন?···কথা কইতে শেখ, fallacy দিয়ে, প্যাঁচ দিয়ে কথা কয়ো না।...গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ···মানুষ হয়ে জন্মেও মানুষ হওয়ার বাকি থাকে···। এসেছ, অনুসরণ কর···। আশ্রমের পক্ষ থেকে বলি শৃঙ্খলা মান...। রাস্তার ব্যাপার নিয়ে আশ্রম এই গ্রামের আবহাওয়া শুদ্ধ করবে।···সকালে বিকালে এই প্রার্থনা ব্রহ্ম-মানুষ হও, ব্রহ্ম-মানুষ হও···, তোমাদের জীবনের আলো দিয়ে অন্যের জীবনে আলো জ্বালিয়ে তোল—এ দাবী তোমাদের কাছে করব না তো করব আর কাছে? ওঁ অপরাধ নিতাগোপাল।

১৮.১.৫৮, প্রতি শনিবার আলোচনা পাঠ হয়। শ্রীনিতাগোপাল এই বর্তমান যুগে কোন্ খান থেকে রওনা হয়েছেন? কী তাঁর তত্ত্ব? কী তাঁর ভবিষ্যৎ? যারা তাঁর নামে রওনা হল তাদের এসব জানা দরকার।···

একটা নূতন যুগ সৃজন করতে তিনি এসেছেন ...এই নূতন যুগের পরিচয় কি? এক কথায় বুদ্ধির যুগ চলে গেছে, প্রাণের যুগ এসেছে, আসছে...। নিত্যগোপাল তাই নিবেদন করল দল বেঁধে আমার এক অবশ্য হল ... হল করতে তো আসি নি ...কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের, বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈদান্তের, আস্তিকের সঙ্গে নাস্তিকের মিলন ঘটাতে তিনি এসেছেন -- সব দলাদলির উপশম করতে চাই প্রাণ... উপনিষদ বহুবার এই প্রাণের মহিমা কীর্তন করেছেন—প্রাণ সৃষ্টিকর্তা বলেছেন। প্রাণ জাগ্রত হলে একের কথা অপরে বুঝবে; যেখানে প্রাণহীন বুদ্ধি সেখানেই মতদ্বৈধ, কথা কাটাকাটি ...প্রাণ আর একজনের উপর বুদ্ধি চাপাতে চায় না।...চাপালে মীমাংসা হয় না।...বুদ্ধির সাধনা ব্যর্থ—বুদ্ধিবাদ অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী সব মরে গেছে...সেইজন্যই কলিযুগে মানুষ ক্লান্ত।...পরীক্ষিৎ কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন -- কৃষ্ণ অর্থ প্রাণ...। বুদ্ধির খেলায়, শোষণের ঠেলায় সব শেষ হয়ে গিয়ে আছি শুধু আমি—কৃষ্ণ-কথা মানে প্রাণের কথা—কেন কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাই শোন—ব্রহ্মশাপ-বিদগ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশসমাভব—আমি যুধুৎসব কৃষ্ণ-পাণ্ডবের একমাত্র শেষ চিহ্ন - সন্তানবীজং—প্রাণের অবসান পেয়ে যেতে হবে তাই আমাকে মরতে দিলে না...। সদ্গতি ছাড়া তো প্রাণ আসে না...পাহি পাহি মহাযোগিন্ মা মে গর্ভং নিপাতয়—এ গেলে তো তোমার আমার মহিমা—প্রাণতত্ত্ব প্রচারিত হবে না...আমি তো মরেই গেছিলাম, সেই ছাই হয়ে যাওয়া পরীক্ষিৎকে যিনি বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তাঁর কথা কও।...শুকায় স্থানবে...আজ শোষণে শোষণে পচে যাওয়া জীবনে আবার প্রাণ জাগাতে হবে...পচে যাওয়া বিশ্বের অঙ্কুর আবার জাগছে প্রাণকে...নূতন যুগের তোরে জাগছে...কি হবে আর কি হবে না, কি হবে আর কি হবে না এ হিসেব করো না...। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীনিত্যগোপালকে পরিচিত করে দিয়েছেন—তুই এসেছিস, আমিও এসেছি ...সহ্য toleration নয়...সমজ্ঞান তো নিত্যগোপালের ঘরে ছাড়া মেলে না। ইঁটকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালে হয় ...বুদ্ধির শেষ স্তরের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ...প্রাণের যুগে নিত্যগোপাল প্রথম দাঁড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ শাক্ত বৈষ্ণব একত্র করেছেন, ধর্ম রাজনীতির তো সময়য় তখন হয়নি। .. সত্যিকার যারা সময়য়ের সাধক, তারা ছুটেকে না মিলিয়ে পারবেন না। ...আমাদের এখানকার... রাস্তা নিয়ে দলাদলি হতে পারে, বলে কেউ কেউ ...নিবেদিতাকে রামকৃষ্ণমিশনের ব্রহ্মানন্দ বলেছেন, নিবেদিতা মিশন ছেড়ে না গেলে মিশন বিপন্ন হবে—নিবেদিতা চলে এলেন অথচ তাঁর মধ্যে ছিল গণতন্ত্রের সময়য়ের কথা।...রাস্তা হচ্ছে একদিন যে রাজনীতি ক্ষেত্রে ছিলাম, তারই জন্য...। রাজনীতি বিশুদ্ধ করে ধর্মকে, ধর্ম বিশুদ্ধ করে রাজনীতিকে...। সন্ধির দেবতা রামকৃষ্ণ..., কিন্তু সন্ধির পরবর্তী যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে, সেখানে নিত্যগোপাল দাঁড়িয়ে আছেন...। কোন একটাতে আটকে নেই তিনি, সবটাতেই আছেন।

শ্রীনিত্যগোপাল লিখলেন, 'আমি কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়-ভুক্ত নহি, আমার ইষ্ট যেমন বহুরূপী, আমি সেইরূপ বহু সম্প্রদায়ী। আমার ইষ্ট যখন শিব হন আমি তখন শৈব, তিনি যখন বিষ্ণু হন আমি তখন বৈষ্ণব। তিনি যখন অন্য কোন সাম্প্রদায়িক, আমিও তখন সেই সাম্প্রদায়িক হই।...আমি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান। I am a cosmopolitan...প্রকৃত জ্ঞানীর কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ তাঁহার সকল সম্প্রদায়'। এই রকম নিত্যগোপালকে পেয়ে আমিও কোন বিন্দুতে আটকে নেই—তাই আমি ধর্ম সমাজ রাজনীতি সবটাতেই আছি ...এখানে যারা এসেছে সবাই পরিশ্রান্ত—বুদ্ধি এখন পথ দেখাতে পারবে না। বুদ্ধি হাতের পাঁচ ছাড়তে পারে না...শুধু বুদ্ধির বিচারে আজ পথ পাওয়া যাবে না ...এখন বিচার ও বিশ্বাস একসাথে হবে।...শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' পড়ে দেখো...কোনো দেশেই নারীর সত্যিকার কোন মূল্য ছিল না ...এখন প্রাণের যুগ আসছে বলেই নারীর সূত্রের মূল্য স্বীকৃত হচ্ছে—কেননা তাদের মধ্যে প্রাণের দিকটা বেশী ...এখন তাদের প্রাণ বজায় রেখে তাদের বুদ্ধি দেখতে হবে—প্রাণ বিসর্জন দিয়ে নয়। প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যদি তারা বুদ্ধিমান হয় তাহলে তারা ডুববে আবার...।

আশ্রমের সেবকেরা এই প্রাণের—যা উপনিষদের প্রাণ—অধিকারী হয়ে ধন্যাতীত হবে...মানুষকে পথ দেখাবে ... এই বর্তমান আবেষ্টনে আমার প্রাণ থাকতে চায় না।... বিশ্বাস কর তো এখানে থাক... আমি দুর্যোগের পথের যাত্রী ...কেউ আমাকে ভবিষ্যতে দেবে আমার তো সে অভিসন্ধি নেই যারা এসেছ তারা মানুষ হবে এই আমার সাধী...; মানুষ যদি না হও তবে আমার কাছে থাকো কেন? আমি তো কাউকে টাকার জোরে রাখিনি.... অনুগত হও, অনলস হয়ে কর্ম কর...কথা কাটাকাটি বন্ধ কর ... সুযোগকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা হলে—এ যদি তোমাদের হয় তাহলে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যাবার পথ কোথায়? ...আমি যেমন করে মানুষকে ভালবাসি—মনে পড়ে বেদব্যাস বলেছিলেন আমি উর্ধ্বাহু হয়ে ডাকলাম—কেউ এলো না...। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যেমন করে বাঁচে, আমি বিশ্বমায়ের পেটে তেমন করে বুক থেকে আশ্রম চালাচ্ছি।...প্রাণ আছে বলেই সাহস আছে ...এখানে প্রাণ নিয়ে থাকতে হবে...। শরণাগত হয়ে প্রাণ খুলে পড়ে থাকলে নিত্যগোপাল তার ভার নেন। ...প্রাণপুরুষ নিত্যগোপালকে চেনা বড় কষ্ট ...বুদ্ধির কথা আগে সঞ্চয় কর, পরে খরচ; প্রাণ প্রয়োজনে হলে খরচ করে বসে থাকে—পরে টাকা আসে ... বুদ্ধির চালে চললে টাকা না থাকলে খরচ করলে বিপদ তো ঘটেই।...কিন্তু সবাই যদি প্রাণ নিয়ে থাক তাহলে ১০০ লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি ...যে দশ স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে পথে বের হয়েছিলাম সেদিন ১৫৲ টাকা হেমন্ত দাশগুপ্তের থেকে নিয়েছিলাম ...কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সৃষ্টি করেছিল বুদ্ধিমানের দল.... প্রাণের যুগে ভবিষ্যৎ সমাজের চলাচল সব আলাদা—সেই পথে নিত্যগোপাল পথ-প্রদর্শক...। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানের থেকে ক্ষুদ্র প্রাণবান মানুষ মহত্তর।...বুদ্ধি শেষ হোক, শরণাগত হও—যদি বুদ্ধি নিঃশেষ ...বুদ্ধির সামনে কিছু নেই, শুধু অন্ধকার; প্রাণই সেখানে আলো দিতে পারে...। আজকের প্রলয় পয়োধি জলে দাঁড়িয়ে আছেন নিত্যগোপাল...। সর্বদেশ-সংঘ-মূর্তি নিত্যগোপাল এসেছেন...মীন নিত্যগোপাল ধরে আছেন নূতন দেশকে...। বিশ্ব-সমাজ, বিশ্ব-রাষ্ট্র গড়তে শ্রীনিত্যগোপাল এগিয়ে এসেছেন...

২২.১২.৮৮ নরনারায়ণ আশ্রম কোন্ সাধনার ধারা বয়ে চলেছে তা মাঝে মাঝে মনে করা উচিত।...প্রচলিত সাধন ভজন থেকে এখানকার ধারা একটু আলাদা।...এতদিন ছিল আমি তাঁকে চাই,...এখন এখানে হচ্ছে তিনি আমায় চান ... সাধনা বহু তাঁদের.... মায়ের স্নেহ সন্তানের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত—ভগবান যে আমায় চান। আমার জন্য তাঁর স্নেহ যে স্বতঃস্ফূর্ত সে কথা বিশ্বাস করতে হবে।—এতদিন ছিল পাই নাই পাইব—এখন হচ্ছে পেয়েই আছি—সেই পাওয়াকে বুঝে নেওয়াই কাজ। জগজ্জননী আমায় চান, আমি সে ডাকে সাড়া দেই না। সাড়া দিলে তাঁর সবখানি আমি পেতাম ...নদী সাগরের কাছে আত্মসমর্পণ করলে সাগরের সবখানি পায়—কিন্তু নদী নিজের মত চললে কতখানি পাবে?...মধুসূদন রায়ের ছায়া কবিতাটি স্মরণ কর—'আয়ত্তাধী নয়, আয়ত্তাধী নয়...ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গায়ে হল ব্যথা'...। তোমার মন-গড়া মা তো ছায়াই...তুমি চাও যা তোমায় বিশেষ করে ভাবধারণ...এটা মায়ের সত্যিকারের রূপ নয়—এটা ছায়া মাত্র। এমনি করে নিজের মত করে ভগবানকে নেওয়ার চেষ্টায় তো সত্যিকারের ভগবানকে পাওয়া যাবে না।...তোমার মা তোমার দায়ারও—সেটা অস্বীকার করলে মায়ের সমগ্রত্ব নষ্ট হয়...। নিজের মত করে প্রত্যেকে জগৎটাকে টুকরো টুকরো করে নেয়...মানুষের সঙ্গে আমার বিবাদও সেইখানে, মানুষের সঙ্গে মানুষের ঝগড়াও লাগে এই জন্য। কেননা সেখানে প্রত্যেকে তার বিচ্ছিন্ন 'আমি'র থেকে রওনা হয় আমির থেকে রওনা না হয়ে ভগবানের থেকে রওনা হলে সর্বধর্ম সমন্বয় হোত—কালী কৃষ্ণ শিব আল্লা যীশু সব মিলত...। অহং থেকে আরম্ভ করলে বিশ্ব-মানবিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই ...রক্তের মধ্যেই তো মা...মাকে তো পেয়েই আছি...মা কি সামনে, না পিছনে?...উপনিষদও তাই বলেছেন...তাঁকে পাবে কি? তিনি সামনে না পেছনে?...তাঁর মধ্যেই যে

আছ···পূর্বকে পাবে কি? বাতাসকে পাবে কি···সে সব বস্তু তো তোমার ঘিরেই আছে—দরকার তোমার অহংটিকে লোপ করা—তাহলেই তাঁরা যে তোমায় ঘিরে আছেন সেটা বুঝতে পারবে।···পিতৃদেবো ভব,···গুরু-দেবো ভব। পিতা আমার ছোট্ট সংসারের পিতা···গুরু তো বিশ্বের ভার নিতে বলেন—আমির থেকে হওয়া হলে এদের দুটোর একটা—দুটোই হবে না···দুর যে যে মন কালী বলে, দুর্গা যে যে মন শুরু বলে।···বলে যাই তোমাদের · তোমাদের আমায় করে যাবার সাধ মিটল না ···তোমরা শ্রীনিত্যগোপালকে নিতে পারছ কই—নিতে পারলে তো বুঝতাম আমায় আদর তোমরা নিলে—তাই আদর করতে না পারার বেদনা নিয়ে সংসার থেকে যাচ্ছি। অহংকারীদের জন্য কিছু করা যায় না··· শরণাগত হাজার মানুষ নেওয়া যায় · । কিন্তু খেয়ালী মানুষ, অনুগত যে নয়, এমন মানুষ নিলে কিছু করা যায় না—তাতে দায় আর তার কেবলি বাড়ে। নিত্যগোপাল লিখে গেছেন—ছন্ন বেশী ভগবান পাইয়াছ, অন্নে তাঁহাকে চেন, তবে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবে।···মানুষের জন্য প্রাণ দিয়ে-ছিলাম,···অগাধ ভালবাসা দিয়েছিলাম—যে যখন এসেছে তাকেই নিয়েছি·· নগদ বিদা চালাতে···নিয়েছি এই সাহসে যে ঠাকুরের অনুগত বলে···অনুগত থাকলে নিশ্চয়ই হবে ···সাগর জীবনে যত চুকবে, তত জীবনে পূর্ণতা আসবে।···কুলগাছ তলায় পাঁচবার ঘোরাও চলে না।···টাকার জোরে নরনারায়ণ আশ্রম চলে না—চলে তাঁর আশীর্বাদে অহংকার ত্যাগ না করলে এখানে থাকতে পারবে? নিত্যগোপালের অযাচিত কৃপা পেয়েছি দিতে চাই, নেবে? কেউ তো নিতে চায় না ···পরশু সরস্বতী পূজা—ইচ্ছা করে স্কুলের মেয়েদের কলার মত স্নেহ করি—কিছু খাওয়াই; কিন্তু টাকা যে নাই—তবু ভেবে কি করা যায়। দিতে চাই, দিতে চাই—নিতে নিত্যগোপালের কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছি সব দিতে চাই। মহাপ্রভু কি ঠিক বলেছিলেন—'তাবকালি বেচিবারে আইলাম কাশীপুরে' (কিন্তু) 'গ্রাহক নাহি পাইয়া ঘরে ফিরে'—তখন প্রাণের দায়ে বলছেন, 'অল্পমূল্য পাইলে ইহাই বেচিব'। দিতে না পারার দুঃখ যে কি কেমন করে বোঝাব? আমার কথা, আমার আশীর্বাদ নিতে শ্রদ্ধাপূর্ণ হতে হবে। বিধিদত্ত-প্রবন্ধ পুরুষ আমি নই; আমার বুকে যে প্রেরণা তার এক কণা তোমাদের থাকলে আমি বাঁচতে চাইতাম। আজ আর বাঁচতে ইচ্ছা নাই। যা পেয়েছিলাম তা দিতে পারলাম না, বেঁচে কি হবে? এক নূতন জগতের ছবি শ্রীনিত্যগোপাল আমার চোখের সামনে তুলে ধরে দিয়ে গেছেন···ভারতবর্ষের এক উজ্জ্বল চিত্র। বিশ্বে তো আমার সেইখানে, আমি তো অন্তে দুই নই; বিশ্বের চিন্তাধারার পরিবর্তন আনবেন নিত্যগোপাল। সেই নূতন জীবনের মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তমকে দেখব, জগন্নাথ নিত্যগোপালকে দেখব।···

"মানুষের জীবন যত রকমের ঘটনার সমবায়ে গঠিত, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি একনায়কত্বের অনু-শাসন মানিয়া চলিতেই আরাম পায়। তাহারা নিজের ভার কোনও নায়কের হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্যই সদা ব্যস্ত। পক্ষান্তরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে, যাহারা নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই বহন করিবার জন্য তৎপর, এবং অন্যকেও নিজ নায়কত্বদ্বারা প্রভাবান্বিত করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। প্রথমোক্ত ভাবকে মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন প্রকৃতিভাব এবং দ্বিতীয়টী পুরুষভাব। অর্থাৎ 'সেবা করা'-র ভাব হইতেছে প্রকৃতিভাব এবং 'সেবা লইবার' ভাব পুরুষভাব। মানবপ্রকৃতিতে কোনও একটীই একান্ত সত্য নয়। সেবা না করিয়া যেমন নায়ক হওয়া যায় না, পক্ষান্তরে নায়ক না হইলেও সার্থক সেবা করা যায় না। নায়ক ও সেবক এই পুরুষোত্তম-জীবনের দুইটী স্বাংমূল্যবান ধন আমাদের। সেবকত্ব-স্পর্শরহিত নায়কই একনায়ক (dictator) পদবাচ্য বলিয়া নিন্দিত। পুরুষোত্তম নায়ক হইয়াই সার্থক সেবক, সেবক হইয়াই সার্থক নায়ক।" —শ্রীশ্রী পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-তত্ত্বকণা

উদ্গীলমোক্তার ডাক্তার শিক্ষক—এরা থাকবে সমাজ-সেবক ; অর্থের বিনিময়ে এরা কাজ করবে এ হলে সমাজ কখনও উন্নত ও মুক্ত হতে পারে না।

অন্ত আর একটী অন্তে যাচ্ছে অনন্তের মধ্য দিয়ে।

অন্ত জীবন্ত হইলে শক্তি ও জড় প্রতি স্পন্দনের অন্তর ও বাহিরের সম্বন্ধরূপে পরিণত হয়। অন্তর নিজের অন্তরের ও বাহিরের আবেষ্টনের সম্বন্ধই অন্তর। অন্তর অন্তের ক্ষেত্র নয়। শক্তি অন্তের ক্ষেত্র নয়। ক্ষেত্র আজ পরিধিগত।

জাগরণ ক্ষেত্রের নির্ণয়ত্ব অবতারই দিয়া থাকেন।

ভাগবতের রস-সাধনা মনোময় (sensuous), বিজ্ঞান-ময় (intellectual), আনন্দময় (intuitional)।

আনন্দ চির জটিল, চির কুটিল, অথচ একান্ত সহজ।

কর্মই ভাবের ঘন আস্বাদন।

যিনি একাধারে যোগ ও মায়া তিনিই পুরুষোত্তম-শক্তি যোগমায়া।

নর যোগমায়া নারায়ণ সংহতই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য।

আত্মার তমঃ (static character) হইতেও যিনি উর্দ্ধে, তিনি উত্তম, পুরুষোত্তম।

কোনও এক পথে একনিষ্ঠ হইয়াও পুরুষ বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিবে না যদি সে একই পথের ভিতর দিয়া সর্বপথে ভ্রমণ করিবার সূত্র না পায়।...চাই ভ্রমণ...। ভ্রমণের তাৎপর্য বিশ্বের সকল বাস্তব ঘটনার 'মধু' সহিত পরিচিত হওয়া।

ভ্রমণ ভ্রম নয়, বুদ্ধি-ভ্রংশই ভ্রম।

প্রকৃতি জড় বা মৃত নয়, ইহা জীবন্ত।

মুক্তি দেশ বা কালের বাহিরে নয় ; দেশকালের বাহিরে যে মুক্তি তাহা ঐতদেশিক এবং তাহা ভীরুর জন্য। সকল সম্ভাবনাময় মানুষের মুক্তি ইহাদের ভিতরেই।

প্রতি সম্পূর্ণ বিশেষ-সমন্বিত থাকিয়াই সম্পূর্ণ নির্বিশেষ স্বরূপে প্রকট হন।

মানুষ স্বরূপতঃ নিত্যসিদ্ধ মুক্ত। সে বন্ধ তাকে মুক্ত হতে হবে এ নয়। মুক্তি-বিস্মৃত মানবের মুক্তি-স্মৃতি জাগ্রত করে দেওয়া ছাড়া মুক্ত হবার আর কোন অর্থ নেই।

শ্রদ্ধা হইতেছে 'শ্রৎ' অর্থাৎ সত্যকে, বাস্তবকে ধারণা করবার শক্তি—divine receptivity of consciousness।

উল্টো দিয়েই উল্টোর অভাব দেওয়া যায় না।

মানুষ রহ চায় কেন ? এক পুরাণ হইয়া যায়, কিন্তু মানুষের মধ্যে নিত্য নূতন ভাব, নিত্য নূতন কাজ, নিত্য নূতন সব কিছুর আকাঙ্ক্ষা। তাই সে রহ চায়—রহর মধ্যে এই নিত্য নূতন হওয়ার পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু দেশকালপাত্র ভেদে এক মানুষই নিত্য নূতন হইয়া রহ হইতে না পারিলে দেশকালপাত্রে ক্রমাগত বদলাইয়া চলিলে কোন আস্বাদনই সম্ভব নয়।

জীবনে চাই commonsense ও experience।

সংস্কারের সব কিছু বুদ্ধির স্তরের।

প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা আর একটার মত হয়েই না, ঠেলাঠেলি করে লাভ কি ?

আমি কলকাতা থাকি অর্থ কি ? আমি তো কলকাতার একটা বিশেষ স্থানে থাকি, তবু আমি বলি কি করে যে আমি কলকাতা থাকি ? কলকাতা একটা idea—এটা তো বস্তু নয়। অতএব কলকাতার প্রতি অংশ স্থানের মধ্যেই পুরো কলকাতা আছে অতএব প্রতি অংশ নিরর্থক—তা না হলে আমি কলকাতায় আছি একথা বলতে পারতাম না।

জীব যখন একাধারে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, মানব, চেতন ও জড় সবই হয়, তখনই তার ব্রহ্মত্ব।

কৃপাও জীবনে সৃষ্টি হয়। ও তো ছাদ থেকে টপকে পড়ে না। বর্তমান জীবনের চলার ধারা দিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে—তখনই কৃপার প্রকাশ সম্ভব।

আমার অহংতা দিয়ে বহির্জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বাঁচা অসম্ভব।

বহুকে আত্মসাৎ করার অর্থ বহু দোষে অংশগ্রহণ করাই নয়; বহু দোষাতাকে আত্মসাৎ করা, বহু প্রকাশকে আত্মসাৎ করা বহু প্রকাশকে আত্মসাৎ করেই বহুর আত্মসাৎ। এদের ভিতরে বহু থাকিলে, বহু প্রকাশ থাকিলে একেকে লইয়াই বহুর আত্মসাৎ সার্থক করা যায়।

প্রেম না থাকলে জীবনের মূল্য কোথায় ? মনে না মিলে কর্মের মিলে রচনা দিলে কাজ যতই এগিয়ে যাক্, মানুষ শুধু কর্মের চক্রপথে ঘোঁ ঘোঁ করে ঘুরবেই, তৃপ্তি আসবে না কিছুতেই। কর্মের অনন্তত্বও রক্ষিত হবে না। ক্ষুদ্র যদি ক্ষুদ্র কর্ম তখনই অনন্ত যখন তা তুমার রসে সঞ্জীবিত তা না হলে কর্ম যতই বড় হোক, যতই বহু হোক না কেন, তা মানুষকে ভরে দিতে পারবে না, তাতে জীবনের শূন্যতা ভরে উঠবে না, তা শুধু ফাঁকই হয়ে থাকবে।

সর্ব সংস্কারবর্জিত বিশ্বধর্মই তাৎপর্য ধর্ম।

"শ্রীকৃষ্ণ সার্থক এবনায়ক শ্রীকৃষ্ণ যেমন 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' বলিয়া একনায়কত্বের চূড়ান্ত আদর্শ, 'আত্মৈব হ্যাত্মনঃ বন্ধু আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' বলিয়া যেমন প্রতি মানুষকে 'স্বরাট' হওয়ার জন্যও তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তেমনি আবার 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' বলিয়া নিজ একনায়কত্বকে ভজনের মাঝে ডুবাইয়া দিয়া 'যেষু চাপ্যহম্' বনিয়াও রহিয়াছেন। একনায়কত্বের একেশ্বর হইবার পথে এই তিন স্তরের খোঁজ আজ ভারতবাসীকে লইতে হইবে, যদি তাহাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ একনায়ক হইলেও তাঁহার মত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এমন মর্যাদা দিতে বিশ্বের কোথাও কাহাকেও আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। তিনি সকলকে সমাকরূপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে পাইয়াই ধন্য হইলেন—'সর্বং সমাপ্নোষি অতোঽসি সর্বঃ'। ডিক্টেটারশীপ একান্তভাবে মুছিয়া ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি একান্ত মানুষ লইয়াই বিশ্বের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে যে আরও কত কি লাঞ্ছনা তাঁহার হইত, তাহা অবর্ণনীয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার পথে প্রেমময় এই মানুষটীকে মানুষের হাতে কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতে হইয়াছিল ? তাই মাঝে মাঝে তাঁহার বিশ্বরূপ (ঐশ্বর্যের দিক, dictatorship-এর দিক) খুলিয়া ধরিতেই হয়। সখ্য-প্রেম দ্বারা অর্জুনকে তিনি পথে আনিতে পারেন নাই। নিজ পথে আনিবার জন্য তাঁহাকে 'বিশ্বরূপ' প্রকট করিতে হইয়াছিল।...যে জীবনে একনায়ক ও গণতন্ত্র যুগপৎ (simultaneous), তিনি প্রয়োজনমত কখনও বা dictator হন, কখনও বা গণতান্ত্রিক হন। এই দুই অস্ত্র যিনি কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে সমভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনিই পুরুষোত্তম।" —শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমা

॥ শ্রীঅরুণকুমার কাব্যতীর্থ ॥

যে সমস্ত মহীয়সী মহিলা অধ্যাত্ম জগতে অবস্থান করে জগৎকে সাধনার সিদ্ধিলাভে সহায়তা করেছেন তাঁদের স্মরণ করতে গেলে মন-মুকুরে স্বতঃই ভেসে ওঠে শ্রীশ্রীমা সারদামণি। শ্রীমা সারদামণির মূর্তি মনোমন্দিরে ভেসে উঠলেই আর এক শ্রীমার কথা আমাদের হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, তিনি হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্যা মীরা মাতা'। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরমাপ্রকৃতি সারদামণি যেমন তত্ত্বতঃ এক ও অদ্বিতীয়—শ্রীঅরবিন্দ ও মীরা মাতাও তাই। তাঁরা একই সত্তার দুইটি ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের ভাষাতেই বলি—"মা এবং আমি একই শক্তির দুই রূপ—ঈশ্বর শক্তি, পুরুষ প্রকৃতি, এরা একই ব্রহ্মের দুই দিকের বিকাশ।"

পৃথিবীতে যত মঙ্গলময় কার্য সাধিত হয়েছে তাতে পুরুষের পাশে মহিলার দান কম নয়। অধ্যাত্ম জগতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাইতো কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা হচ্ছে—

বিশ্বে যা কিছু মহৎ সৃষ্টি
চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী
অর্ধেক তার নর।

শ্রীমার প্রকৃত নাম মীরা রিচার্ড। ফ্রান্সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর আবির্ভাব। তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যশালী ব্যাঙ্ক অধ্যক্ষের কন্যা। পাশ্চাত্য দেশের মেয়ের মত তাঁর জীবন বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত হয়নি। তাঁর স্বভাব ছিল আমাদের ভারতীয় নারী, অন্তর্মুখী, লোকমুখী প্রভৃতি বিশিষ্ট স্বভাবের মত। তিনি শৈশবকাল হতেই ধ্যান ধারণায় অনাবিল আনন্দ অনুভব করতেন। কৈশোরের কিশলয় পর্বে পরিণত হওয়ার বহু পূর্বেই তাঁর অন্তর-জীবনে দিব্য চেতনার বর্ষার উন্মুক্ত হয়েছিল। প্রমাণ সেই যুগবি অরবিন্দের বাণী দিয়ে—"শ্রীমা বালাকাল থেকেই আন্তর চেতনায় সব সময়েই মানুষী ভাবের অনেক উপরে"।

শ্রীমার বয়স যখন বার বিশেক তের তখন সত্যের জন্য অন্তরে তিনি বিশ্বদেবের এক অধিষ্ঠিত সাধকের সাক্ষাৎ পেতেন, তাঁরা তাঁকে সাধনমার্গের সন্ধান দিয়ে যেতেন। এদের মধ্যে একজন আবার লিখেছে শ্রীকৃষ্ণ বলে আত্ম পরিচয় দিয়েছিলেন।

সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন বিশ্বের সৌন্দর্য রসে ভরপুর থাকে, তেমনি ভরে উঠতে লাগল তাঁর ধীরে ধীরে চেতনের মধ্যে বুদ্ধদগুলি মীরা মাতা। বুদ্ধদগুলি ধীরে ধীরে বিলয় থেকে পূর্ণে পরিণত হয়ে পুষ্পিত হয়ে উঠল। এক দিন শুভক্ষণে হল নারীজীবনে সার্থক হবে সুবিখ্যাত দার্শনিক পল রিচার্ডের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তিনিও ধর্ম-পিপাসু, অমৃতের সন্ধানে তাঁর মন-মধুপ লক্ষ বিস্তার করে। মণির সঙ্গে কাঞ্চনের যুক্তি যোগসূত্র স্থাপিত হল। স্বামীর সঙ্গে মীরা মাতা ফ্রান্সে গমন করেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। অন্তরের অদম্য ধর্ম-পিপাসায় এই পুণ্য ভূমিতে তিনি বিশ্ব পরিভ্রমণ করলেন—আফ্রিকার ঘন অরণ্য থেকে আরম্ভ করে আলজিরিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত। দুটি পিপাসার্ত হৃদয় মেতে চলেছে যেন সুধার সন্ধানে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি—"নদী ছুটেছে মহা সাগরের দিকে, অন্ধকার ছুটেছে আলোর, জীবন ও মৃত্যু ছুটেছে মহানির্বাণের পথে, মানুষ ছুটেছে স্বর্গে"।

পৃথিবী পরিক্রমার পথে একদিন শ্রীমা ও তাঁর স্বামী অবতরণ করলেন জাপান রাজ্যে। সেখানে জানতে পারলেন শ্রীঅরবিন্দের নাম ও তাঁর অলৌকিক যোগ সাধনার বার্তা। তাই ছুটলে হাজির হলেন পণ্ডিচেরী আশ্রমে। সেই যাত্রার শুরু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ। জীবন-তরী নিয়ে যে মাণিকের খোঁজে এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন পেলেন সে অপরূপ মাণিক্য।

রতনের খোঁজে সপ্ত সিন্ধু ঘুরা দেশে দেশে ফিরে,
অঙ্গন রত্ন মিলিল সগরা রত্নাকরের তীরে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তখন রণদামামা বেজে উঠেছে। তাই শ্রীঅরবিন্দের দুর্লভ সান্নিধ্য পেয়েও প্রত্যাবর্তন করলেন আপন দেশে। অবশ্য যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন পণ্ডিচেরীর পুণ্যাঙ্গনে—উৎসর্গীত হ'লেন পুণ্যপ্রাণ শ্রীঅরবিন্দের পাদারবিন্দে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ১টা ২৬ মিনিটে পবিত্র তপোবনে নেমে এল শোকের ছায়া। মূর্তসুধা শ্রীঅরবিন্দ হ'লেন অন্তর্হিত। কিন্তু আশ্রমের সমস্ত কর্মই রয়ে গেল মাতৃহস্তের মত চালিয়ে যেতে থাকলেন শ্রীমা। নয়নে নিদ্রা নাই—আশ্রমের উন্নতি কল্পে নিত্যনিয়মনা তপস্বিনী। আপনার মুক্তি কল্পে ধ্যান ধারণায় শুধু ব্যাপৃতা থাকেন নি মীরামাতা। আশ্রমের স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাতেও নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। পুষ্পগুলিগুলি সূর্যকিরণে অকৃপণ পাপড়ি মেলে; এই জননীর স্নেহস্পর্শে তেমনি শিশু বিদ্যালয়গুলি প্রাণের পাপড়ি মেলে ফুটে উঠল। ছেলে মেয়েদের অজ্ঞাতসারেই শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনার সাধকরূপে কিশোর কুমার কুমারীদের গড়ে তুললেন।

সকলকে আনন্দ দানের জন্য আনন্দময়ী মীরা মার কি অন্তরের ঐকান্তিক ইচ্ছা। আশী বৎসর বয়সেও সকলকে সুখী করার জন্য প্রত্যহ বৈকালে আশ্রম-সাধকদের সঙ্গে টেনিস খেলতেন। সংঘ জননীর আসন ক্ষেত্র পণ্ডিচেরী। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কর্ম হতে বাঁধা ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব কর্মে মায়ের স্নেহ-মমতা তত্ত্বাবধান। দুনিয়ার তপোবনে যেন সীতার বাল্মী রামায়ণ রূপে পরিস্ফুট।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।

প্রবৃত্তি ও কর্মের মাঝে রেখে সবার মন থেকে জননী অহং ভাবটি মুছে ফেললেন। শ্রীঅরবিন্দ করেছিলেন দিব্য জীবনের সাধনা। শ্রীমা সেই সাধনার স্রোতধারা সবার হৃদয়-সৈকতে বইয়ে দিলেন।

এল ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের অশুভ ক্ষণ ১৮ই নভেম্বর প্রভাত হ'ল মহাজীবন দীপ নির্বাপিত। শ্রীমা ইহধাম ত্যাগ করেছেন। কিন্তু পণ্ডিচেরীর বুকে যে পুণ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে গেলেন, তা কোনদিন নির্বাপিত হবে না। দিনে দিনে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার সাধন-ক্ষেত্র দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। "ওঁ শ্রী অরবিন্দ মীরা।"

আপন হারা

॥ শ্রীগণেশ চক্রবর্তী ॥

আপন সুরের মায়াজালে
হৃদয় যখন আপনি পড়ে বাঁধা
হয় না তো তার আর কোন সুর সাধা।
প্রতিদিনের চলার পথে
জীবন যখন ছন্দ খুঁজে ফেরে
জগৎটা তার বিশেষটা নেয় কেড়ে।
নির্বিশেষের আহ্বানেতে
বিশেষ যখন নিঃশেষে পায় ছুটি
বিশ্বজনীন আত্মবোধের আনন্দ নেয় লুটি।
বিশ্বরূপের একতারাতে
আনন্দের এ সুরটি যখন বাজে
হৃদয় ভোরে সেই সুরেরি মাঝে।

শুধুই 'আমি'র গণ্ডীমাঝে
বাজতে থাকে বেসুর যত সুর
সে সুর হ'তে জীবন অনেক দূর।
সে সুর যখন ঐক্য নিয়ে

একের মাঝে বাজে একই তানে
বিভোর সে হয় আনন্দ রস পানে।
আপন প্রিয় বাঁধন ছেড়ে
বাঁধন মানে সকল প্রিয় কাছে
আনন্দে তার হৃদয় তখন নাচে।

আমার মাঝে সেই সুরেরি
ধারা বয়ে চলে দিবস রাত্রি,
বাইরে তারি পরশ পেতে কর্মযোগে মাতি।
কর্মে ফসল ফলে, আমি
পূর্ণ নাহি করি আমার ঘর
বিশ্বমাতার ফসল তারি ছড়াই বিশ্বপর।

ফসলের এই ধরির মুঠে
বিশ্বলোকে পূর্ণতা দেয় আনি।
সবার সুখে হয় যে সুখী
আত্মহারা আমার হৃদয়খানি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৪৯)

—১৯৫৪—

তোমার প্রিয় নাম 'অহম্'। তোমাকে অহম্ বলিয়া ডাকিব। আর ও মঠে যাই না। নারায়ণ সহকার আসে। কুমার গ্রাহকের চাঁদা আদায়ে বাহির হয়। রেণু প্রেস হইয়া ছায়া মুখোপাধ্যায়ের ৪০০ টাকা নিয়া আসে। সকালে বিনয় ঘোষ—প্রিন্টিং পাবলিসিটি—আসে। তাহার নিকট বাঙ্গাইবাটির কবির উপযুক্ত পরিকল্পনার কথা বলি। সে ২০০২৫০ টাকা তুলিয়া দিবে। প্রেস সে ৬ হাজার টাকায় মধ্যে করিয়া দিবে। ২ হাজার থাকিবে running capital। প্রেস হইতে job workদ্বারা বেশ আয় হইতে পারিবে। নিজেদেরও নিযুক্ত রাখা চলিবে। ঘর করিতে বিশ হাজার টাকা লাগিবে। তেতলা করিবার মত ভিৎ করা হইবে। চল্লিশ হাজার টাকা তুলিবার কথা ঘোষণা করা যাইবে। সে বলিল, আমিও গিয়া থাকিতে পারি। যে প্রাণ লইয়া আমি চলিয়াছি, সেই প্রাণকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ইহাদের বলি। যদি কেহ পায়ের পাতা তলে কিনার, আমার পুরুষোত্তম তাহার জন্য তোমার সমানে তলে যাবেন। আমার 'প্রকৃতি'ও তাই। আমার জন্য যে যাহা সেবা করিবে, সকলের সে সেবা আমি শোধ করিব। তাহাদের পরোক্ষে তাহাদের ভাবনা আমি ভাবি ও ব্যবস্থা করি। নিজের ভাবনা তোমরা নিজেরা ভাবিও না, ঠাকুরকে তোমাদের ভাবনা ভাবিতে দেও। উপরের তলে উঠিলেই সমস্যা হাল্কা হইয়া যায়। পরিচ্ছিন্নতার তলে শুধু ঠেলাঠেলি। সারা জীবন ইহা পরীক্ষা (experiment) করিয়াছি। ...সন্ধ্যায় সেবানন্দ আসে। ১ই এপ্রিল

নিতাগোপাল, তুমিই আমার রাম কৃষ্ণ গৌর। দুর্গামিয়ে দীক্ষার সময় তুমি বলিয়াছিলে, 'এক বৎসরের মধ্যে তোমাকে পরিবর্তন করিয়া দিব'। আমি তখন হাসি মঠে—একেবারে তোরে দেখিতেছি, তুমি আসিয়া বলিতেছ, তাখ, আমি কতদূর হই। তুমি রাম হইলে, গৌর হইলে, পরে কৃষ্ণ রূপ ধরিয়া এমন জোরে টান দিলে যে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সেই দিন হইতে 'কৃষ্ণ' আমার জীবনে প্রবেশ করিলেন। এইজন্যই বুঝি বরিশালের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পরেশ চ্যাটার্জী বলিয়াছিলেন, 'এর ভিতর মালিক ঢুকেছে'। হাঁ, তুমি ঢুকিয়াছ। যে পায়েপদ্ম লইয়া সরযূর তটীর আলো করিয়াছিলে, যে পায়েপদ্ম লইয়া আসিয়া তুমি পাষাণী অহল্যার বুকে স্থাপন করিয়া ছিলে, যে পায়েপদ্ম বুকে ধারণ করিয়া ব্রজগোপীগণ প্রেম পাইত পাছে তাহাদের বুকের স্পর্শে তোমার চরণে আঘাত লাগে, সেই পায়েপদ্ম মস্তকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছ। আমি ধন্য। তোমার অন্তরঙ্গ তোমাকে ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ- ধনজন—আমাকে দেও, দোহাই তোমার বীরেন্দ্র দাশগুপ্ত আসেন। যখন দৈনন্দিন ঘটনার অভাব ছিল না, তখন ডায়েরী লিখিলে ইহাদের অনেক কাজে লাগিত। কত ঘটনা, কত কথা, কত মানুষের সঙ্গে সংযোগই না জীবনে হইয়াছে। সব অতলে ডুবিয়া গিয়াছে। রেণু মজুমদারের সেই নিয়া আসে...রেণুকেই সেক্রেটারী করা উচিত—কুমারও বলে। প্রতিভা ও কুমার রেণুর জন্য একটী পৃথক ঘরের কথা বলিয়াছে। কুমার সকালের দিকে বাহির হইয়া ৪০০ টাকা আদায় করিয়া আনে। বিমল আসে, তাহাকে পরিকল্পনা শুনানো হয়। বিমল প্রথমে গম্ভীর হয়, পরে আলোচনা করে। মাখনবাবু আসে। সেবানন্দ সন্ধ্যায় আসে। চৈতন্য তাহাকে বলিয়াছে,

তারিণীবাবু ও তাঁহার স্বামী আমার এখানে আসিয়াছে, আমাকে ইন্টারভিউ না করাটা অন্যায় হইয়াছে। ওটায় 'আত্মিকর্ষণ' পাঠ হয় কি অদ্ভুত পড়াশুনা! এইভাবে জাতি লইয়া আলোচনা মানুষের পক্ষে উপস্থিত করিতে পারিলে মানুষ সুস্থ হইত, ইহা নিশ্চয়। ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আধুনিকতম এই চিন্তাপ্রণালীর সংযোগই অপূর্ব। 'ন ভূতং ন ভবিষ্যতি'। আশ্রমের constitution সম্বন্ধে আলোচনা হুমায়ুন ও রেণুর সঙ্গে হয়। ছেলেরা ইহার প্রতি লোভ করিবে না। প্রাণ সঞ্চার করিলে জড়ের কোন বাধা নাই। মোহান্ত system, পরাধীন system সম্বন্ধে হুমায়ুনের সঙ্গে কথা হয়। ১০ই এপ্রিল।

নিত্যগোপাল, তোমার সঙ্গে আমার পথে দেখা সকল ভেদের বাহিরে। সকল প্রাচীরের গণ্ডী ডিঙাইয়া তুমি আর আমি চলিয়াছি দেহে দেহ, প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, আত্মায় আত্মা মিলাইয়া। প্রাচীরের মধ্যে তুমি আমার কেহ নও, আমিও তোমার কেহ নই। তোমার জীবনে হইতেই বিশ্বের প্রাক্-বিশ্বসত্তা স্ফুরিত হইয়াছে গঙ্গা-ধারার মত তুমি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়াছ। ভিমের খোসা ভেঙ্গে করিয়া পাখীর ছানা বাহির হওয়ার মত বিশ্বমানব আজ সকল উপাধি পরিত্যাগ করিয়া দিয়া বেশে উন্মুক্ত আকাশতলে বিশ্বনাগরিক রূপ লইয়া বাহির হইবার জন্য বেদনা বোধ করিতেছে। ওগো বিশ্বনাগরিক, তোমার জয় হউক। রেণু সকালে অনিমেষ চৌধুরী, ডাঃ কে. সি. মুখার্জীর বাসায় ঘুরিয়া ১২ টার পর আসে। ২ টার পর এস সরকার, মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর ফেরে। সন্ধ্যার পর নীলরতন-বাবু আসেন, বীরেন ধানাতীও। তারিণীবাবু বলিয়াছেন, আমি তাঁহাকে অনেক কিছু বলিয়াছি। আমার সঙ্গে তাঁহার ৬৩/১ পাই-ই নেমে না। আমাকে এমন করিয়া কাঁকি দিয়া তাঁহার লাভ? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, 'যদি এই মঠ হইতে কাহাকেও প্রথমে তাড়াইতে হয় তবে সে হরিস্বরূপানন্দ; তাহার মত মঠের অহিত আর কেহ করিতেছে না ইত্যাদি।' বেশ হইয়াছে! নীলরতনবাবু ও বীরেনবাবুকে পরিস্থিতি শুনাই। বৈকালে জগন্নাথ সাহা আসিয়াছিল। তোন এক রবিবারে তাহাদের ওখানে একটী সভায় বক্তৃতা দিবার কথা বলিল। কুমারের সঙ্গে প্রাণখোলা অনেক আলাপ হয় আমার জীবনের সম্বন্ধে। কোন্ কোন্ আদেশ ভেঙ্গ করিয়া আমি আসিয়াছি। সব বিষয়ের সঙ্গে তাহাদের, অমত হয়া পড়ি নাই কোথাও। সত্যা-ব্রত একদিন বলিয়াছিল, 'আমরা বসিতে চাই'। তাহার স্নেহ কিন্তু আমার ভেঙ্গ ছিল না। তাহাকেই জন্য বেদনা রাখিয়াছিলাম। সে যখন উহা নিল না, উহা গলায় জড়াইয়া দিয়া ইহাও বলিয়াছিলাম। সে নেয় নাই, অথচ তাড়াইয়াও দেই নাই রাখিয়া দিয়াছি। আজিও পথের দিকে তাকাইয়া আছি, থাকিব। রক্তের দাবী ব্রহ্মময়ী করিবার একটা নেশা ছিল। সত্যব্রতই আমায় বেদনা বলিবে এ লোভ ছিল। বেদনা আমার প্রচুর। তবু বুক ভাঙ্গিয়া যায় নাই। আমি চলিয়াছি, চলিব। আমি কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করি নাই, কাহাকেও ছাড়ি নাই, সবাই আমাকে ছাড়িয়াছে।...সকলেই দক্ষিণেশ্বর যাইব এইরূপ স্থির হয়। ...১১ই এপ্রিল।

নিত্যগোপাল, তুমিই আমার সরল, চির সরল, শেষ অবলম্বন। তোমাকে বুকে লইয়াই চলিয়াছি। আমার জীবন বড় বেদনার জীবন। তোমার মহানির্বাণ মঠ হইতেও 'দূর দূর'। কোথাও বুঝি আমার স্থান নাই। যে ত্রিদিবেশ্বর আমার সঙ্গে তফাৎ তাহার কথামত ৬৩/১, সেও আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলিল যে যেন আমার বড় অসুবিধা। সে নাকি আমার উপাসনা মতই চলে। এমনটী তো আমি কখনও দেখি নাই। আমি চলিব, একাই চলিব। তুমি তোমার বিরাট বিশ্বনাগরিক জীবন লইয়া আমার আছ। কেউ না থাকে, কি আর আসি করিব? সকলেই তো ছাড়িয়া গেল! কত টানা-টানিই না মানুষ লইয়া করিলাম। ২০ মাসেরও অধিক-কাল মহানির্বাণ মঠে যাতায়াত করিলাম। তাহাদের প্রাণস্পর্শ পাইলাম না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। 'বেশ করেছ কালী'। আমার বুকের ধন বুকে থাক। হুমায়ুনের মাথার পিছনের ব্যথার জন্য আজ তিনের বেলা কিছু খায় না। রাত্রিতে ভাত খায়। রেণু সকালে বাহির

হইয়া ১০।৷ টায় ফেরে, আবার ৪টায় বাহির হইয়া ৫টায় ফেরে। কুমার ১টায় আমার উপরে খাওয়াদাওয়ার বাহির হইয়া যায়। ফেরে প্রায় ৮টায়। আমি তো ভাবিয়া সারা। না খাইয়া রোদের মধ্যে মাথার উপর লইয়া বাহিরে এতক্ষণ থাকা কি উচিত? বাহির হইবার এমন কি দরকার ছিল? রেণু ৫টার পর সিঁদিরপুর বাস সেখানে যায় নাই। সে যখন কালীঘাট ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন খিদিরপুর সমোনোস্তত কুমারের সঙ্গে সেখানে যেয়া। আমার মত করিয়া সব ঘটনা বিস্তৃত করিতে বলিলাম। ১০ টার পর দুইটা আসে। নীলরতন-বাবুর কাছে আমার ট্রাঁটি না হওয়ার কথা এবং ট্রাঁটী না হওয়ার জন্য নীলরতনবাবুর দুঃখের কথা অবগত হইয়া দেখা করিতে আসিয়াছে। তারিণীবাবু যে দুঃখ আমাকে দিয়াছেন, তাহা জীবনে ইতিপূর্বে কখনও পাই নাই। নূতন অভিজ্ঞতা বটে!...রেণু আজ রাইটার্স বিল্ডিং এ আগামী বৈশাখ হইতে গ্রাহক হইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত দিয়া আসিয়াছে। গতকাল এস. সরকার রেণুকে বলিয়াছেন যতদিন নিত্যগোপাল লইয়া গোপাগাণ্ডা চলিবে তিনি গ্রাহক হইবেন না। জীবিত থাকিতে কোন প্রচার করা হয় নাই কেন? পাছে দোষ ধরা পড়ে সেইজন্যই না একশত বৎসর পরে এই গোপাগাণ্ডা? আমরা জনসাধারণ উহা বরদাস্ত করিব কেন? ইত্যাদি। রেণুর কোন কথা সে শুনিবার জন্য প্রস্তুত নয়। —১২ই এপ্রিল।

রাধারাণী আমার, অযাচিত করুণায় তুমি আমার হৃদয়-আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলে। আমাকে তোমার ছাঁচে গড়িয়া তোল। আমি তো কোনও দিন তোমার কথা কল্পনায়ও ভাবি নাই। কেন তুমি আসিলে? আসিয়াছ যদি, আমাকে তোমার ছোঁয়াচ দিয়া পরা প্রকৃতিকে গড়িয়া তোল, আমার প্রকৃতির রূপান্তর হউক, যোগমায়া রূপ গড়িয়া উঠুক। আমি তোমার মত কৃষ্ণকামিনী, কৃষ্ণকামিনী হইব। ঠাকুর, তোমার আমার পৃথকত্ব দূর হউক। তুমি আমি দুই—ইহা ভাবিতে কষ্ট হয়। উপলব্ধি করিব—তুমি আমি এক। ওগো আমার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তোমার মত দ্বিতীয়টী তো আর দেখি না। আমি তোমার তত্ত্বেই তো বিশ্বমানবের কাছে ধরি। তোমার নাম-রূপ নয়। কেন না, বিশ্বাসী প্রত্যেকে তোমার নাম-রূপ নিবে না, নিতে পারে না। সমন্বয়-তত্ত্ব নিতে পারে, নিবেও। তবে তোমার কথা বলি তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সমন্বয়-তত্ত্বের একটী দৃষ্টান্ত না থাকিলে উহা 'ভাবালুতা' ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি সমন্বয়-তত্ত্বের মূর্ত দৃষ্টান্ত। তোমার জয় হউক। রেণু বাহির হইয়া ফেরে ৪।৷ টার পর, কুমার ফেরে ৫টায়। সেবানন্দ আসে সন্ধ্যার পর।...সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা 'সন্ন্যাস' 'সন্ন্যাস' করিয়া উন্মাদ। কিন্তু 'ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়' লেখা এবং ঠাকুরের প্রয়োজনমত সাদা কাপড় পরিধান এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে 'সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ এবং গাঁইয়া বেশও বজ্জন' এই বাক্যগুলি কি গেরুয়াতেই সন্ন্যাসের চিহ্ন ঘোষণা করে? উপবীত যেমন ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন নয়, গৈরিকও তেমনি নয়। স্বভাবে যিনি সন্ন্যাসী, তিনিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস-ব্যবসায়ীর পথ বর্তমান যুগে নাই। সবার উপর মানুষ। মানুষ সন্ন্যাসীরও উপর, সংসারীরও উপর, ব্রাহ্মণেরও উপর, শূদ্রেরও উপর, সাধুরও উপর, অসাধুরও উপর। প্রকৃত সন্ন্যাসীর ঘৃণা বিদ্বেষ লজ্জা অরুচি কিছুই নাই। —১৩ই এপ্রিল।

ওগো সকল লেখকে পরিপাক করিয়া অশেষ, সকল কাল-পরিণামকে পরিপাক করিয়া ওগো পুরুষোত্তম, গত ১৩৬১ সালের সকল করা না করা, সকল পারা না পারা, সকল আবর্জনা, সকল ভুল ত্রান্তি তোমার পায়ে নিবেদন করিলাম। তুমি সনাতন, তুমি নবীন। তুমি কাল-বরণ। কাল যোগায় তোমার দেহের বর্ণ। সকল কালকে কালাতীতে গড়িয়া তুলিয়া তুমি অনাদি অনন্ত জীবন-প্রবাহে ছুটিয়াছ। আমিও তোমার সঙ্গে চলিব। মহাকালের বুক চিরিয়া কাল-তরঙ্গের সাথে লড়ি, বহিয়া চলিতে হবে তরী'। অনন্ত অতীত আমার জীবনে অনন্ত নবীনে গড়িয়া উঠুক। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি কাল-তরঙ্গে দোল খাইতে খাইতে এক-তনু, এক-প্রাণ ও একাত্ম হইয়া চলিব। তোমার জয় হউক, আমার জয় হউক। 'মমঃ ভূয়াম্ নমো মহ্যম্ ভূয়াৎ মহ্যম্ নমো নমঃ'। রেণু সুহৃৎ মিত্র, প্রিয়রঞ্জন রায় ও শশিভূষণ দাশগুপ্তের

নহি আনে সেই আবেদনটিতে। মুখার্জের সেই পিতৃপীড়ন খুব বাজে। স্পেসিফিক ১ ৩৭৯ প্রয়োগ করি। মুখার্জে আসে। বেণু ইস্কুলেখাকে আমি যে দক্ষিণেশ্বর যাইব, তাহা খবর দিয়া আসে। কেহ আসিয়া এই ১লা বৈশাখে আমাকে না পাইয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া যায়, ও হাতে আমি বেদনা বোধ করি। আমি যে মানুষের ক্ষুদ্রতম বেদনার খবর রাখি ইহা কি ছাই মানুষকে বুঝাইতে পারিলাম? চিহ্ন বলে স্বপ্নে ২ বৎসর পরে আমিও এই কথার উপর সে এখানে আসিয়াছে, এবং এই প্রতিশ্রুতি কি আমি দিতে পারি? আমার স্থান নাই, টাকাও নাই। আর দিয়াও যদি থাকি, তাহলে সাধনার অভাবে ২ বৎসর ১০ বৎসর হইতে পারে, আমার সাধনার ফলে তাহা, ৩ মাসও হইতে পারে? সে সাধনা কিছু নিল না। তাহা হইলে আমিই প্রাণপণ করিতাম আসিবার জন্য। রাত্রি ৯। টার পর অন্য আসে। সন্ধ্যায় নীলরতনবাবু আসেন। তিনি কাল আমাদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাইবেন। তিনি কিছু টাকা দিবেন বলিলেন। সুহৃৎবাবু ও প্রিয়রঞ্জনবাবুও দিবেন।···—১৪ই এপ্রিল।

১লা বৈশাখ। নিত্যগোপাল, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ আমার জীবনে আসার পর হইতে যে পরিকল্পনা আমার বুকের মধ্যে জমিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, আজ সেই পরিকল্পনাই তোমার সামনে উপস্থাপিত করিলাম। পরিকল্পনাও তোমার, আমিও তোমার। এ তো তোমারই কাজ। আমি সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী। তুমিই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ হাতে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছ। আমি তাহা কার্যে রূপদান করিয়া তোমার বিশ্বকে তোমার সামনে ধরিয়া তোমার মুখে হাসিটুকুর মাধুর্য আস্বাদন করিতে চাই। তোমার জয় হউক। প্রার্থনার মধ্যে পরিকল্পনাটি বেণু পাঠ করে। আমরা ৯ জন দক্ষিণেশ্বরের জন্য ৬৫ টার ট্রেনে উঠি। আমি উষারিণী ও মুখার ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে ও অপর ৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। নীলরতনবাবুও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এসপ্লানেড হইতে স্টেট বাসে যাই—৮.১০ এর পর পৌঁছি। প্রথমে বিশ্বরূপা সেবাশ্রমে যাই—যদিও নীলু ও পারুল তাহাদের বাসার কাছে নামিতে বলে। পরে আমি ও কিতীশবাবু বিশ্বরূপা নীলুদের বাসায় আসি। চিহ্ন ও তাহার স্ত্রী ঘরে তৈয়ারী মিষ্টি নিয়া আসে।...নীলুরা জলযোগের পর ১১টার পর আমরা বিশ্বরূপে যাই। প্রসাদ পাই।...৪ টায় সভার কাজ আরম্ভ হয়।··· অতীনবাবু আশ্রমের উদ্দেশ্য, গত বৎসরের কার্য বিবরণী ও আয়-ব্যয় আলোচনা করেন লিখিতভাবে। পরে জ্যোতিষবাবু, পরে এক পণ্ডিত মহাশয় পরে আমি সভাশিল্পরূপে বলি। 'প্রণমেন দেব ঘুনয়ঃ' ও 'ন কামযেহহম্' শ্লোক আলোচনা করি। বিশ্বরূপা ও বিশ্বনাগরিক তত্ত্বও আলোচনা করি। বিশ্ববাসী নরনারীর আজ জন্ম করিতে হইবে 'আমি বিশ্ব-নাগরিক' এই মহাবাণী। শ্রীনিত্যগোপালই বিশ্বকে ব্রহ্মমূলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আদি বিশ্বনাগরিক। যোগেন সরকার ও তাহার স্ত্রী বিশ্বরূপে যান। খড়দহ হইতে মীরা আসে তার এক বোনকে সঙ্গে করিয়া। চিহ্নর ওখানে সন্ধ্যায় খাওয়া সারিয়া প্রায় ৯টায় ট্রেনাটেলির মধ্যে বাসে উঠি। জ্যোতিষবাবু প্রায়ক হন।···চিহ্ন প্রভৃতির সামনে পরিকল্পনা পাঠ হয়।...১৫ই এপ্রিল।

ঠাকুর, সকল কথার মধ্যে তোমা ছাড়া কিছিয়া আমি অন্তরতম সঞ্চিত তোমার ঐ শীতল কমল পায়ে শরণ লইনু। জয় বা অজয়ের কুলই উত্তাপের সৃষ্টি করে। নিত্যানিত্য সংযোগই তাপনাশক। আমার জীবনে তোমার পরিকল্পনা মূর্ত হইয়া উঠুক আমার সকল সঙ্কল্প নির্বাপিত হউক। তোমার সঙ্কল্পই আমার সঙ্কল্প। তুমি অপরিচিত রহিয়া গেলে, আমি তোমাকে পরিচিত করিব। বিশ্ব তুমি ছাড়া তোমার পরিচয় কি দিব? সূর্যরশ্মিই সূর্যের পরিচয় দেয়। তুমি সূর্য, আমি তোমার রশ্মি। আমি তোমার রশ্মি বনিয়া যাইব। বিশ্বাকাশে সূর্যের মত তুমি ধরধর করিয়া জ্বলিতেছ। আমিও জ্বলিয়া উঠিয়া তোমাকে প্রকাশ করিব তোমার পাদপদ্মের ছোঁয়া লাগাইয়া বিশ্ব গড়িয়া তুলিব। উষারিণী মহুর বাসায় যায় মুখার নীলুবাবুর সঙ্গে দেখা করে, বিনয়ের প্রেসে পরিকল্পনাটা ছাপাইতে দিয়াও আসে। বরিশালের জীবন ঘোষ আসে। তাহার লেখা শুনায়। অনন্তাথ সাহা আসে। কাল সে ৪টার পরে

গাড়ী নিয়া আসিবে। ৬টায় সভা হইবে ৮টায় পর বীরেন আসে। আজ সকালে হঠাৎ তারিণীবাবু আসেন ট্রাস্টি নিয়োগের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তিনি তোলেন না। মঠের সব খরচের ভার দেন, সুশীলার সঙ্গে কোথায় যাইবে পরিচালিতে আলাপ হইয়া নলিনীবাবুর সঙ্গে নিয়োগের কথা বলিয়া বিদায় হন। শরৎবাবুদিগকে তাহার দেয় ১০০ টাকা দেন নাই। তাঁহার প্রাপ্যের চাঁদা দিবেন ইত্যাদিও বলেন। রাত্রিতে উপরে শুইতে গিয়াছি তখন রেণু ঘরে দেয় যে প্রতিমার নাকে দিয়া রক্তপড়া আরম্ভ হইয়াছে। নীচে আসি। স্পিরিটের সঙ্গে দিয়া plug করিয়া দেওয়া হয়। বরফের প্রয়োগও করে। Sp ১ ৬ বার খাওয়ানো হয়। ১১টায় রক্তপড়া থামে। তাহার পর উপরে শুইতে যাই। ...সেবানন্দ আসে। চিদানন্দ কাল আসিয়াছিল প্রণাম করিবার জন্য। ঠাকুর কলাণে বরুন আশীর্বাদ করি।

১৬ই এপ্রিল।

নিত্যগোপাল, এত পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য পথ চলিব? প্রকৃতিকে, মায়াকে, আবেষ্টনকে ব্রহ্মরূপ প্রদান করিয়া নিজ জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইব, একীভূত করিব ইহাই ছিল সাধনা। পারিলাম কৈ? মায়া কি আমার জীবনে 'রাধা' হইবে না? জটিলতা-কুটিলতা কি আমার জীবনে পরিপাকপ্রাপ্ত হইবে না? সখা আমার, বন্ধু আমার, পরম সুহৃৎ স্বামী আমার, আমার তো তুমি ছাড়া কেহ নাই, কিছু নাই। ঘরে বাহিরে সর্বত্র আমার প্রতিকূলতা—তবুও তোমাকে বুকে লইয়া চলিব। চলা ছাড়া আমার গতি নাই। চলার ছন্দ আমাকে শিখাইয়া যাও। এতদিন 'চলা' ছিল ব্যবহারিক ভাবে সত্য, স্থিতিই পারমার্থিক সত্য, তাই 'চলার' সঙ্কোচ ও শেষপর্যন্ত নিরোধই ছিল সাধনা। কিন্তু যে জন 'চলা'-কেও পারমার্থিক সত্য মনে করে তাহার পক্ষে চলার ছন্দ জানা ছাড়া উপায় কি? আমি শরণাগত, চলার ছন্দ শিখিয়া আমি চলিব, প্রতিমাকে Sp ১ বার, ২ ও বার ৪ ও বার, ২৬ ও বার দেওয়া হয়। ...৬টায় এখানে জগন্নাথ সাহা আসে তাহার 'পল্লীশ্রী'-তে আমাকে ভাষণ দিবার জন্য নিতে। ৭টা হইতে ৮টা পর্যন্ত বক্তৃতা: শ্রীরুক্ষ-জীবন সমগ্র জীবন—ভাবুক ও রসিকদের জন্য একটী common platform দিবার সফল চেষ্টা। (তাগবত) 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং', 'মল্লীমাল্যশশি'—সেখানে তোতাপুরী নাই সব উঁচু মাথা বৃন্দাবনে ছোটর চরণতলে—তাহার জন্য ভগবান ব্যাকুল - 'কেবে মরি লাগে পরাণে তুমি আমার 'কাজল' -'আমি তো তোমায় চাহিনি জীবনে'—ভ্রেয়াস্ত-বিঘ্নইতিদং মমাদয়ম্'—যাহাকে ব্রহ্মভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য অবতার আসেন, যে জীবন-দর্শন ২ হাজার বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই কার্যোপযুক্ত করিবার জন্য নিত্যগোপাল আসিয়াছেন। আমি উপরের মত চলিব। 'যাত্রা শুভ, যাত্রা কর, যাত্রীগণ'।.. আমি ও রেণু গিয়াছিলাম। লোকেরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। ইহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাহারা একমত।—১৭ই এপ্রিল।

ঠাকুর, তুমি আদি যখন সকল রসমে ধর্মে জ্ঞানে প্রেমে এক অদ্বৈত হইব, তখনই বিশ্ব লইয়া তোমার ধরার তার হয়রান সমস্যা ও আমার ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়। নর ও নারায়ণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অপরার্ধ। যিনি 'ঘাড়ুপিরুষম্ অস্তি' এবং যিনি 'অনন্ত অস্তিত্বমীতি'—তাহারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। থাকা ও না-থাকা দুই-ই 'complete by excluding each other'—দুই-ই স্বয়ং অবও অন্যের পক্ষে। প্রবৃত্তির অপর অর্থ নিবৃত্তি, নিবৃত্তির অপরার্ধ প্রবৃত্তি। কেহই একা সমগ্র পূর্ণ নয়। 'অস্তি' হইতেছে জীবনের dynamism, আর 'অনন্ত' হইতেছে জীবনের static aspect: দুইটী পাখী পরস্পরকে পূরণ করিয়া চলিয়াছে। তুমি-আমি-বিশ্ব—ইহাই পরিপূর্ণ সত্য। ...বিশ্বরা যদি আমার 'অনুগত' হইয়া থাকে, ইহাদের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। ইহারা সহযোগিতা না করিলে কেমন করিয়া সমস্যার সমাধান করিব। ইহাদের দ্বারা ইহাদের সমস্যার সমাধান করিলেই না তাহা সুন্দর হয়। বাহির হইতে কোনও সমাধান আনা যায় না—চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। রেণু ডেকে দিয়া আসে। আমার এখানে যে স্বাধীনতা ও অধীনতার সমন্বয়ের সাধনা আছে, তাহা কি কোনও সংসারে আছে?

বছর মতে 'গৃহকর্মে' পর্যন্ত মেয়েদের কোনও কথা বলবার স্থান নাই। মন্থর 'বেদে' করিয়া তো আমি রাখি নাই। ব্যক্তিগতভাবে কি মর্যাদাই না আমি ইহাদের দেই। সন্ধ্যার পর ইন্দুলেখা আসে খাবার লইয়া। —১৮ই এপ্রিল

ঠাকুর, তুমিই আমার জীবনের মূল। তোমার রস আহরণ করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। তোমা হইতে বিচ্যুত হইলেই আমি শুকাইয়া যাই। ওগো রসাগার, তোমার রসই আমার উপজীব্য। তুমি প্রাণঘন ব্রহ্ম বস্তুকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অবতীর্ণ। আজ ধরা ব্রহ্ম-রসে ব্রহ্ম-গন্ধে ব্রহ্ম-স্পর্শে ব্রহ্ম-শব্দে মন্ত্রপ্রাণিত হইবে। রাধারাণীর নীতিই পরিবার নীতি, সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি—সে নীতির মূল তাৎপর্য হইল সকলকে তাঁহার বাঞ্ছিসত্তার পরিপূর্ণ বিকশিত করিয়া সঙ্ঘ রচনা করা। আজ বিশ্বের সর্বত্র এই রাধানীতিরই অবহেলার দেখিতেছি রাষ্ট্রক্ষেত্রে পক্ষীল ইহারই বহিঃপ্রকাশ। বিশ্বের সব রাষ্ট্র, সব জাতি, সব সম্প্রদায় রাধারাণীর করুণার ছাড়া আর কিছুই নয়। ওগো রাধে। রেণু বৈকালে ফুলেখার যায়, ২পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন আনে। কুমার কলিকাতায় যায়, ফেরে সন্ধ্যার পর।—উত্তরপাড়া শিবেন্দ্রিল গত রবিবার দুপুর রৌদ্রে যার আনি রাস্তা পারে হাঁটিয়া হাত দেখাইবার জন্য, পয়সা খরচ করিয়া। সারাটা দিন দুঃখে ও বেদনায় কাটাইয়াছি। যাহার শরীর এই, ছেলে মেয়ে এক কোঁটা দুধ দিতে পারে না, আমার কর্তব্য বুঝিয়া নিবার জন্য যাহাদের উপর আমি নির্ভর করি, তাহাদের এই উদ্ভূঙ্খলতা দেখিলে আমাতে আর আমি থাকি না। কাহাদের জন্য থাকিব? আমার কথা একবার মনে হইল না ওকালতী ছাড়িবার পূর্বে!...সকল সভার প্রধান গত মুখে বলিলেই সকল সভার প্রধান করা হয় না। বিশ্বভারতী আজ একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিন সেন একদিন বলিয়াছিলেন, 'উপন্যাসের কোনদিন বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপন পাইবে না'। অহিংস হইয়া তপস্যানিরত থাকিলে যাহা হইবার নয়, তাহাও হয়। মঠে আর যাই না। কি করিব সেখানে গিয়া? উহারা বেশ থাকুক। —১৯শে এপ্রিল

নিত্যগোপাল, 'দেহম-প্রাণ সকলি দিয়া বুঝিয়া লহ সখা'। 'বিষম্ তব শরীরম্'—বিশ্ব তোমারই শরীর আমার শরীর তোমারই অংশ শরীর। তবে এ অংশ কল্পিত অংশ নয়, ইহা organic। যান্ত্রিক হইলে অংশের ব্যবহারিক কোনও মূল্য থাকিত না। জীব হইল শুধুই পুরুষ। জীব তো জীবন্ত পুরুষ, যাহার সুখ দুঃখ সব জীবন্ত। ইহাকে 'নাই' বলিলেই ইহা মিথ্যা হয় না। কিন্তু এই অংশ-জীব তোমার তবে পুরুষোত্তম-মূল হইয়াই সত্য বাস্তব জীবন্ত কাম অকাম সমন্বিত হইয়াই সত্য। সংসার নিজেকে নিজে ব্যাখ্যা করিতে পারে না যদি না সে সন্ন্যাসের স্তরে উঠিয়া তাহার সঙ্গে যুক্ত হয়। তোমার যোগে যুক্ত হইয়াই সংসারের যোগক্ষেমকে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে। আমি তোমার দেহে মনে প্রাণে। আমার দেহ তোমার দেহ, আমার প্রাণ তোমার প্রাণ। তুমি আমি, আমি তুমি। কুমার সকালে নীরোদ বাবুর দোকানে ঘুরিয়া আসে, পরে মজুমদার লাইব্রেরি, এম বি সরকারে যায়। ৮টার পর কুমার ও রেণু এখানের সভ্যবাহিনীর অর্থ আদায়ের হিসাব ও টাকা মঠে বুঝাইয়া দিয়া আসে। ক্ষিতীশবাবু বলিলেন, 'সঙ্ঘ-মূর্তি নিত্যগোপাল' বই-এর ৪০ পৃষ্ঠা প্রতিবাদে চৈতন্য নকল করিতেছে। ছাপা হইয়া বিলি হইবে। আমি আর কি বলিব? উহারা কি করেন দেখি পরে যাহা হয় করা যাইবে। এত যে লাঞ্ছনার জন্য উহারা প্রস্তুত হইতেছেন, খুব সম্ভবত এইবার ঠাকুর ঘ স্বরূপে প্রচারিত হইবেন। 'দিন আগত ঐ'. 'সঙ্ঘ-মূর্তি নিত্যগোপাল-এর প্রতি-বাদ অর্থ সত্যবাহিনী কমিটীর প্রতিবাদ। ঐ বই তো সত্যবাহিনী কমিটি কর্তৃক প্রচারিত। ইহা তো সত্যবাহিনী কমিটির উপর 'অনাস্থা' প্রস্তাব। কাহার নামে প্রতিবাদ বাহির হইবে? প্রথম আক্রমণ করুক, শেষে কি করিয়া সামাল দিব, পরে দেখা যাইবে। নিত্যগোপালকে বুকে লইয়া ঝড়ের মত ছোটা ছাড়া অন্য পথ আছে কি। Aggressive আমি হইব না। তারিণীবাবুই ইহার জন্য দায়ী। ক্ষিতীশের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহাদেরও

আমারও। আমি যদি নিরভিসন্ধি হইয়া থাকি, আমি দাঁড়াইবেই। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'সঙ্গে সঙ্গে আছি'। সকালে কিতীশবাবুকে লইয়া সেবানন্দ আসে। হিসাব দিয়া আসিতে বলে। রমণী ও তাহার স্ত্রী আসে সকালে। অনিল সমাজপতির দুইটি মুরগির ৩টায় ও আমি ৪টায় আসে। রেণু মেট্রোপলিটান ইত্যাদিতে যায়। ২০শে এপ্রিল

নিত্যগোপাল, তোমার বিশ্বরূপী জগন্নাথ-রূপ বুকে লইয়া কি যে লাঞ্ছনার মধ্যে পড়িয়াছি, তাহা কি তুমি দেখিতেছ না? এই লাঞ্ছনার মধ্যে তুমি আমার নিকটতম। যত জোরে আঘাত আসিবে তত নিবিড় করিয়া তোমাকে বুকে চাপিয়া ধরিব। সারা জীবন কৃষ্ণকে লইয়া রাধারাণীর কি লাঞ্ছনা! আমাকে সেই লাঞ্ছনা ঘরে বাইরে পাইয়া বসিয়াছে যাহার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নাই, তাহার যোগিনী হওয়া ছাড়া পথ কোথায়? ওগো নৈর্ব্যক্তি, সকল পরিচ্ছিন্নতার প্রাচীর নিশ্চিহ্ন করিয়া তুমি সমগ্র পুরুষোত্তম-আলো জ্বালিয়া চলিয়াছ। লাঞ্ছনা তোমার অঙ্গের ভূষণ। আমার জীবনে তোমার জয় হউক। কুমার রেণু বাহির হয়। সাময়িকী 'অমৃতলোকে আইনষ্টিন' লিখি। নীলুর এক কার্ড আসে।...সন্ধ্যার পর কুমার সেবানন্দের রসিদ বইগুলি বুঝাইয়া দিয়া আসে।...শান্তির এক চিঠি কুমারের নিকট আসে। বর্তমানে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা লইয়া আগাইয়া যাইবার উপর সকলের সব সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। এখানের প্রত্যেকেই এক একটা সমস্যা। ইহাদের লইয়া চলিতে হইলে চাই military discipline। পথে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি চলিবে না। নিজেদের খেয়ালখুশীমত চলা চলিবে না। 'এক-মনে দিতে হবে পাড়ি'। পরিচ্ছিন্ন কখনও নিজেকে দিয়া নিজের সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। সমাধানের জন্য পরিচ্ছিন্নের চাই অপরিচ্ছিন্নের স্তরে ওঠা, অপরিচ্ছিন্নের কাছে শরণাগতি। যাত্রীর পক্ষে 'যাদেন' অচল। যত লাগেজ কম, ততই যাত্রা নিরাপদ। জীবনের সঙ্গে চা-পান-বিড়ি-সিগারেট সিনেমা-তাস খাওয়াপরা কিছুই তো যুক্ত নাই। তাই আজও পথ চলিতে পারিতেছি। কোনও কিছুর খেয়াল লইয়াই চলি নাই আমার কোনও অভিসন্ধি নাই। তাই আমার এখানে 'মন' বসা খুব শক্ত আমার সঙ্গে রোজাবিল দিয়া থাকা চলিবে না। আমি চাই মুক্তের সঙ্গ। বদ্ধ জীব লইয়া ঘর করা আমার ধাতে নাই। আমি সে জাতের লোকই নই। না হউক ঘর, এরা চলিবে। ২১শে এপ্রিল

নিত্যগোপাল, পরম পুরুষ যেখানে পরমা প্রকৃতির পশ্চাতে অনন্ত কাল ধরিয়া ঘুরিয়াও ধরিতে পারিতেছেন না, প্রকৃতি অনন্ত জন সৃষ্টি করিয়া অনন্ত সমস্যার সৃষ্টি করিয়া পুরুষকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, সেইখানে তুমি বীর গম্ভীর অথচ প্রাণ-উজল একটী সমাধান দিবার জন্য, synthesis দিবার জন্য আসিয়াছ। তুমি রহ থাকিয়া এস, দ্বৈত হইয়াও অদ্বৈত, পুরুষ হইয়াও প্রকৃতি, প্রকৃতি হইয়াও পুরুষ। তোমার পুরুষোত্তম-জীবনে পাওয়া না-পাওয়া বলিয়া কিছু নাই। মধ্য যুগীয় সর্ববিধ কৌলীন্য আধুনিকতার ভিতর দিয়া আজ বিশ্বমানসকে নবীন প্রেরণা দিতেছে। চতুরঙ্গের 'জগমোহন' ও 'জীবানন্দস্বামী' তোমারে তুমিই। একান্ত ব্যক্তিমোহন আজ অচল। জগমোহনের নাস্তিক-তাকে জীবানন্দের রস-সাধনা বরণ করিতে হইবে। তোমার জয় হউক। গোপিকাবিলাসের ওখানে রেণু সকালে গিয়াছিল তাহার সহি ও গ্রাহকের টাকা আনিবার জন্য। দেখা হয় নাই। রেণু ও কুমার দুপুরের পর বাহির হয়। রেণু সন্ধ্যায় নলিনী ঘোষের ওখানে যায়। সন্ধ্যার পর সেবানন্দ আসে। আগামী রবিবার বীরেনবাবু মহাব্রত পাঠ করিবে। তারিণীবাবু আজ পত্রিকাগুলিতে খবর দিতে গিয়াছেন। বেশ হইয়াছে। আমার আজ আর কোনও প্রয়োজন নাই। মহানির্বাণ মঠের প্রয়োজন আমার ফুরাইয়াছে। আমাকে 'অমৃতেশ' ও 'প্রথমানন্দপুঃ' হওয়ার সাধনা গ্রহণ করিতে হইবে। দুই বৎসর ব্যাপিয়া যে সাধনা করিয়াছি, তাহার ফলে মঠে একটু স্থান হইয়াছে—অন্ততঃ ৪ জন ট্রাস্টী আমাকে সমর্থন করিয়াছেন। বাকি স্থান গভীরতর সাধনা দ্বারা জয় করিতে হইবে। দুর্গম এই পথ। মঠে চিদানন্দ প্রভৃতি নাকি খুব উল্লসিত—'অভিমন্যু'র পতন হইয়াছে। কিন্তু তাহার

পর ? আমার কর্ম-জ্ঞান ভক্তির সাধনাকে আরও ব্যাপক ও গভীর করিতে হইবে। সেখানকের কথা আমি শুনিয়াও শুনি নাই। যতক্ষণ না তারিণীবাবু বা তাহার প্রেরিত কোন লোক এই খবর আমাকে না দিতেছে, ততক্ষণ আমি ইহা শুনি নাই মনে করিব। নীলু আসিয়াছিল।...যাহাদের কাছে আমি 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ঃ বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ সর্বস্মাৎ অন্তরতরাৎ' না হইব তাহাদের আমার কাছে থাকা সঙ্গত নয়—ইহা ইহাদের কাছে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিব। মন্থ সেন ডিপোজিটে যাওয়ার পথে এখানে ৩ টায় আসিয়াছিল। সন্দেশ আনিয়াছিল। একখানি 'ভক্তিরস' রেণু কিনিয়া আনে। নীলুকে বলি, আমি থাকিতে আমার লেখা পড়িয়া রাখ, চলিয়া গেলে আই-এ, বি-এ পাশ করার সময় পাইবে। আমি গেলে আমার লেখা বুঝিবে না। থাকিতে থাকিতে বুঝিয়া লও। ২২শে এপ্রিল

রাধারাণী আমার, তোমার অভিসারের পথকে কবিগণ 'দুর্গম' বলিয়াছেন—সে পথ বজ্র বাদল বজ্রনির্ঘোষের মধ্য দিয়া প্রসারিত, সর্প-শ্বাপদ সঙ্কুল পথ, লাঞ্ছনার পথ। আরামের জীবন তোমার ছিল না। তোমার সাধনা crucification-এর সাধনা। রক্তাক্ত হইয়া তুমি পুরুষোত্তম-সাধনায় জুটিয়াছিলে। আমি সেই দুর্গম পথে তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব। তোমার পথই আমার পথ। আজ পুরুষোত্তম নিত্যগোপালকে যাচাই করিয়া নিবার দিন আসিয়াছে। কাহার নিত্যগোপাল সত্য ? আমার, না তোমার মঠওয়ালাদের ? আমার নিত্যগোপাল কৃষ্ণ—তিনি শুধুই জীবকে তাঁহার পথে অভিসারের জন্য টানেন। উঁহাদের নিত্যগোপাল উঁহাদের বেশ আরামে রাখিয়াছেন। তোমার বিগ্রহ-মূর্তির জয় হউক। রেণু প্রুফ দেখে সকালে। ১২।, টার পর কেশরঞ্জনে যায়। ২ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন আনে। কুমার সকালে নীরোদবাবুর ওখানে যায়। আমার আবেদনে 'অশ্বিনীনগর কলোনী' নাম না দেওয়াই এখন সঙ্গত। ঐ নাম নিয়া কি রাজনীতি সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ওখানে গিয়া না জানা পর্যন্ত উহার মধ্যে যাওয়া, party হওয়া সঙ্গত হইবে না। আমি যে সকলের চেয়ে বেশী বুঝদার। তাহা জানিলে কেহ আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আসিত না। ব্রজমোহন বিদ্যালয় ছাড়িবার সময়, কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার সময় পড়িবার সময়, অর্থাৎ জীবনভর আমি সত্যের দিকে চাহিয়া শক্ত লাইন ধরিয়া চলিয়াছি। আমি হারি নাই। সত্য আমার সঙ্গে—জয়ও আমারই। অতুলের সি এল র‍্যাঙ্কে ফার্স্ট হওয়ার চিঠি আজ আসিয়াছে। আমার একটী দায়িত্ব মুক্তি হইল। আমাদের এখানে পড়িয়া থাকিলে সকলের সব ব্যক্তিগত সমাধান সহজ হইবে। আমার এখানে যে প্রাণের ঠাকুর আছেন। বৈকালে আশা আসে। মাখনবাবু সন্ধ্যার পর আসেন। কাল খুব সকালে রেণু ও কুমার যাওয়াআটি যাইবে জায়গার মাপ ও ২২শে সেখানে যাইবার ব্যাপার সব ঠিক করিবার জন্য। ২৩শে এপ্রিল।

নিত্যগোপাল, প্রাণ আমার, মহাপ্রাণ বিশ্বপ্রাণ প্রাণবল্লভ আমার, প্রাণের আশা কে বুঝিবে এই বুদ্ধিমানদের সংসারে, কূটনীতির সংসারে তুমি ছাড়া ? প্রাণের পথই তোমার আমার পথ যে পথে সুখদুঃখ আলো আঁধার সম। তুমি প্রাণধর্মন লইয়া আসিয়াছ আমার জীবনে। সঙ্ঘর্ষক্লান্ত ক্ষতবক্ষ বিশ্বের বুকে দাঁড়াইতে—তুমি মুহ্যমুহ্যঃ প্রাণ ছড়াইতেছ—শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে, মরা সবুজ হইবে। আমি প্রাণ-উপাসক, নবীনের উপাসক। তোমার প্রাণ-প্রচার-রূপ কার্য আমি জীবন দিয়া সাধিব। রেণু ও কুমার···যাওয়াআটি যায়। জমির মাপ করায় ধরিত্রীরঞ্জনবাবুকে দিয়া। ব্লুপ্রিন্ট ও বসির জন্য আগাম ৪ টাকা দিয়া আসে। অশ্বিনীনগর নাম লইয়া ওখানে অনেক গোলমাল সৃষ্টি হইয়া আছে। জলধর (চট্টোপাধ্যায়) বাবুর বাসায় দুপুরে খায়। ফেরে ৪টার পর।...নীলরতনবাবু মঠে যাইতে বলিলেন। বলিলাম, বাহিরে কিছু কাজ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।... এখানে আলোচনা হয়, সকলে মিলিয়া বোঝা বহিলে একলার বোঝা হাল্কা হয়। নিজের বোঝা নিজের করিয়া বহিতে নাই ···সন্ধ্যার পর জ্ঞানকুমার চ্যাটার্জী ও যোগানন্দ দত্ত আসে। 'এক' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য, এক ঈশ্বর

সংবাদ, অন্নের পূর্ণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়।... ২৪শে এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার সর্বসংস্কার-রহিত অবধূত অবস্থার রূপ ফেলিয়া দিয়া যদি কুসংস্কারের মাঝে তোমাকে লইয়া থাকিতাম, তবে মহানির্বাণ মঠে আমার ঘর হইত। ওখানের প্রয়োজন আমার ফুরাইয়াছে তোমাকে উহারা কাড়িয়া লইতে চায়। আমি কি তাহা হইলে বাঁচি? তুমি যে আমার সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, বিশ্বরূপ। তোমার ঐ রূপ ছাড়া আমার মন ভরিবে কেন। 'পথে ঘাটে বলে সবে পাগলিনী যায়। কেহ হাসে কেহ মোরে ধূলা দেয় গায়।' আমি ধূলা ঝাড়িয়া পথ চলিব—তোমাকে তো ছাড়িতে পারিব না। তুমি শুচি হইতে বড়, অশুচি হইতে বড়। ধর্ম বা সম্প্রদায় হইতে বড়—'অন্তর ধর্মাৎ অন্তর অধর্মাৎ'। তোমাকে লইয়া থাকাতেও আমার সুখ।...রেণু ১টায় প্রিন্সিয়রে ফোন করিয়া প্রেস হইতে সেখানে যায়, ব্লক আনে—ফেরে সন্ধ্যা ৭টার পর। মেট্রোপলিটানেরও ১ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়াছে। কুসুমের এক চিঠি আসিয়াছে। নীলু পত্রদ্বারা জানাইয়াছে...' তাহার এখানে চলিয়া আসা প্রয়োজন। আমার এত কাছে থাকিয়া উপবাস করিয়া থাকিবে তাহা তো হয় না। অথচ কাজ না করিলে অর্থই বা আসিবে কোথা হইতে? নিবার জন্য দেশ উন্মুখ ছিল। বলিতে পারিলাম কই?...আমার মায়ের ব্লক বানাইবার জন্য ষ্টাণ্ডার্ড-কে তাগাদা দিয়া আসে। পোস্টাফিসের নিকট হইতে সকালে রেণু উজ্জয়ন্তীর ৩ টাকা নিয়া আসে...মেয়েরা যোগ্য না হইয়া রাস্তায় নামিলে কি বিপদ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—দিয়াছে। মেয়েরা কি তাহাদের স্বজাতি সম্বন্ধে কোনও বেদনা বোধ করে? পথে দাঁড়াইয়া কি অসহায়, কি বিপন্ন তাহারা। কে তাহাদের রক্ষা করিবে তুমি ছাড়া মদনমোহন নিত্যগোপাল?...২৫শে এপ্রিল

প্রাণ, মহাপ্রাণ, বিশ্বপ্রাণ নিত্যগোপাল আমার, তুমি অযাচী ধনাঢ্যের অযাচিত, অন্বেষিত, চিরপরিচিত। কথা কও, বিশ্ব তোমার প্রাণের ভাষা বুঝিয়া লউক। তোমার বিশ্বপ্লাবী প্রাণের ভাষায় তুমি কথা কও। আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠ তো তোমার কথা কহিয়া উঠিতে পারিল না। কথা কহিবে না? মূক তুমি? প্রাণের ভাষা বুদ্ধির দেশে বুদ্ধিমানেরা বোঝে না। প্রাণপ্রজ্ঞা সমন্বিত ভাষায় কথা কহিলে তাহাও কি বুঝিবে না? তবে কি করিয়া মাটির বুকে আকাশের প্রতিষ্ঠা হইবে? সকল দ্বন্দ্ব দিয়া মৈথুনে পরিণত হইবে? আমাকে বাঁচাও, আমার তুমিছাড়া দ্বিতীয় কেহ নাই। তুমি এক অদ্বিতীয়। তোমার মত দ্বিতীয় আর কেহ নাই। কিংবা সব দ্বিতীয় তুমিই। অন্য দ্বিতীয় নাই যাহার মত তিনি 'অদ্বিতীয়', যাহা হইতে অন্য দ্বিতীয় আর নাই, তিনিই 'অদ্বিতীয়'। তুমি বিশ্বকে প্রথম রাখিয়া চিরকাল দ্বিতীয় রহিলে, সহযোগী রহিলে, রথের সারথি রহিয়া গেলে। তোমার জয় হউক। সকালে রেণু, সুবোধ দেব ওখানে হইয়া প্রেস ঘুরিয়া ফেরে ১২টায়...নীলরতনবাবু সেদিন বলিয়া গিয়াছেন, 'আরও বড় কাজ আছে।...' এই বড় কাজ হইতেছে বাগবাজারে নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপনা। আমাকে প্রাণপণ করিতেই হইবে। শ্রীনিত্যগোপাল ছাড়া আমি বাঁচিব কি লইয়া? বিশ্বমৈত্রীর মূলসূত্র 'সমন্বয়—নিত্যানিত্য সমন্বয়.....' আর অধিও পূর্ণ...' ইত্যাদি। ইহা ঘরে ঘরে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমার প্রাণ শান্ত হইবে না। লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট বিজ্ঞপ্তি মারফত ইহা ছড়াইয়া দিতে হইবে। মানুষ আগে ইহা মুখস্ত করুক, পরে অর্থ বুঝিবে। আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'। অনিল সমাজ বার ও তার সিনডিকেট তপিনী সন্ধ্যার পূর্বে আসিয়াছিল।

২৬শে এপ্রিল

নিত্যগোপাল, 'অন্নও পূর্ণ'—ইহা আবিষ্কার ও আস্বাদন করিয়াই তুমিই আমার প্রাণ-প্রিয়তম। কি কথা যে বিশ্বকে শুনাইয়া গেলে, তাহা আর কি বলিব? সকল অসুন্দরকে সুন্দর করে প্রাণ, সকল অশুচিকে শুচি করে প্রাণ, তুমি সেই প্রাণের দর্শন দিয়া আসিলে। আমি প্রাণের ছন্দ লিখিব, প্রাণের ভাষায় কথা কহিব, প্রাণ-

স্রোতে ভাসিয়া চলিব। প্রাণ সব ছোটকে বড় করে। ছোটর স্বরূপ প্রকাশ করিলেই মানুষের হয় ব্রহ্মক্ষয়। পুরুষোত্তম ছাড়া কেহ অন্যকে 'পূর্ণ' বলিয়া আখ্যান করিতে পারে না। বৃন্দাবনে সব কিছু ছোট—ছোট মানুষ, ছোট বুদ্ধি, ছোট পশুদের—লইয়া তোমার মদনমোহন লীলা। বেহু ও পুরাণ দুয়ার উপর জোর দিয়াছে, তন্ত্র জোর দিয়াছে অন্নের উপর, ছোটর উপর। তুমি ছোট বড়, তন্ত্র বেদের সমন্বয় বিধান করিয়া বন্ধ দুয়ার সকালে হিটিং পাবলিসিটিতে পরিবর্তনার প্রেরণা দিয়া আসে। বেণু ৩টার পর ষ্টাণ্ডার্ডে... যায়। রাত্রিতে খাওয়ার পর বেশর গাঙ্গুলী দীর্ঘকাল পর আসে। সে গ্রাহক খাকিবে। পত্রিকা দিয়া দিবাম। কাল টাকা দিবে। পরিবর্তনা পড়িয়া শোনান হইল। বিশ্বনাথ নাকি বেহালার সভাব্রতের ওখানে সারা দিন দুয়ার বন্ধ করিয়া থাকে। ৭২ বৎসর বয়সে আমি মানুষ ভাবতেছি, আর ইহারা দুয়ার বন্ধ করিয়া থাকে! আমি কাঁপ দিব, দেখি তোমরা কেমন করিয়া নিশ্চিন্তে ঘরে থাক। আমি একা রাস্তায় মরিলে লোকে তোমাদের যা ইচ্ছা তা বলিবে। বীরেন ব্যানার্জী আসে সন্ধ্যার পর। মহানির্বাণ মঠ ঘুরাইতে চায়। আমি ঘুম ভাঙাইতে গিয়া তাহাদের অপ্রিয় ভাজন হইয়াছি। প্রয়োজন কি আমার? জগৎ আছে, জগন্নাথ আছেন, আর আমি আছি। উহারা ঠাকুর-বাড়ী করিতে চান করুন। পিছনের ঠাকুরকে আমি সামনে প্রতিষ্ঠিত করিব ইহাই আমার পণ ...ঠাকুর, আমাকে বল দেও, দুর্জয় সাহস, ধৈর্য শক্তি দেও।...২৭শে এপ্রিল

নিত্যগোপাল,...সকলের 'অহম্ প্রাথমিকঃ' হইবার সাধ পূর্ণ করিয়া তুমি রহিলে সবার পশ্চাতে। তোমাকে তাই কেহ দেখিল না, দেখিবার প্রয়োজনও মনে করিল না। সবাই বলে, তুমিই শুধু পিছনে। সবাইকে আগাইয়া দিয়া তুমি রহিলে মাঝির মত হাল ধরিয়া পিছনে। সকলের সামনে থাক নাই তুমি...তুমি তো লোক ভালবাস, অথচ পিছনে কেন? প্রাণ যে কারণে সকলের পিছনে, তুমিও তেমনি পিছনে। আমাকে কিন্তু তুমি তোমার স্বরূপ চিনাইয়া দিয়াছ। আমিও তো সারা জীবন পিছনে থাকিতেই ভালবাসি। বহু লোকের সামনে দিয়া যাইতে হইলে মেয়েদের মত পায়ে কাপড় জড়াইয়া পড়িতে চায়। আমার এই প্রকৃতির কথা তোমাকে বলিলে তুমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলে।... তোমাকে পিছন হইতে সামনে আগাইয়া আনিবার গুরুভার আমার উপর দিয়াছ। বোঝা বয় আমাকে। বেণু ৩টার পর ষ্টাণ্ডার্ড বটো, প্রিন্টিং পাবলিসিটি, চাকেশ্বরী, আশুবাবুর ওখানে হইয়া ফেরে প্রায় ৮টায়। দুয়ার মঠে তাহার পিতার বাৎসরিকের জন্য ঠাকুরের সেবায় ২ টাকা দিয়া আসে ...ঠাকুর আসিয়াছেন axiumগুলিরও চুলচেরা বিচার করিতে, তাই এক অভিনব প্রকৃতি শব্দের অর্থ বদলাইয়াছেন। Axiumগুলিরও পিছনে গিয়া প্রশ্নেরই ভুল দেখাইয়া বিচার করা তাঁহার রীতি। 'ভগবানকে কি করিয়া পাই?' তাঁহাকে কি করিয়া মনে রাখিব?' এই সব প্রশ্নই ভুল। ভুল প্রশ্নের জবাব কি করিয়া দিব? মানুষ ভগবানকে পায়, না ভগবান মানুষকে পান? মনের মত ছোট আধারে ভগবানকে কি করিয়া ধারণ করিবে? সব দিয়া যদি বা ধারণ করা যায়। আজ প্রশ্নগুলির মূল, স্বতঃসিদ্ধগুলির পুনর্বিচার করিবার দিন আসিয়াছে। ইউক্লিড-এর axium আজ আর axium নয়। ২৮শে এপ্রিল

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

দিনগুলো কেটে যায়

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

দিনগুলি কেটে যায় এক একটি করে,
ধীরে ধীরে জীবনের সব শক্তি ম্লান হয়ে আসে,
সম্মুখে চলার পথে গতি কী মন্থর!
শিউলির গায়ে দৃষ্টি পড়ে ক্ষণে ক্ষণে—
সে জীবন ফিরে পেতে চায়,
যেতে তো পারে না
সে অতীত, স্মৃতির পাতায় তার ঠাঁই,
তাকে ফিরে যাওয়া তো পাওয়া।
শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়া ওলটানো:
সেই সেদিনের কথা—সুখের দুঃখের,
আনন্দ-বেদনার;
কখনো মনকে করে উৎসাহিত, আনন্দ-মুখর,
কখনো বেদনা-ম্লান:
এমনি করেই কাটে কিছুটা সময়।
সামনে অজানা ভবিষ্যৎ
ডাক দেয়, সেই ডাকে সাড়া
দিতে চায় এই মন, সাথী দেয় অপটু এ দেহ,
আর নানা আশঙ্কা পথের—
সেই পথে যেতে নাকে' সঙ্গী সাথী মনের মতন
চলতে হয় একা একা সঙ্গী করে শুধু নিজেকেই।
দুঃখ আসে নানা দিক থেকে,
কত না বেদনা সেই পথে,
আনন্দের কণা কিছু হয়তো বা মিলে যায়
কখনো কখনো,
বিদ্যুতের ঝলকানি যেন,
রেখা দিয়ে সরে যায়: গতিবেগ আরও মন্থর
হয়ে আসে। বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে
দিনগুলো কেটে যায় এমনি করেই—
এক পা এক পা ক'রে শেষ করে যাওয়া এই
(হয়তো বা) দুর্গত জীবন।
বিষণ্ণতা নেমে আসে ধীরে ধীরে ধীরে।

যেন বা এলাম এই পৃথিবীতে,
কী পেলাম? দিয়েই বা গেলাম কিছু কি?
হিসেবের খাতাখানা দেখি চেয়ে চেয়ে,
অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে চোখ।

সূচীপত্র : উজ্জ্বলভারত : চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮০-৮১

১। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল — শ্রী রেণুমিত্র — ২৪
২। তৃষা কি — শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ — ৩১
৩। প্রার্থনাকালন আংশ (১০) — শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ — ৩২
৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-তত্ত্ব-কথা — ৩৯
৫। শ্রীমা — শ্রী সুন্দরজন ন্যায়তীর্থ — ৪১
৬। আগনহারা (কবিতা) — শ্রী গণেশ চক্রবর্তী — ৪২
৭। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-দিনপঞ্জী — ৪৩
৮। দিনগুলো কেটে যায় (কবিতা) — শ্রীশান্তশীল দাশ — ৫০

গরমে চলুন হালকা পায়ে

গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে আপনার পথের সাথী বাটার এই স্যান্ডাল আর চপ্পল। হাল্কা পায়ে চলাফেরা আর সেই সাথে পায়ের পরিচর্যার জন্য আদর্শ এইসব মজবুত, খোলামেলা জুতো।

মিতালি
সাইজ ২-৭

প্লেটাইম
সাইজ ৭-১০
১১-১, ২-৫

ফোল্ডিস ১২
সাইজ ৫-১০

সুবীর
সাইজ ৪-১০

Bata
Bata
Bata
Bata

যখন উৎকৃষ্ট বিলেত!

সুলেখা

IMPALA SW 53/73

এক্সিকিউটিভ ইঙ্ক
পছন্দমত রঙে পাবেন—
পার্মানেন্ট :
ব্লু ব্ল্যাক ● নেভি ব্লু
সুপার ব্ল্যাক ● ডার্ক ব্রাউন
ওয়াশেবল :
রয়াল ব্লু ● এমারাল্ড গ্রীন
ভায়োলেট রেড ● ক্রিস্টাল ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা ● খড়িয়াবাদ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৪·০০

শ্রীশীলিমা ঘোষ, এম. এ. বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাঙ্গালে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৪·০০
বাংলার বিপ্লবী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৭৫
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১০·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

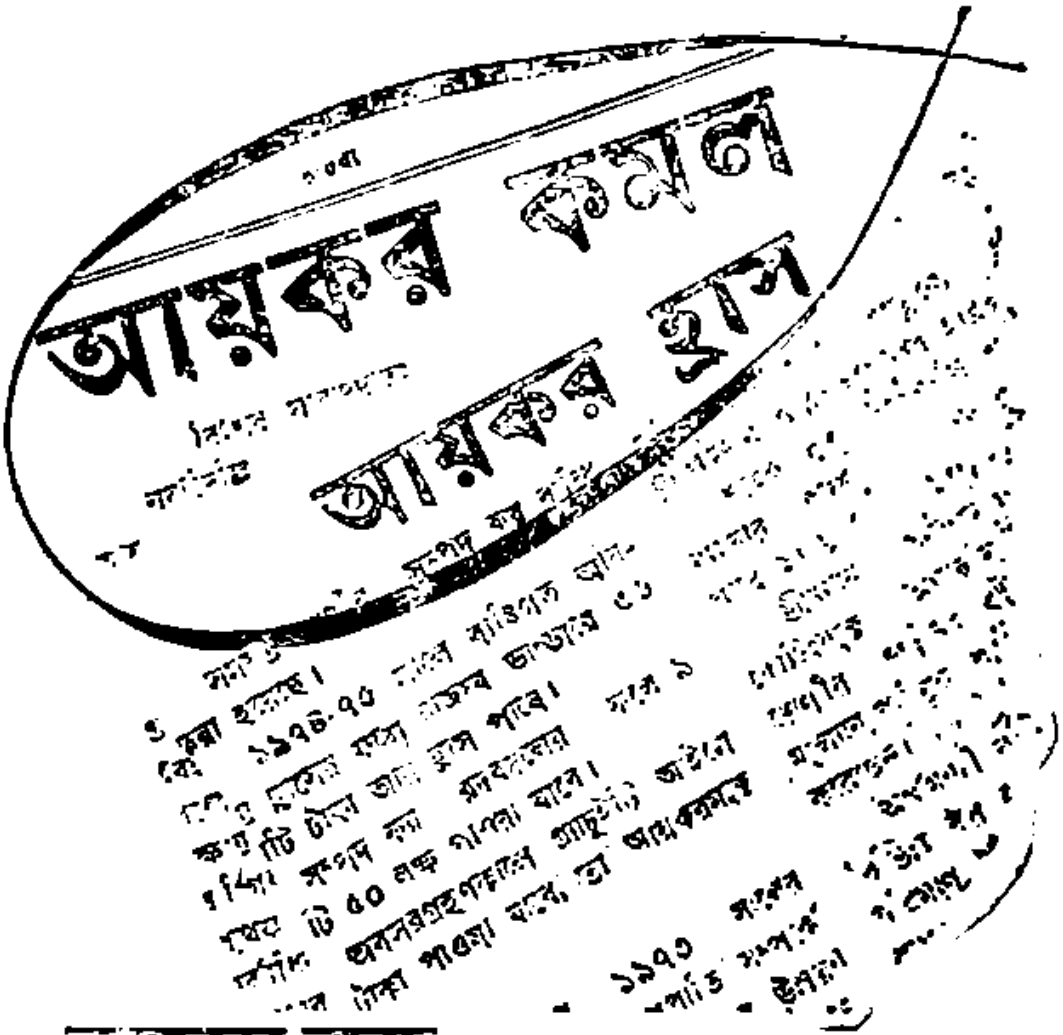

আয়কর বাবদ

যেটুকু রেহাই পাওয়া গেল

অন্তত সেই টাকাটাই জমান না!

টাকা ইউবিআই তে জমানো লাভজনক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

"চোখে আঙুল দিয়া একদেশদর্শী অতীত সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি বুঝাইবার জন্যই না প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মে কলির নারীরা ভাগবতের ভাষায় 'স্বৈরিণী' ? এই স্বৈরিণী মেয়েদের সামনে দাঁড়াইয়াই সতী-শিরোমণি, জাতি-আচার, কুলাচার, ব্যক্তিগত আচারবর্জিতা রাধারাণী হাতছানি দিয়া ডাকিতেছেন। সীতা সাবিত্রীর যুগ পিছনে ফেলিয়া কলির মেয়েরা অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছে, অথচ সর্বক্ষেত্রের আচার-হীনতাকে সদাচারে গড়িয়া তুলিবার উপযোগী কোনও মহীয়সী নারীর দৃষ্টান্তই তাহাদের সামনে নাই। বর্তমানে মেয়েদের সীতা-সাবিত্রী করিতে চাহিলে তাহা ব্যর্থ হইবে।

'স্বৈরিণী' মেয়েদের স্বৈরাচারকে দিব্যাচারে গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই দার্শনিক-ভাবে শ্রীরাধাজীবনের প্রতিষ্ঠা. যাহাকে জীবনের মাঝে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নর-নারী জীবনের বিকার দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।...অস্বীকার করিয়া অগ্রসর করাইবার শাস্ত্রই ভাগবত। অন্যান্য কোন সাধনাই মানুষের বাস্তব অবস্থাকে স্পর্শ করে না। বাস্তবের ভিতর দিয়া জীবনকে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে অগ্রগতি অসম্ভব। কলিকালের ঠাকুর 'বাস্তব বস্তু' শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্বাগ্রে দর্শনে এবং তৎপরে সমাজ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইবেন, তখনই শুধু রাজারা প্রজানুরঞ্জিত হইবেন, নারী-স্বাতন্ত্র্যের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইবে পুরুষ স্বাতন্ত্র্য, তপস্যা না করিয়া ফাঁকি দিয়া কেহই আর তপস্বী সাজিবে না, শূদ্র-বৈশ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ পরস্পরালিঙ্গিত হইয়া দিব্য সমাজ গড়িয়া তুলিবে, মায়া ও অনৃত দূর হইবে, তন্দ্রা-নিদ্রা ঘুচিবে, মানুষ অতন্দ্রিত, সদা অপ্রমত্ত থাকিবে, হিংসার বিলুপ্তি ঘটিবে; বিশ্ব-সঙ্ঘের সূত্রপাত হইবে, বিষাদ যোগে গড়িয়া উঠিবে, শোক-মোহ পুরুষোত্তম-জীবন গঠনে সার্থক হইবে, অহৈন্য মুছিয়া যাইবে, সৃষ্টি-লালসায় মানুষ উন্মাদের ন্যায় ছুটিবে, কলির বুকে, কলহের বুকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত
'কলিকাল ও শ্রীকৃষ্ণ' হইতে

27 MAY 1974

ব্যক্তিকে ব্যক্তির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, ব্যক্তিহীন ব্যক্তির উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে আশীর্বাদ আছে নীচের বইগুলিতে। 'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-commununity. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove he greatest burden of man, namely the expolitation of man by man.'

'Occasional Speeches'– Radhakrishnan

—মানুষ কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-মানুষ হচ্ছার হাতে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। ব্রহ্মসূত্র (অখণ্ড ভাষ্য)	
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২·০০
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮·০০
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৭·০০
২। ঈশোপনিষৎ	২·০০
৩। কেনোপনিষৎ	১·০০
৪। কঠোপনিষৎ	৩·০০
৫। প্রশ্নোপনিষৎ	১·০০
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ	০·৭৫
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	২·৭৫
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৩·০০
মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৩·০০
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ	০·৫০
১১। গীতাভারতী	০·০৬
১২। উজ্জীবনভারত (পুস্তিকা)	০·৫০
১৩। মহাত্মাজীর শুদ্ধ বুর্জোয়া দর্শনের	
পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা	৩·০০
(গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২·০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি

প্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির ভ্রান্তকথা	১·২৫
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিত্যগোপাল	
ও শিক্ষা সুধার কথা	০·৩১
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৪·০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল	০·৬২
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৩·০০
ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত	
৪। রবীন্দ্র-হৃদয়	৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (তারা—কেশবচন্দ্রনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা

উজ্জীবনভারত প্রতি সংখ্যা ১·০০, বার্ষিক ৬·০০

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক" "এই বিশ্বই আমার মহামঠ"

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮১, ১৯৭৪ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ২৭-তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

আবেদন

= শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, নরনারায়ণ আশ্রম ও উজ্জ্বলভারত সম্বন্ধে
দরদী ব্যক্তিদের প্রতি =

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৮ বৎসর আগে এই বাগুইআটি গ্রামে নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের সেবাপূজা ও তাঁর সর্বসমন্বয়ের তত্ত্ব-প্রচার এই স্থানে আরম্ভ করার দুই বৎসর অন্তেই নিত্যধামে প্রয়াণ করেছিলেন। তাঁর আরব্ধ কাজগুলি চলছে, তবে তাঁর তত্ত্বপ্রচারের মুখপত্র 'উজ্জ্বলভারত' ও তাঁর লিখিত গ্রন্থানত্রয়ের ভাষ্যগুলির প্রচার-কার্য অর্থ ও লোকাভাবে মন্থরগতি। তাঁর পরিকল্পনামত একটি গ্রন্থাগার, একটি মেয়েদের সেলাই-শিক্ষাকেন্দ্র ও দুইটি শিশুদের স্কুলও দীর্ঘ ১৬ ও ১০ বৎসর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। সামগ্রিক জীবন-ধর্মের প্রস্থাপক তাঁর লিখিত ভাষ্যগুলি সব প্রকাশিতও এখন পর্যন্ত হয় নি। বর্তমানে ছান্দোগ্যোপনিষৎখানি ছাপাতে প্রয়াসী হয়ে আপনাদের আবেদন জানাই যে, যিনি যেমন পারেন সাহায্য পাঠিয়ে নূতন জীবনচেতনাদ্বারা সমাজ গঠন-প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

আশ্রমের জন্য আরও একটী আবেদন আছে—আশ্রমের গৃহাদির কিছু সংস্কার সাধন করার ও রান্নাঘরের মেঝেটা পাকা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এজন্যও আপনাদের কাছে অর্থ বা প্রয়োজনীয় বস্তু সাহায্য প্রার্থনা করছি।

বিনীত

নরনারায়ণ আশ্রমের সেবক-সেবিকাবৃন্দ।

সূচীপত্র : উজ্জ্বলভারত : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮১

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৯১) শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত	৫৭	৮। নারী-স্বাতন্ত্র্যের সত্যিকার তাৎপর্য শ্রী রেণু মিত্র	৬৮
২। গান্ধীজীর ধ্যানের স্বরাজ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী	৬৪	৯। নবারুণ (কবিতা) শ্রীগণেশ চক্রবর্তী	৭৩
৩। বাগুইআটির নারায়ণতলা শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্তী	৬৬	৬। পুরুষোত্তমানন্দ-তত্ত্ব-কণা ৭। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-দিনপঞ্জী	৭৪ ৭৬

উজ্জীবনভারত

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮০-৮১ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৪ ২৭-তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৯১)

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

২৩।১।৮৮ ও'···। কাল সরস্বতী পূজা, আজ তার প্রস্তুতি কিংবা অধিবাস। আশ্রম কিভাবে এ পূজা করবে, আশ্রমীদের তা অবগত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীনিত্যগোপালকে আমি বিদ্যাপতি ও লক্ষ্মীপতি দুই রূপেই উপলব্ধি করেছি—যত অল্পই হোক।...তাঁর মধ্যে লক্ষ্মীবীজ ও বিদ্যাবীজও আছে, কামবীজও আছে ...তাঁর আরাধনায় দুটোই লাভ হবে···। এতদিন লক্ষ্মী ও বিদ্যায় বিরোধ ছিল—নিত্যগোপালে দুটো মিলবে।···কিন্তু নিত্যগোপালের লক্ষ্মী decentralised —বিকল্প—বিকেন্দ্রীভূত ...সেইখানেই একমাত্র বিদ্যা ও লক্ষ্মীর সামঞ্জস্য...। বিদ্যা আজ্ঞানি জিহ্বা বাংঃ···বিদ্যা লাভ হলে সকলের সঙ্গে একটা একাত্মতা লাভ হয়—ভেদের বাধা কেটে যায়...। নিত্যগোপালকে লক্ষ্মী শ্রী সব বিশেষণেই বিশেষিত করা যায়···। একটা শান্ত আবহাওয়ায় একটা সমাহিতির মধ্যে তাঁর পূজা করতে হবে।...তিনি বেদাদবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্যঃ···। ...নিত্যগোপাল-চরণপ্রান্তে বেদবেদান্তের নূতন ভাষ্য পেয়েছি।...আমার জীবনে মা এসেছেন বলেই বেদান্তের নূতন মূর্তি পেয়েছি...। শঙ্কর রামানুজ বেদান্ত লিখেছেন—তাঁরা মহা পণ্ডিত—আমি দীন —আমি বেদান্তের ভাষ্য লিখেছি শুধু তাঁর আশীর্বাদের বলে ···। তাঁর আশীর্বাদে বিদ্যাদেবীকেও পেয়েছি, লক্ষ্মীকেও পেয়েছি—কিন্তু আমার লক্ষ্মী decentralised—তাই সে লক্ষ্মীর চমক নেই···। কাল হোলি আরম্ভ হল···কাল বসন্তের হাওয়া দেবে...। বসন্ত অর্থই ভোগ—এই ভোগের মধ্যে যখন মানুষ জড়িয়ে পড়বে তখন রক্ষা করবে কে? এই বিদ্যা—তাই এই বিদ্যার পূজা—সরস্বতীপূজা—। ···এই পূজার কথা এই যে, ব্যক্তিগত ভোগ চলবে না, ভোগকে বিশ্বজনীন করে তুলতে হবে ...যৌবনে নাচানাচি থাকবেই—কিন্তু যেমন করে নাচানাচি করলে তার ছন্দ পতন হয় না, সেই নাচ, সেই যৌবন, সেই রূপ ব্রহ্মবিদ্যা বেদবিদ্যা সরস্বতী ।···জীবনে ছন্দ শিখবার দিন কাল। তিনিই ছন্দময়ী...। মা, তেমন কথা শিখাও যা বিশ্বসেবায় লাগে, তেমন করে খেতে শেখাও যা বিশ্বভোগ।...যিনি সকলের ভিতর প্রবেশ করে আছেন, তিনিই বিশ্বজনীন···। নিত্যগোপালের দুই শক্তি—লক্ষ্মী ও বিদ্যা।···জীবনে নেমে আসুক শুভ্রত্ব—সরল হও, অকপট হও···। বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবন্দনা বেশ···। মানুষ আমোদ চায়, হৈ হৈ চায়···তুমি যে শান্ত সমাহিতের দেবী—মাগো, তোর আশীর্বাদ ছিল বলে এই ভাষ্য আমি পেয়েছি...এই ক্ষুদ্র পল্লীর ভিতরে তোমায় বুকে করে বসে আছি···। তোমার শুদ্ধ-জীবন নিয়ে চোখের জলে বাংলাকে প্লাবিত করতে চেয়েছি।···লক্ষ্মী সরস্বতী দুই-ই আমি মানুষের মধ্যে চেয়েছিলাম শুধু কল্পনায় নয়...ঘরে ঘরে সকল নরনারীর ভিতর, মাগো, তোকে দেখতেই ছুটেছি।···নরনারায়ণ বয়স্কা মহিলা শিক্ষা-কেন্দ্রে তোর প্রকাশ হোক...সকলকে লেখাপড়া শেখানো অর্থই তোর প্রকাশকে রূপ দেওয়া।···লক্ষ্মীপতি, বিদ্যাপতি দুই ই আমার নিত্যগোপাল···লক্ষ্মী ও বিদ্যার সমন্বয়ে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও...অযাচিত কৃপায় তোমার আশীর্বাদ পেয়েছি।···শংকরাচার্যের মা-ও তুমি, আমার মত মূর্খের মা-ও তুমি—এই মূর্খের কাছে যদি এসেছ, সার্থক হও। ···বিদ্যা ছাড়া কি করে লোকে জানবে?...উমারূপে

একদিন রক্ষকে চিনিয়ে দিয়েছিলে··· ।

২৮১৫৮। শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন লীলার ভিতরে একটী গভীর তত্ত্ব আছে। জীবনের বিকাশ পূর্ণীভূত করাই উদ্দেশ্য। প্রত্যেকের জীবনে এই লীলার আচরণ করা উচিত। কালীয় হ্রদে কালীয় বাস করত···কালীয় প্রত্যেকের জীবনের ভিতরেও রয়েছে, যেমন রয়েছে বাইরের আবেষ্টনে। ···কালীয় পাঁচ রকমে কৃষ্ণ অধিষ্ঠেই···কৃষ্ণ নিজের ভেতর থেকে বড় হতে লাগলেন—প্রথমানবপুঃ—নিজের মধ্যে নিজে বড় হচ্ছেন চক্রভূমি খেলায় কালীয় ক্লান্ত হয়ে পড়ল... সাপের মাথায় উঠে কৃষ্ণ নাচলেন।...বহিরাক্রমণ থেকে, পাঁচোয়া লোকের আক্রমণ থেকে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয় তাই দেখালেন কৃষ্ণ।...ঘুষি চড় চাপড় দিতে পারতেন—কিন্তু তাতে ফল হতো না··· নিজের বুকের আলো জেলে নিজের ভেতর থেকে বড় হতে হবে—এই হল ওঁর কথা।··· জীবনে ইজিন নয়—ইজিন করলাগুলোকে হজম করে না, জীবন বাইরেটাকে হজম করে···। মড়া বয়সের সঙ্গে জীবন্ত বয়সের তফাৎ বোঝ—করলা না দিলে ইজিন চলে না, কিন্তু মরে না···খাদ্য না পেলে দেহ মরে।···বাইরের ঘটনা পরিপাক করার শক্তি বাড়াও···। রবিদাদার মনোরঞ্জন ঠাকুরমশাই 'শয়তানের গুড়ের কোঁটা' বলে এক অতি চমৎকার গল্প বলতেন। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ—শয়তান বলল, তোমরা আমাকে দোষ দাও—কিন্তু দেখ আমি আর কিছু করি নি—কেবল এই একটি গুড়ের কোঁটা দিলাম—এখন পর পর যা কিছু ঘটল তার জন্য তো আমি দায়ী নই। আমি শুধু একটা গুড়ের কোঁটা দিলাম—গুড় খেতে অনেক পিঁপড়া এল, পিঁপড়া দেখে পাশের বাড়ীর পায়রা পিঁপড়া খেতে এল, পায়রাকে দেখেই আবার এ বাড়ীর বিড়াল তার ঘাড় মটকে দিল—এখন পায়রার বাড়ীর লোকের সঙ্গে বিড়ালের বাড়ীর লোকের বিষম বিবাদ লেগে গেল...। শয়তান বলল, আমি তো আর কিছুই করি নি, আমি শুধু একটি গুড়ের কোঁটা দিয়েছি।...বাইরের জগৎ এইরূপ—কর্মের শিকল একটার পর একটা···এইজন্যই ভারতীয় সভ্যতা কর্ম ত্যাগ করেছে।···আসল কথা শয়তানকে পরিপাক করতে হবে।···পরিপাক-শক্তি না বাড়িয়ে ঘটনা বাড়ালে কি হবে? বিপদ হবেই। আমাদের চারদিকে ঘটনা এত বেশী ঘটছে, কিন্তু আমাদের জ্ঞান ও ভিতরের শক্তি দিয়ে তাকে পরিপাক করিবার শক্তি অর্জিত হয় নি। ...পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কটাকেও এইভাবে দেখতে হবে—ভারতবর্ষকে নিজেকে বড় হতে হবে। ···ভারতবর্ষ বড় হতে চলেছে।...বাইরেকে ঢোকালেই কিন্তু বাইর হজম হয় না...ধীরে ধীরে হজম করতে করতে চলো। তাই বই বেছে বেছে পড়ো, খাবার বেছে খেয়ো।...একমাত্র কৃষ্ণ চরম শয়তানকেও পরিপাক করেছেন···। আজ যুবকদের চতুর্দিকে ঘটনা হৈ হৈ করে নাচছে··· যাহা পাই তাহা ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে, দেখে দেখি হায় সব ভেঙে যায় ধূলি হয়ে যায় ধুতে।...আমি এখানে এসেই গ্রামের কাজে হাত দেই নি;···নিজে শক্তি অর্জন করেছি তো তাই। দেড় বছর পরে রাস্তার কাজে হাত দিয়েছি ··· সংসারের মানুষ তো এই রকম যে এক লেবু গাছ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দেওয়াল উঠে গেল। ··দলাদলির ভিতরে পড়ে যেতে না হয় সেই মানসিকতা আনতে হবে···গ্রাম দলাদলির ঊর্দ্ধে...কোন দলাদলির মধ্যে পড়তে চাই না বলেই নরনারায়ণ আশ্রমের এই রকম ঠিকানা রেখেছি...। শ্রীকৃষ্ণের মত প্রথমানবপু হওয়ার মধ্য দিয়ে, বড় হওয়ার চাপে বল যাবে···। পরিপাকশক্তি বাড়াও...দীপ্তাগ্নির ঘন বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ··। তিনি দুরূহতম জিনিষ হজম করেছেন—grow from within—ভেতর থেকে বড় হও। Life is from within out—Tryne। জীবন ভেতর থেকে বাইরে আসে ...শিশুর প্রথমে শুধু মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক—ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর সংসারের সঙ্গে সে পরিচিত হয়।···বহু ঘটনার মধ্যে আস্তে আস্তে যেয়ো, ঘটনার দ্বারা চাপা পড়ো না।...যোগ্যতা অর্জন কর ...। নিতাগোপালের আশীর্বাদ তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি...। যোগঃ কর্মসু কৌশলম্—to be fit is to be a yogi—কৃষ্ণকে নিয়েই যোগ্য হতে হবে।···

৩১, ১, ৫৮...। পথে বের হয়ে এই দীর্ঘ বৎসর নিরাপদে চলে আসিনি...। সেই যে রামদাস বলেছিলেন, সবারে দিয়েছ যদি আমারে দিয়েছ শুধু

পথ ...আমার পথই বল। এখানে আড়াল তো কিছু নেই—লোকের আদর করারও সুবিধে ছিল, টিল ছোড়ারও সুবিধে ছিল। যাক্, অনেক বাধার মধ্য দিয়ে এসেছি। ...আবার সংসারও বড় সুবিধের জায়গা নয়, এখানে চলবার কৌশল চাই ...সংসারে চলবার একটা কৌশলের কথা বলি ...। যেখানে ক্ষত, সে ক্ষত সেই খানেই রেখো ... যেখানে ঝগড়া সেটা সেখানেই রেখো ...সাধারণতঃ মানুষের স্বভাব ঝগড়া হলে সেটাকে সব কিছুতে ছড়িয়ে দেয় সাইনাসের মত। দলাদলি মানুষের স্বভাব ...কিন্তু তা করবেনা কখনও—প্রতি মানুষের মধ্যে যে এক আত্মা এ বোধের নাম আত্মজ্ঞান ...রাগদ্বেষ চলে না। ঝগড়া হলেই খাওয়া দাওয়া যাতায়াত সমস্ত ব্যাপারে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে—এ বড় সাংঘাতিক।...এক সংসারে বাস করতেই হবে। ...আমরা সকলে একই বাপের সন্তান অর্থাৎ এক আত্মা—অততি অর্থাৎ ব্যাপ্নোতি ইতি আত্মা—মা বাবা সব ভাইবোনদের মধ্যে বোপে আছেন—আত্মা যে সকলের মধ্যে বোপে আছেন—এতে তো সবল ঝগড়ার তিনি শেষ করে দিয়েছেন...। যেখানে এক্য সুকৃতির বাধা হয়, সেটা পাপ; যেটাতে একাত্মানুভূতি বাড়ে সেটাতে পুণ্য।...পর বুদ্ধিই পাপ...। মানুষ মিলনপন্থী—এটাই মানুষের জীবনের শেষ কথা...। দলাদলি মানুষের ধর্ম নয় ...যীশুকে যারা মারল, তাদের জন্যও তিনি দুঃখ পাচ্ছেন—এটাই মানুষের ধর্ম।...এক স্তরে দাঁড়িয়ে তারা যীশুকে মারছে, এ ছাড়াও তো সেই লোকের অন্য পরিচয় আছে... সেখানে দাঁড়িয়ে তো সে আর আমি এক।...একদল মানুষ আছে যারা ঝগড়া লাগান যায় কি করে তারই সুযোগ খোঁজে, আবার এমন মানুষও আছে যারা ঠিক তার উল্টোটা করে ...সক্রেটিসের মাথায় যোতলা থেকে কে ছাই ফেলেছিল, সক্রেটিস বললেন, যার মাথায় অগস্ত কয়সা পড়া উচিত ছিল, তার মাথায় শুধু ছাই পড়েছে...সে তো সামান্য! ...ছোট্ট শিশু মিথ্যে বোকেই না যে তার মা তাকে মারে... জিজ্ঞেস করলে বলে, না, মা মারে না...। এ রকম ভাবতে পারার মানসিকতার মূল্য অনেক।...একটু ঝগড়া হল—হল, কথা বন্ধ হয়ে গেল।...জীবনের সবটুকুই কি ঐ ঝগড়া?... এর বাইরে কি আর জীবন নেই।...যতদূর পার ঝগড়া বাড়িও না...যেখানে তার সঙ্গে মিলনের পথ পাবে, অমনি সেই মিলনের পথ ধরবে।...বুদ্ধির ত্রুটিতে মানুষ স্বার্থ হয়ে যায়।...যে বুদ্ধিতে সর্বের সাথে একত্ব স্থাপন করা যায় সেই বুদ্ধিই বুদ্ধিযোগ...। রামকৃষ্ণ বলতেন—On earth one family...। পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা কর।...ঝগড়ার জন্য ঝগড়া করো না...আত্মায় আমরা সকলে এক।... পুরুষোত্তম-যোগের মূল কথা একত্ববোধ।...।

৩২.৫৮।...আজ আমি আমার জীবনের চলবার পথের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করব...। কোনো প্রয়োজনের জন্য আমি কাউকে ভালবাসি নি, ভালবাসি না; কোনো অভিসন্ধি আমার নেই। একলা চলেছি...। বৃন্দাবনের শোষণহীন প্রীতির ভাবটা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ায়, মানুষের মধ্যে ব্রজের ভাব নিয়ে চলার ইচ্ছায় সেই ভাবেই চলে এসেছি।...ব্রজের এই প্রেম দ্যুলোকে না হয় এ কথা বলা হয়েছে—এইটে দেখাতে চেয়েছিলাম যে এই প্রেম মানুষের জগতে হয়...। তিনি বড় হয়েও এবং বড় বলেই ব্রজবালকগণকে কাঁধে নিলেন।...বড় ছোটর বোধ কোনদিন ভাল লাগে নি... এই ভাবটা আনতে চাই মানুষের মধ্যে...। গুরুর মত চলি না—চলি বন্ধুর মত...ছেলের সঙ্গেও, সংসারের সকলের সঙ্গেও, তোমাদের সঙ্গেও।...বৈষ্ণব দার্শনিক লিখলেন, 'সব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে একত্র হইয়া রয়'। ...বৃন্দাবন যেদিন থেকে বুকের মধ্যে ঢুকেছে, সেদিন থেকে অনাভিমান, সুদাভিমান—যে কোন অভিমান—দূরে গেছে।...আমিও কুলীনের ছেলে—কিন্তু কুলের গৌরব রাখি নি।...যখনই আন্দোলন করেছি—স্বেচ্ছাসেবকদের একাসনে বসতে দিয়েছি ...কিন্তু আজ বুঝি আর মানুষের সাথে প্রাণ খুলে একাত্মবোধে মিশতে পারলাম না—কেননা তাদের মধ্যে যদি এ ভাব সৃষ্ট হয়ে না ওঠে তাহলে একতরফা আর কত এ ভাব রক্ষা করা যায়?...বৈকুণ্ঠের ঠাকুরকে যদি রাখতে হয় তাহলে শুদ্ধ সখ্য দরকার।...সখা শুদ্ধ সখ্যে করে শুধে আরোহণ, তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম।...প্রয়োজনের সম্বন্ধ আজ কারো সাথে নেই—সম্বন্ধ প্রাণের, ভালবাসার।...বড় ছেলে সত্যব্রতর সঙ্গে

ময়···। আমি পুত্রের সঙ্গেও বন্ধুর মতই ব্যবহার করে এসেছি।...মনে করো না কারো সাথে প্রয়োজনের দায়ে আমি ঠেকেছি···। তোমরা কাজ কর, পাশে থাকি—থাকি ভালবাসি বলে। ভালবাসি, তাই তোমাদের সঙ্গে চলি।···নিজেদের খেয়াল খুশিতে চললে আমার এ মানসিকতা আয়ত্ত করতে পারবে না···। সাধুত্বের দাবী আমি রাখি না—তবে বন্ধুত্বের দাবী রাখি বটে।··· শরণাগত মন বুদ্ধি নিয়ে আমার কাছ থেকে জীবনের চলার এই ছন্দ শিখে নাও—শরণাগত না থাকলে শিখতে পারবে না···। তোমার বুদ্ধি দিয়ে গুরুকে চালাতে যেয়ো না···তিনি সরে দাঁড়াবেন...! জীবন নিয়ে খেয়াল চালালে ভগবানও সরে দাঁড়াবেনই···ভাগবতে আছে রাধাকে পর্যন্ত তিনি ফেলে যেতে পেরেছেন।..পিতা পুত্রকে মাথায় তুললেন—পুত্র যেন মনে না করে যে মাথায়ই আমার স্থান···।...চাই শুদ্ধ সখ্য···। ক্ষুদ্র 'আমি' থাকতে শুদ্ধ সখ্য হয় না···। ক্ষুদ্র আমি যার নেই, তার আমিই প্রতিষ্ঠিত হয়।...নিজের জেদ, নিজের আমি রেখো না...শরণাগত হও। ২৪ জন ভলানটিয়ার সহ স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে লণ্ডন আইন অমান্য করতে যখন বেরিয়েছি একটি ছেলের জন্য...। স্ত্রীকে বললাম তার সেবাশুশ্রূষা যেন নিজের ছেলের মতই করে। তাই-ই সে করেছিল।... তোমরাও ঘর ছেড়ে এসেছ···আমি পিতার মত, মাতার মত স্নেহ দিয়ে তোমাদের একাত্ম করে নিয়েছি...কিন্তু তোমরাও মতলব চালিও না।···কথামত চল, শরণাগত হও, সেবাকর্মের বাছাবাছি করো না···। তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে ভালমন্দ যেটা বিচার কর সেটাকে চূড়ান্ত করো না —তাহলে তাঁর বুদ্ধি চলবার পথ পাবে না, তাহলে তিনি আসবেন কোন্ পথে?···তোমার তার তুমিই বইতে পারলে তিনি তার নেবেন না।...তিনি মানুষের কাছে তার ক্ষুদ্র মনবুদ্ধি চাইছেন—যে মনবুদ্ধি অপরকে সহ্য করতে পারে না—অপরের সাথে মিলতে পারে না। তাই বার বার বলেছেন—মন্মনা ভব, মদ্বি বুদ্ধিং নিবেশয়।...রাবণ, শুম্ভ নিশুম্ভ, কংস—কেউ নিজের বুদ্ধি চালিয়ে পারে নি নিজের বুদ্ধিটাকে একান্ত করে তুললেই এ সংসার অতি ভীষণ স্থান হয়ে ওঠে—তখন যে কারো সাথে মিলতে পারা যায় না, কেবলি টক্কর লাগে···। কত কষ্ট করেছি জীবনে ইচ্ছে করেও···. ব্যায়াম করতাম। শীত সহ্য করবার জন্য ব্যায়াম করেই জলে ঝাঁপ দিয়ে জলে থাকতাম ১ ঘণ্টা···। খেয়ালী সন্তানকে বাবা না ভাল বাসলেও কিছু করতে পারে না, খেয়ালী শিষ্যকেও গুরু ভালবেসেও তার গতি করতে পারেন না।···সবাইকে বলি—তাদের ভালবাসি বলে।...ভালবেসে বড় কষ্ট পাচ্ছি।...মানুষকে আপন করতে গিয়ে পারা তো গেল না...। কালীকিঙ্কর নরেন সকলকে বলি—নগেনকেও বাদ দিতে পারছি না—তোমাদের একটা বড় জীবনের খোঁজ দিতে চাই তাই বলি।···আমি কাউকে মজুর ভাবে, চাকর ভাবে দেখতে কত কাল যে ভুলে গেছি···আমি সবাইকে দেখি ব্রহ্ম-মানুষ হিসেবে···। কারো জাত কুলের আমি খোঁজ রাখি নি...। ভালমন্দ, সতী অসতী সকলকে বুকে করে রওনা হয়েছি যদি মানুষ করে নিত্যগোপালের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।···বৃন্দাবন-তত্ত্ব একটু জীবনে ঢুকেছিল বলে কাউকে exploit করতে পারি না···আমি তো ছোট বলে কাউকে দেখি নি—আমি যে ব্রহ্ম-মানুষকে দেখতে পেয়েছি।···কিন্তু আজ বলি, ঠাকুর, মানুষকে ভাল করতে চেয়ে তাকে বকাবকির এ পেশা থেকে আমায় বাঁচাও।...আমার ভালবাসা যদি তোমরা স্বীকার না কর, তবে বিদায় নেবার আমার সময় হয়েছে।··· প্রয়োজনের দায়ে আমি ঠেকিনি।···কৃষ্ণ প্রেমের দায়েই ঠেকেছিলেন...। মানুষকে ভালবাসি বলেই মানুষের অনুগত হতে চেয়েছিলাম...তোমরা ব্রহ্ম-মানুষ হও।

৪.২.১৯৪৮··· আমাদের অবধূত সম্প্রদায়ের আদি শিব ও কৃষ্ণ। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বসে আছেন এই দুইটি চরিত্র—শিব ও কৃষ্ণ। শিবকে বাবা বিশ্বনাথ বলে ডাকে। বাবা হলেন তিনি কোন্ যোগ্যতায়? এ সংসারে যা কিছু পাওয়া বা হওয়া যায় তা যোগ্যতা দিয়ে—স্বামীত্ব পুরুষত্ব বিশ্ব সম্পদ যা কিছু যোগ্য হয়ে পেতে হবে। তাহলে শিব কি যোগ্যতায় বাবা বিশ্বনাথ হলেন?—এ সংসারে কে নিয়ে কাড়াকাড়ি সেখানে বাবা নেই—শ্মশান

নিয়ে কোন কাড়াকাড়ি নেই—তাই শ্মশানে তাঁর বাস। ...পাঁচতলা বাড়ী আর গাড়ী ফ্যান নিয়ে কাড়াকাড়ি—সে সবে তাঁর প্রয়োজন নেই।...স্নোপাউডার নিয়ে কাড়াকাড়ি—তিনি মাখেন ভস্ম।...তাল ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি—তিনি বেছে নিলেন ধুতুরা ফুল—পদ্মও নয়, গোলাপও নয়...। খাবেন তিনি ভূতের সঙ্গে—যারা বুদ্ধির খেলা খেলতে পারবে না—তাই তিনি ভূতনাথ। —এই সব যোগ্যতাগুলি কি কম যোগ্যতা? কয়জন মানুষ পারবে?...নিত্যগোপাল ঐ-রকম সোনার টুকরো দেহখানা নিয়ে থাকতেন ষাঁড়দের মধ্যে—তিনি গণতন্ত্রের ঠাকুর তো। পার? কয়জন পারবে এ সংসারে? ...শিব বোয়ালদের ঠাকুর—তাই কোচ পাড়ায় থাকেন। কোচরা যে মানুষই—মানুষ হিসেবেই যে তাদের প্রথম স্বীকৃতি দিতে হবে—যতই অ-ভদ্রলোক তারা হোক না কেন—এইটে স্থাপন করতেই কোচদের মধ্যে শিবের বাস। ...দেবতারা ভদ্রলোকদের মধ্যে থাকেন, দেবতাদেরও তিনি দেবতা—দেবাধিদেব মহাদেব—তিনি থাকেন ছোটলোকদের মধ্যে।...ট্রামে বাসে ট্রেনে কুলীর অর্থাৎ যাদের ছোটলোক নোংরা লোক বলা হয়—তাদের গায়ে গা লাগলে এখনও আমাদের গা শিউরে ওঠে...এই মানসিকতা দূর করতেই শিবের শ্মশানে,মশানে কোচপাড়ায় বাস।... Cleanliness is a bourgeous mentality—একথা ভুলে যেয়ো না—স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হবে সন্দেহ নাই—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নামে যে বিলাসিতার রোগ মানুষকে পেয়ে বসে তার থেকে সাবধানে থেকো। যখনই ইন্দ্রিয়রা জামাকাপড় না হলে যাদের সম্মানের হানি হয়—শিব, নিত্যগোপাল তাদের জন্য নয়।...শিব অদ্বৈতবাদী, তিনি কর্মী, জ্ঞানী, ভক্ত, বৈষ্ণব,—তাঁর কোন উপাধি নেই।...রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, জন্মেছি বিশ্বের বেশে, মানব বিশ্বাস্য হয়।...যদি উচ্চ জীবন যাপন করতে চাও তাহলে সংসারে যতদূর পার কম প্রয়োজন রেখো...। নিজের জীবনের কথা একটু বলি—কত টুকু শিবত্বকে জীবনে আনতে পেরেছি—১৯০৪-এ ১০৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে থেকে পড়তাম। আমার একটী মাত্র কোট ছিল...। ১৯০৪ থেকে তেল ছেড়েছি...। মাস্টারী করবার সময় হেডমাস্টারের অনুমতিক্রমে খালি পায়ে চাদর গায়ে গেছি...একটি জামাজুতো ছিল, ইন্‌স্পেকটার যেদিন আসতেন সেদিন ব্যবহার করেছি। Minimum necessity রেখে এই জীবনটা চালিয়ে এসেছি—লক্ষ লোক যেখানে উপবাসী সেখানে প্রয়োজন যত কমানো যায়...আমার স্বভাবটাই সাধারণের স্তরের। মানুষ কফি খেতে পায় না বলে শাক খায়—আমি শাক ভালবাসি, কফি ভালবাসি না...শিব আমার বাবা—আমি বাবার ছেলে হব...গণতন্ত্রের যিনি পূজক—তিনিই শিবের পূজারী, শিব গণতন্ত্রের দেবতা। শিব বাবা বলেই বিষ খেলেন ...সংসার-সমুদ্রে বিষ উঠছে—লোভীরা ভোগীরা প্রশংসা টুকু নিক, ভোগটুকু নিক—শিব নেবেন গরলটুকু...। নিত্যগোপালের এক ওয়ার্ডী শিষ্য তাঁকে একখানি তেলকেটের চাদর দিয়েছিল, সে চাদর আর তাঁর ব্যবহার করা হয়েই ওঠে না...গণতান্ত্রিক বলেই তাঁর ওই এক কথা—একেলা যাইব, সুখ না পাইব।...যে যে বিষয়ে বড়, যে যদি আর সেই ফুল, মান, ধন বিলিয়ে দিত—কম্যুনিজম আসত না।...বল শিবোঽহম্...শিব হও...। অবধূত মানে হচ্ছে—beyond all convention...ময়লা কাপড়েই চলুক—এ তো পরিষ্কারের বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।.. যোগেন্দ্র ঘোষ ম্যাজিষ্ট্রেট আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন—তাঁর কাছে উপস্থিত হতে আমার যা আছে তাই পরেই যাব।... মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াও—কাপড়চোপড়ের উপর দাঁড়িয়ো না ...। কফি মুষ্টিকয় চানা, কফি ঘিউ—অথচ ঘি-তে অর্থাৎ ভাল খাওয়া পরায়, নিজের রুচিতে মানুষ এত বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে যে কফি মুষ্টিকয় চানার সন্ধান দেওয়া তখন আকাশকুসুম।...আমাকে ভাল জিনিস দিলেও খাই না।...বৃন্দাবনের শীতে, ঐ প্রচণ্ড শীত, আড়াই বছর গায়ে লেপ নেই নি...কেন দুঃখ এত সহ্য করেছি—জনসাধারণের স্তরে গিয়ে দাঁড়াব বলে।...আমি মানুষের দুঃখের সঙ্গী হব...মনের এ ইচ্ছা থাকলে প্রয়োজন কমাও...। নরনারায়ণ আশ্রম মানুষের দুঃখের দিনের বন্ধু হউক। অনেকদূর যেতে হবে—luggage কমাও...।

বৃন্দাবন গেলাম, সঙ্গে ছিল দুটো কাপড়—তা'ও ফেলে দিতে চেয়েছিলাম—গুরু ভাই প্রণবানন্দজীরা হাসলেন, নাও না, পরেও তো ফেলে দিতে পারবে ...আমাদের বাইরের দিকে দৃষ্টি হয়ে গেছে বেশী···। প্রাচুর্যের অভ্যাস একবার হয়ে গেলে বদলান কঠিন ...পারবে যখন যেমন তখন তেমন হতে? হাসপোয়া খেলে আবার কবে খাব—মনটা তাইই জন্য অপেক্ষা করে। কথায় আছে—এক খায় আর তিতায়—এটাই হচ্ছে বৈষয়িকতা ···জীবনের মান বাড়াও—মনুষ্যত্বের মান—জামাকাপড়ের মান নয়। ...জীবনটা বাঁচিয়ে যা কিছু তোমার বেশী থাকে বিলিয়ে দাও···বিদ্যাসাগরের মাকে বারবারই লেপ দেওয়া হত, বারবারই তিনি বিলিয়ে দিতেন ...খোকে কাউকে দুখে থাকতে আমি দেব না···। মহাপ্রভু লোকনাথকে বলেছিলেন, লোকনাথ, তুমি আমি সংসারে সুখ ভোগ করতে আসি নি ···(গান গাইলেন) আর কিছু নাই এ সংসারে কেবল কালীনাম সার রে। যারা সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে পেয়েছে রাজ্য তার রে···আমার দরিদ্রেরই ধন ও রাঙাচরণ গলায় পরেছি হায় রে।...দরিদ্রের সম্বল জীবন—জীবনের ঐশ্বর্য অর্থে নয়, দামী কাপড়ে নয়—মনুষ্যত্বে—এই মনুষ্যত্ব তোমরা লাভ কর ···ভারতের আদর্শ দারিদ্রের মধ্যেও এই মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য।···বুদ্ধো রামনাথের কথা জান তো? ···সংসারের লোকে যাকে সুখ বলে সে সুখ আমি দিতে পারবো না ...সুখ চাও যদি, সংসারে চলে যাও।...সাধ যার ভাল লাগে না, তার গণতন্ত্রের সেবার অধিকার নেই।...Standard কমাও—বেশী না খেয়ে একজন দুর্ভিক্ষ পীড়িতকে রক্ষা কর।...বুঝলে নিও না···। বুদ্ধদেব শূন্যের উপাসক—প্রত্যেক মানুষেরই একবার এই শূন্যের উপাসক হওয়া দরকার।...বাহিরের এই ভিক্ষাঝুলি খালি, এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি···নিত্যগোপাল, আমায় শূন্য করে দাও—সেই শূন্যের বুক চিরে তুমি আসবে।···দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যেও পথ চলতে পারে।···দারিদ্র্যে অপমান নেই, অপমান অর্থের আকাঙ্ক্ষায়।···ভিক্ষুর বড়লোক হও—জ্ঞানে চরিত্রে ভালবাসায়...এইসব ঐশ্বর্য লাভ কর। ···নিত্যগোপাল, আমায় এই ধনে ধনী কর।—

৩, ২, ৫৮ ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়···। আমরা এই বর্তমান অন্ধকার যুগের মানুষেরা একটা নূতন যুগের ভোরে এসে দাঁড়িয়েছি। অতীত যুগের অন্ধকার পিছনে সরে যাচ্ছে···নূতন যুগে অতীত যুগের চালচলন, অতীত যুগের দেনাপাওনা চলবে না।...গুরু, ব্রহ্ম বড়, তাঁরা জ্ঞানের কর্তা—আমি ছোট, আমি পাওয়ার কর্তা—আমাকে ধন পেতে হবে, সব কিছু পেতে হবে।···কি করে আমি ধনীর কাছ থেকে ধন পাব? হয় সিঁধ কেটে, নয় আবেদন নিবেদন করে?···ইংরেজের গোলামী করে পেট ভরে না, but we were bled white। আবেদন নিবেদনেও কুলোল না—এল ক্ষুদিরামের যুগ—তাতেও হল না···তারপর অসহযোগ···। তারপরের ওরের কথা বলব।···বাপ পুত্র সম্বন্ধ—ছেলে বাপমায়ের কাছে কি করে চাইবে?···ইংরেজের দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না।...কিন্তু মায়ের যে দেবার জন্যই প্রাণ আকুল... দুধ যে তাকে দিতেই হবে।···আমার প্রয়োজন আমার চেয়েও আর একজন বেশী জানে...। আমি মাকে চাই না, মা যে আমায় চান।...জগাইমাধাই তো নিমাইকে চায় না—নিমাই তো জগাইমাধাই করে করে অস্থির—ছোটর জন্য বড়র এ অস্থিরতা ভাগবত ধরে ফেলেছে।···ভগবানকেও আমরা দীর্ঘদিন গোলামের মত পূজা করেছি···তাতে হবে না—তিনি আমার থেকে এত বড় যে আমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই—আমি গোলামের মত তাঁর খোসামোদ করে তাঁকে খুশী করব—এতে জীবের সম্মান কোথায়?... কিন্তু যে-মা আমাকে পাওয়ার জন্য আকুল, আমাকে সুখে রাখার জন্য ভাল রাখার জন্য আকুল—তাঁকে খুশী করার জন্য, তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য যদি আমি তাঁর পূজা করি—তাহলে সেটাতে মর্যাদাহানি হয় না।···ভগবানকেও তেমনি ভাবে পূজা করতে হবে—গোলামের মত নয়।···আমার প্রয়োজন আমার চেয়ে আমার গুরু বেশী জানেন।...শিশু তো রাজভোগ চেনে না—মা তো তাকে রাজভোগ খাওয়াতে পারেন।···নিত্যগোপাল যে আমাকে দিয়ে

বেদান্ত লেখালেন, সেটা কি আমি জানতাম? —শুধু একটু ওঁর শরণাগত হতে পেরেছিলাম, একটু ওঁকে ভালবেসেছিলাম, একটু ওঁকে বিশ্বাস করেছিলাম!...বিশ্বাস কর তোমার থেকে তোমার প্রয়োজন তিনি বেশী জানেন।... জগাইমাধাই তো জানে না তাদের মঙ্গলের জন্য নিতাই আর মহাপ্রভু কাঁদছেন।...মা যে কাঁদে তা কি ছেলে জানে? মায়ের চোখের জল মোছাবার জন্য আমাকে ভাল হতে হবে —এই-ই তো ভক্তিবাদ। ওঁর জন্য আমার কাজ। আমার কাজ আমার মঙ্গল বা আমার ভালোলাগা মন্দ লাগার জন্য নয়।...তোমরা আমার যারা আছ...সেবা করে যাও, অভিসন্ধি না রেখে সেবা কর...। সেবা হয় না যদি সেব্যের সাথে একাত্ম না হওয়া যায়।... ভগবানকে ভালবাসি, গুরুকে ভালবাসি কোন প্রয়োজনে নয়...অপ্রয়োজনের ভালবাসায় অনেক পাওয়া যায়...তুমি যেমন তোমার সন্তানের জন্য মরছ, তোমার বাবাও তো তোমার জন্য ভাবছেন। গল্প আছে—ধরামি সারাদিন রোদে কাজ করছে—তার বাপ এতে কষ্ট বোধ করছে। বার বার বলছে, নেমে আয়, এখন চলে আয়। ছেলে কাজ করেই যাচ্ছে। বাপ তখন তার ছোট ছেলেটাকে রোদের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিল—চালের ওপর থেকে ছেলে বলছে—ও বাবা, ছেলেটাকে একটু সরিয়ে নাও, ওর বড় রোদ লাগছে। বাপ বললে, তাহলে তুই নেমে আয়।...ভক্তিবাদ এইটে পৌঁছে দিয়েছে যে বড়রা ছোটদের জন্য কাঁদে। ...এতদিন ছিল আগে টাকা, তারপরে কাজ; নূতন যুগের কথা আগে কাজ, তারপর টাকা—অর্থাৎ আগে প্রাণ।... দুটো প্রাণ যেখানে মেলে সেইখানে টাকা—অভিসন্ধিহীন হয়ে, ভোগাবুদ্ধিতে না দেখে যেখানে দুটি প্রাণের মিলন, সেইখানে টাকা আসবেই।...মনিব সেবা করবার জন্য ধনের মালিক, শ্রমিক সেবা করবার জন্য শ্রমের মালিক—ধন ও শ্রম উভয়ই বিশ্ব-সম্পদ।...এতদিন কথা সেবা।... নরনারায়ণ আশ্রম বিশ্বের বুকে দাঁড়িয়েছে এই কথা বলবার জন্য।...বুদ্ধি চালিও না—নূতন যুগে বুদ্ধি শেষ হয়ে গেছে।...নিতাগোপালের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে গুরু ভাবনা ভাব, বিশ্বের ভাবনা ভাব।...আমি প্রত্যেকের প্রয়োজন আলাদা আলাদা ভাবে দেখে থাকি, সে দুই আমার আছে ... যে-'আমি' প্রাণবান, সেই 'আমি'-ই শুধু আগুনের দিনে নূতন বিশ্ব রচনা করতে পারে।...নাহং নাহং—তুহুঁ, তুহুঁ ...আমি নাই—তুমি আছ ...তিনি বলেছেন, একবার যে বলে—সত্যি করে বলে—আমি তোমার হলাম—তিনি তার হন।...তোমার অহংকারের বাঁধ ভেঙে যাও—দেখবে বিশ্বে চলার পথ কত সোজা হয়ে গেছে!... নিতাগোপাল-প্রসাদে ভবিষ্যৎ যুগের চলার পথের খবর পেয়েছি...তোমরা ব্রহ্ম-মানুষ হও।...বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থাক—শরণাগত হও।...ধরার ধূলি হবে ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হবে ব্রহ্ম-মানুষ'...

কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, কিন্তু যিনি নিজ জীবনে সবকেই পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া আস্বাদন করিতেছেন, তিনি কাহারও একচেটিয়া নন; তিনি প্রত্যেকের মাঝে পরিপূর্ণ থাকিয়াও প্রত্যেকেরই অধিক। কেহই কাহারও কাছে ধরা পড়িলেন না, সকলকেই সমভাবে জীবনে হজম করিতেছেন, তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিক। 'They complete, by excluding, each other' —De Broglie. পূর্ণযোগের এক একটি দৃষ্টিকোণ হইতেছে তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। পূর্ণযোগ সর্ব্বযোগের সমন্বয়।

—গীতাভাষ্য, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

গান্ধীজির ধ্যানের স্বরাজ

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ॥

ভারতবর্ষে তাঁর ধ্যানের যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে গান্ধীজি আজীবন সংগ্রাম করেছেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও আমরা সেই স্বরাজ থেকে যে কতদূরে তা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। এই 'স্বরাজের' পূর্ণ একটি আদর্শকে লক্ষ্য করেই গান্ধীজি অহিংস আন্দোলনের পথে দেশের কোটি কোটি মানুষকে চালিত করেছিলেন। অস্ত্রশক্তিতে প্রবল ও তার প্রয়োগে দ্বিধাহীন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একদিন এই ভারতবর্ষের অগণিত মানুষ নির্ভয় হৃদয়ে সকল কৃচ্ছ্রসাধনা, নির্যাতন এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করেছিল। গান্ধীজি তাঁর সকল কর্মে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। অথচ গান্ধীজি এ' কথাও বারবার বলেছেন যে, ইংরাজকে এ' দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ার নামই স্বরাজ নয়। গান্ধীজি ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকাকেও পুরোপুরি স্বাধীন দেশ বলে মনে করেন নি। কারণ ওই দেশগুলি বিভিন্ন জাতিকে বর্ণের ভিত্তিতে পরাধীন করে রাখতে আগ্রহী। গান্ধীজি বলেন, স্বাধীনতার আদর্শের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তাঁর আদর্শের স্বরাজ শুধু সত্য ও অহিংসার পথেই লাভ করা যেতে পারে। সে স্বরাজ জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বরাজ। অর্থাৎ তাঁর ধ্যানের স্বরাজ এমন একটি পূর্ণ আদর্শের লক্ষ্য যা কোন সময়েই একান্তভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীতে কোন আদর্শই কখনও অনড় ও স্থিতিশীল হয়ে থাকে না। জাতি তার চিন্তা ও সাধনার পথে নিজেকে আদর্শ স্বরাজ-এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলবে।

গান্ধীজি বলেন, "আমার কল্পনার স্বরাজ হইল একটি পরিপূর্ণ প্রজাতন্ত্র। স্বরাজ বলিতে আমি বুঝি, জনগণের দ্বারা গঠিত জাতীয় সরকার। এই জনগণের প্রত্যেককে পরিশ্রমের দ্বারা রাষ্ট্রের সেবা করিতে হইবে। মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের দ্বারা সকল ক্ষমতা অধিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত হইলে কখনই প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না।"

জনগণের এই ক্ষমতা নিছক রাষ্ট্রিক ক্ষমতা নয়। জনগণের জন্যই এর প্রয়োগ ও ব্যবহার। তাই গান্ধীজি বললেন—'জনগণের মধ্যে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার বোধ-সৃষ্টিদ্বারাই স্বরাজ অর্জিত হইবে। আমার নিকট স্বরাজ হইল সকল মানুষের-শাসন।'

এই স্বরাজে সমাজের নগণ্যতম ব্যক্তিরও পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। সমষ্টির চাপে ব্যষ্টির বিলুপ্তি অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে সংখ্যালঘিষ্ঠের ত্রাসত্ব তাঁর কল্পনার বাইরে। এই স্বরাজ হিন্দুরাজ নয়, মুসলমানরাজও নয়। আবার মেজরিটির প্রভুত্বমূলক গণতন্ত্রও নয়। শ্রমিকরাজ বা ধনিকরাজ কোন একটি বিশেষ সংজ্ঞাতে একে বোঝানো যাবেনা। 'এই স্বরাজ' প্রতিটি মানুষের স্ব স্ব সত্তার স্বীকৃতিতে এক অখণ্ড পূর্ণতার রূপ।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা এই স্বরাজলাভের পথে একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু শেষ কথা নয়। গান্ধীজি বললেন—'আমার ধারণা, স্বরাজ বিদেশ নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবে।' গান্ধীজির মতে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ যে কোন প্রকার বিদেশী সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ লোপ। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাও তাহার চাই। যাহার অর্থ ব্রিটিশ অর্থনীতি বা বিদেশী অর্থের প্রভাবলোপ। একই সঙ্গে চাই আর্থিক নির্ভয়তা।

অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার পরিধিকে গান্ধীজি আরও প্রসারিত করেছেন। তাঁর মতে স্বাধীনতার অর্থ সকল প্রকার আর্থিক বৈষম্য থেকে মুক্তি। 'স্বরাজ বলিতে আমরা এমন একটি অবস্থা বুঝিব যাহাতে দেশের দরিদ্রতম মানুষও যেন নিজেকে উচ্চতমের সহিত সমান বলিয়া অনুভব করে। অর্থাৎ ধনশালী ব্যক্তিরা জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেভাবে ভোগ করেন, দরিদ্র ব্যক্তিও তাহাদের ন্যায় সমান ভাবেই ভোগ করিবে। ধনী ব্যক্তিরা জীবনের

সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যে সব উপকরণ পাইয়া থাকে—দরিদ্র মানুষও সেই সব উপকরণ লাভ করিতে পারিবে।'

গান্ধীজি বলেছেন, তাঁর ধ্যানের স্বরাজ হবে 'রামরাজ' অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্য। 'আমি ভারতবর্ষে সেই স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিব, যাহা মানুষকে সর্বপ্রকার প্রভুত্ব হইতে মুক্তি দিবে—যেখানে দরিদ্রতম মানুষও মনে করিবে যে, এ দেশ তাহার দেশ, যে স্বাধীনতায় উচ্চ বা নীচ বলিয়া কোন শ্রেণী থাকিবে না। যেখানে কাহারও শোষণ করিবে না এবং কাহারও রক্ত শোষিত হইবে না।'

তাঁর স্বরাজ-এর পরিকল্পনায় সকল রকম শ্রেণী সম্প্রদায় ও ধর্মের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন গান্ধীজি। তাঁর লক্ষ্য জনসাধারণ। মানুষের স্ব অর্থাৎ সত্তার পূর্ণবিকাশই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর 'স্বরাজ'-এর ধারণা কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে শেষ হয়ে যাবার নয়। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির পরিকল্পিত 'স্বরাজ'-এর পূর্ণতার সীমারেখাও প্রসারিত হ'য়ে চলে।

'স্বরাজ'-এর এই রূপরেখায় হিংসার যেমন কোন স্থান নেই, তেমনই হিংসার দ্বারাও এই পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। রক্তাক্ত সংগ্রামের দ্বারা যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায়, শক্তির দ্বারাই সে ক্ষমতাকে আয়ত্তে রাখতে হয়। গান্ধীজি বললেন, 'আমার ধ্যানের স্বরাজে দেশ সশস্ত্র বাহিনীর আশ্রয় হইতে মুক্তি চাহিবে। ব্রিটিশ বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য দখলদারী জাতীয় সেনাদলের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। ব্রিটিশ বাহিনী তাহার হিংস্র যেয়ালেট সংবরণ করিয়া চলিয়া যাক; তাহার প্রস্থানের পর দেশে যদি দাঙ্গাও বাঁধে তবে তাহাকে আমি শান্তির পথ বলিয়াই মনে করিব।'

গান্ধীজির দৃঢ় বিশ্বাস—অহিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা যেমন সম্ভব, অহিংসার দ্বারাই সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করাও তেমনই সম্ভব। তাঁর ধারণা মত, কোন একটি রাষ্ট্রের সকল লোকই অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে পারে এমন সম্ভাবনা শুধু ভারতবর্ষেই আছে। স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষ যদি অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত থাকে, তবে বহিরাক্রমণের সম্ভাবনাও তার থাকবে না, একথা অনুমান করা চলে। তবুও কোনদিন সেই আশঙ্কা যদি প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে, ভারতবর্ষের মাটীতে আক্রমণকারীর আবির্ভাব ঘটে, তা'হলে অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত জাতি সসম্ভ্রমে আক্রমণকারীর সঙ্গে অসহযোগ করবে। নতি-স্বীকার করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয় বলে তারা মনে করবে। আক্রমণকারীর কামান যদি গোলাবর্ষণ শুরু করে, আক্রান্ত দেশের মানুষ সেই কামানের গোলার মুখে নিজেদের অর্পণ করবে। আক্রমণকারী যতই কঠোরহৃদয় হোক, যখন সে দেখবে যে, বিজিত দেশের নরনারী নতিস্বীকার না করে মৃত্যুবরণ করে চলেছে তখন নিশ্চয়ই তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটবে। সশস্ত্র যুদ্ধে যখন একটা দেশ ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে, অহিংস প্রতিরোধে সেই জাতির আত্মদান সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমের ভাবকেই প্রসারিত করবে। প্রেম শেষ পর্যন্ত অপ্রেমকে জয় করবে।

গান্ধীজি তাই বললেন—'আমি মানব সমাজের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে, মানব সমাজকে যখন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তখন বাঁচিয়া থাকিবার মূলমন্ত্রও তাহাকে জানিতে হইবে। পারস্পরিক প্রেম হইল সেই মন্ত্র। হিংসা ও ঘৃণা যদি জীবনের উপর প্রভুত্ব করিত, তবে আমরা বহুপূর্বেই এই পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতাম। প্রেম সর্বোত্তম ধর্ম। আমার ধ্যানের স্বরাজ তাই কোন মুহূর্তেই প্রেম-বিবর্জিত নয়।'*

---

* 'আকাশবাণী কলকাতা' থেকে প্রচারিত।

বাগুইআটীর নারায়ণতলা

॥ শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্তী ॥

চব্বিশ পরগণার অখ্যাত গ্রাম ছিল বাগুইআটি। বাগুইআটির নাম আজকাল অনেকেই জানেন। ৪টি বাস-রুট আজ বাগুইআটির উপর দিয়া যাতায়াত করে। গ্রামের সমাধির উপর দ্রুত গড়ে উঠছে আধুনিক শহর।

বাগুইআটি গ্রামে আজ বড় বাজার বসে। সেই বাজারের পিছনেই নারায়ণ তলা। জেলে এবং বাগুইদের বাসভূমি। অখ্যাত গ্রামের তথোধিক অখ্যাত এই নারায়ণ-তলা। সে নারায়ণতলার কোন খোঁজ রাখেন না বাগুই-আটি এসে আবাদ যারা তৈরী করেছেন তাঁরা। স্থানীয় অধিবাসীরাও খবর রাখেন না এই নারায়ণতলার মধ্য যুগে কি এক বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়ে গেছে। হিন্দুরা আর কাই করুক নিজেদের আরাধ্য মূর্তি নদী-গর্ভে ফেলে দেয় না সহজে। এক দিতে পারে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে অথবা বিধর্মীদের হাত থেকে দেবমূর্তির পবিত্রতা বাঁচিয়ে রাখতে। সে দিন কোন্ অজ্ঞাত কারণে কষ্টি পাথরের বিষ্ণু মূর্তি বিসর্জন দিতে হয়েছিল নদীতে?

আজ আর তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে খোঁজ নিলেই নারায়ণতলার নানা রহস্য মনকে টানে। ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের ইশারা পাওয়া যায়। সে ইঙ্গিত বুঝতে হ'লে তাবৎ এলাকায় ব্যাপক অনুসন্ধান দরকার। অর্জুনপুর এবং হাতিয়ারা গ্রাম দুটির নাম-রহস্য উদ্ধার করতে পারলে মধ্যযুগের তাৎপর্যপূর্ণ একটি অধ্যায়ের সন্ধান হয়তো পাওয়া যেতে পারে। নারায়ণতলার রহস্য এ ভাবেই উন্মোচিত হ'তে পারে।

নারায়ণতলার সঙ্গে নারায়ণের উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা নারায়ণতলায় কোন নারায়ণের উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। নারায়ণতলায় আছে একটি মন্দির। চারচালা মন্দিরের একটি অংশমাত্র নির্মীয়মান। অক্ষম হাতে খুব সাধারণভাবে তৈরী। তৈরীর অক্ষমতার জন্য কোন রকমেই এ মন্দির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না।

প্রতি বছর ১লা বৈশাখ এখানে একটি ছোট পাটো মেলা বসে শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করে। এ মন্দির একদা ছিল নারায়ণের। সে নারায়ণ অপসৃত হয়েছেন। বিনিময়ে শিব ঠাকুর আস্তানা গেড়ে বসেছেন। অবশ্য নারায়ণতলায় নারায়ণ অপেক্ষা শিবের উপস্থিতিই স্বাভাবিক মনে হয়ে। এই অনার্য আশুতোষ ঠাকুরের যথার্থ অনুচরেরাই এখানে বাস করেন। সমাজে যারা নিম্ন শ্রেণীর বলে বিদিত শিবঠাকুর তাদের কাছের দেবতা। নারায়ণঠাকুর বাংলা দেশে প্রবেশ করেছেন ব্রাহ্মণদের হাত ধরে গুপ্ত যুগে। সমাজে যারা উচ্চ শ্রেণী, নারায়ণের স্থান তাদের গৃহ-প্রাঙ্গনে, তাদের দেবালয়ে। বাংলার দরিদ্র জনসাধারণ আবহমানকাল শিবকে নিয়ে কাটিয়ে এসেছে। তারা রক্ত দিয়ে ইজ্জত দিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রতিরোধ করে এসেছে।

মন্দিরের পিছনেই পুকুর। এই পুকুর কাটতে গিয়েই আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয় নারায়ণ মূর্তি। স্থানীয় জমিদার এই মন্দিরটি তৈরী করে দেন। নারায়ণতলা নাম সেই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে মাত্র। পরবর্তী সময়ে নারায়ণ চলে যান পার্শ্ববর্তী গ্রাম অর্জুনপুরে। স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা গোরক্ষনাথ মন্দিরের লোকেরা নারায়ণমূর্তি চুরী করে নিয়ে যায়। বিনিময়ে শিবলিঙ্গটি চালান করে দেয়।

স্থানীয় লোকের বক্তব্য প্রায় ১০০ শত বছর আগে আবিষ্কৃত হয় নারায়ণ মূর্তি। তা হ'লে মন্দিরটির বয়সও ১০০ শত বছরের মত হওয়া উচিত। মন্দির দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। মন্দির ৫০-৬০ বছরের বেশি পুরণো বলে মনে করা সত্যি কঠিন।

প্রশ্ন হ'ল এখানে নারায়ণমূর্তি এল কেমন করে।

নারায়ণতলায় মাটির তলায় নারায়ণ মূর্তি থাকার যুক্তি কি? বাস্তবিক এ সব প্রশ্ন ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

বাগুইআটি গ্রামটিকে প্রাচীন গ্রাম বলে ভাববার কোন সুযোগ নেই। কোন প্রাচীন গ্রামের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠেছে এ গ্রাম তার কোন প্রমাণ নেই। বাগুইআটিতে প্রচুর নতুন ঘরবাড়ী গড়ে উঠেছে। অদ্যাবধি প্রাচীন কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নি। গ্রামটি আদিতে গড়ে উঠেছিল নদীর চড়ার উপরে। নারায়ণ তলার পুকুরটি নদীর চড়ার গর্ভ থেকে কেটে তোলা হয়েছে। শিব মন্দিরটি মজে যাওয়া নদীর তীরে তৈরী। সে নদীর স্মৃতি আজও খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় না। নদীর খাদে কোথাও ধানের জমি। কোথাও ঘরবাড়ী তৈরী হয়েছে। তবুও নদীর রেখাটি খুঁজে বের করা যায়। কোথাও কূপ, কোথাও তার স্ফীতোদর চেহারা। ৪৩ নম্বর বাস ষ্ট্যাণ্ডের পাশ থেকে নদী একটু বাঁক খেয়ে নর নারায়ণ আশ্রমের গা ঘেঁসে কেষ্টপুর গ্রামটির পাশ দিয়ে চলে গেছে। তবে মন্দির যখন তৈরী হয় তখন নদী ধানক্ষেতে রূপান্তরিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বাগুইআটি গ্রামটির চারিদিকে ধান ক্ষেত। আদি গ্রামটি দ্বীপের মত মাটি কেটে উঁচু করে গড়ে তোলা।

এই অঞ্চলটি সুন্দর বনের গর্ভে যে ছিল তার একাধিক প্রমাণ আছে। পাশেই লবণ হ্রদ। বাগুইআটি অপেক্ষা কেষ্টপুর অনেক প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে সুন্দর বনের স্মৃতি এখনো বেঁচে আছে। এই গ্রামে বারাঠাকুরের পুজো হয়। বারাঠাকুরের মূর্তি তৈরী করার শিল্পী-পরিবারও আছে। সুন্দরবনের অঞ্চলেই বারাঠাকুরের পুজো হয় একথা গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু বলেছেন। অবশ্য স্থানীয় এলাকায় বারাঠাকুর বাস্তুঠাকুর নামে পরিচিত। বারাঠাকুরের বাস্তুঠাকুরে রূপান্তর এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আবির্ভাব কি ভাবে ঘটলো তা একটি অনুসন্ধানের বিষয়।

নারায়ণতলার নারায়ণ মূর্তি বর্তমানে অর্জুনপুরের গোরক্ষনাথের মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। মূর্তি কালো পাথরে তৈরী। উচ্চতায় সাড়ে তিন ফুটের মত। এটি একটি দাঁড়িয়ে থাকা বিষ্ণুমূর্তি। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হাতে। দু'পাশে অবশ্য লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মাথার উপরে আনত হাতী। হাতীর পিঠে দণ্ডায়মান সিংহ মূর্তি। সিংহের উদ্যত পা একদিকে এক জনার তুলে ধরা চালের উপর, অন্যদিকে দাঁড় করানো তরবারীর মাথায়। সিংহের উপর মকরের মুখ। মকরের উপর এক দিকে বীণাবাদিনী অন্যদিকে নৃত্যরতা নারী মূর্তি। তার উপর গগনচারী উড্ডীয়মান বিদ্যাধরযুগল। হাতে তাদের ফুলের মালা। শীর্ষে বিষ্ণুর বিকট মুখের কীর্তিমুখ। বিষ্ণুর পিছনে কুলোর মত চালচিত্রে পদ্ম-পাপড়ির নকশা। এ রীতি পাল যুগের ভাস্কর্যকে স্মরণ করিয়া দেয়। পায়ের নিচেও একটি প্যানেল্ আছে। হাত জোড় করে বসে আছে গরুড়। অন্যদিকে অনুরূপ ভঙ্গীতে বসে আছে নরনারী যুগল। এরা ভাস্কর্যটি তৈরী করতে দিয়েছেন সেই দম্পতি। বিষ্ণু মূর্তি নিটোল অবয়বে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সমগ্র ভাস্কর্যের মধ্যে সিংহ মূর্তিতে অনভ্যাসের জড়তা যেমন আছে তেমনি আছে উড়িষ্যার ভাস্কর্যের প্রভাব।

প্রশ্ন হ'ল এমন বিষ্ণুমূর্তি এখানে এল কোন্ পথে? সামাজিক মর্যাদায় যারা নিম্ন শ্রেণীর, বিষ্ণু তাদের আরাধ্য দেবতা একথা মেনে নেওয়ার ঐতিহাসিক অন্তরায় আছে। বিষ্ণু যেমন অভিজাত সমাজের আরাধ্য দেবতা, তেমনি পাথরের মূর্তি যারহল।

স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে বেড়াচাঁপা বাগুইআটী থেকে খুব বেশী দূরে নয়। বেড়াচাঁপাতে প্রত্নকীর্তি বাংলার ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের কথা প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রত্নবিদরা এখান থেকে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত এক টানা এক সমৃদ্ধশালী নগরের গৌরবময় ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। বেগমা নামে নদীর অস্তিত্ব আজ স্বীকার্য। গ্রীক ইতিহাসবিদ্ টলেমি বেড়াচাঁপার এলাকাকেই গঙ্গারিডই বলে অভিহিত করে গেছেন। একদা বিদ্যাধরী নদীর উজান ঠেলে গ্রীকদের বাণিজ্য তরী গঙ্গা-রিডইর পথে উপস্থিত হত।

যতদূর সম্ভব বাগুইআটীর মজে যাওয়া নদীর সঙ্গে মজে

যাওয়া বিভাধরী অথবা বেগবতী নদী যুক্ত ছিল। আর চব্বিশ পরগণার মধ্য যুগের ইতিহাসখানা কারণে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু মুসলমানের যেমন একাধিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঘটেছে তেমনি ঘটেছে সহজ সমীকরণ। এই রক্তক্ষয়ী কোন এক সংঘর্ষের পথ ধরে বাগুইআটিতে বিষ্ণুমূর্তির আবির্ভাব হ'তে পারে।

অর্জুনপুর এবং রাতিয়ারা প্রাচীন গ্রাম। এ দু'টি গ্রামে ব্যাপক অনুসন্ধানে মধ্যযুগের আশ্চর্যজনক অনেক সংবাদ আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা আছে। এই দু'টি গ্রামের কোন এক অভিজাত পরিবার কি এই বিষ্ণুমূর্তি নদীর জলে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন?

আর একটি দৃশ্য কল্পনা করার সুযোগ আছে। যে-গঙ্গার কবির সোহাগে এ এলাকায় মুসলমান ধর্ম বিস্তারে নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন। তাঁরা বিপর্যয়ে রাজা চন্দ্রকেতু যুদ্ধে বিজয়ী হয়েও আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। পরিণামে বেগবায় নেমে আসে নৈরাজ্যের অরাজকতা। বেগবায় ঘটে ব্যাপক লুণ্ঠন তেমনি ঘটে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ। এমন এক বিপর্যয় পরিস্থিতিতে কোন এক ধনাঢ্য পরিবার তাদের গৃহ-দেবতা বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন এই পথে। পথেই তারা বিষ্ণুমূর্তির মর্যাদা রক্ষা করতে বিষ্ণু মূর্তিটি নদী বক্ষে ফেলে দেন। অথবা কোন সংঘর্ষের মাধ্যমে বিষ্ণু মূর্তিটি সলিল-সমাধি লাভ করে।

অজ্ঞাত যুগের সেই অজ্ঞাত দিনটিতে বাগুইআটীর নারায়ণতলার নদী বক্ষে কোন্ নাটক অভিনীত হয়েছিল কে জানে!

নারী-স্বাতন্ত্র্যের সত্যিকার তাৎপর্য

। শ্রীরেণু মিত্র ।

ফুল ফাইনালের ফল কাল বের হবে, তবে অনেকেই, কি করে অত খবর রাখিনা, আগের দিন সন্ধ্যে বেলা-তেই ফল জানতে পেরেছিল। বিনীতাও দেখলাম কোথা থেকে খবর এনেছে—সে কৃতকার্য হতে পারে নি। গেল বছরও সে অকৃতকার্য হয়েছিল, এবারেও তাই হল। কথা বিনীতা কোন দিনই বেশি বলে না, তার মনের কথা কেউ কোনদিন জানতে পারেনি। প্রাণ খুলে তার নিজের কথা তাকে বলতে বড় শুনি নি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় মুহূর্তের জন্য তার মুখখানা কালী হয়ে গেল, কিন্তু মনে হল তার পরেই সে সামলে নিলে। বেশ হাসিমুখিভাবেই কথাবার্তা বললে। তার মধ্যের কোন অস্বাভাবিকতা বাড়ীর কারও চোখে পড়ল না। অনেকদিনই যেমন সে যায়, পরদিন তেমনি সে পাশের বাড়ী গেল বলে দুপুরের পর বেরিয়ে গেল। কিন্তু আর ফিরল না। রাত্রি আটটা, নয়টা, দশটা, বারোটা—রাত্রি শেষ হয়ে গেল বিনীতা ফিরে এল না। সন্ধানের জন্য যা কিছু করবার করা গেল। জ্যোতিষ থেকে পুলিশ কেউই বাদ গেল না। পুলিশ কোন সংবাদ দিতে সক্ষম হল না, জ্যোতিষ আমাদের যন্ত্রণা জল্পনার খোরাক জোগালো। সে ভাল আছে, টাকা নিয়ে গেলে কাল তার ঠিকানাও বলে দিতে পারবে ইত্যাদি বলে আমাদের সে বাড়তি রাখলো।

জেনে শোনায় না বিনীতা গেল কেন? অবশ্য তাদের ভাল, মা না থাকলেও বাড়ীতে আদরের অভাব ছিল না। বাড়ীতে চলাফেরার কৃচ্ছ্রতাও ছিল না—মোটা-মুটি বলা যেতে পারে বিশেষ কোন দুঃখ তার ছিল না।

তবু কেন সে বেরিয়ে গেল? কারো সাথে তো তার কোন পরিচয় ছিল না। বাইরের দিক থেকে বেরিয়ে যাবার কোন সূত্রই তার আত্মীয়স্বজন বের করতে পারলে না। আর গেলোই বা সে কোথায়?

তৃতীয় দিনের দৈনিক পত্রিকা অন্ধকারে পথ দেখাল। একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। বুঝলাম জীবিত না হলেও তাকে তবু পাওয়া গেল। তার অনিশ্চয় অবস্থিতি অত্যন্ত পীড়াদায়ক হচ্ছিল, তার চেয়ে মৃত্যুর নিশ্চয়তা অনেকেই প্রার্থনা করেছিল। তাদের পক্ষে পরম নিশ্চিন্ততা লাভ হল।

যাওয়ার দিন দুই আগে থেকে বিনীতাকে অনেক সময়ই কিছু লিখতে দেখা গেছে। লিখত সে মাঝে মাঝে—কিন্তু এ দু'দিন যেন একটু বেশি লিখেছে। কিন্তু অনেক খুঁজেও তার প্রধান খাতাটার সন্ধান পাওয়া গেল না—বাড়ীর কোন ছোট ছেলে বলল সে যখন বেরিয়েছিল, তখন তার হাতে খাতামতই কিছু একটা ছিল। তবে তার আসল খাতা পাওয়া না গেলেও ছোটখাট দুই তিনটি যা পাওয়া গেল তা সংক্ষেপেও বিনীতার অন্তরের বোধহয় সবটুকু কথাই জানাতে সক্ষম হল। দেখা গেল পাশ না করলে আত্মহত্যা করবে, এ সে দীর্ঘদিন আগেই স্থির করে রেখেছিল।

বিনীতার মধ্যে ছিল একটা গভীর অসন্তোষ—কিছুই ভাল না লাগার, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকার, কোন স্থিতিভূমির সন্ধান না পাওয়ার অনিশ্চয়তার সন্তোষহীনতা। এই অসন্তোষ বর্তমান সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ দান। বলতে পার সে তো পড়াশুনাই করছিল, তা হলে তার 'নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না বল কেন?—যদি এইজন্য যে সতেরো বছরের মেয়ের পক্ষে পড়াশুনাটাই একমাত্র ধান্ধা যদি না হয়ে থাকে, তবে দোষ কিছু দেওয়া যায় না, যখন সেই দিকেও খুব তীক্ষ্ণতা তার মধ্যে ছিল না। মন উঠেছে নানা রকমের, অথচ তাদের কোন সমাধান পাচ্ছে না; নানা রকমের জীবনযাত্রা, নানা চিন্তাধারার ছিটে ফোটা নানাভাবেই এসে যাচ্ছে মনের দুয়ারে অথচ তাদের সবগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। এই সমস্ত মিলিয়ে যুবকদের কথা না-ই বললাম, যুবতীদের চিত্ত আজ অনিশ্চয়তা ও অসন্তোষে ভরে গেছে। আমরা অতীত ব্যবস্থাকে হারিয়েছি, কিন্তু বর্তমানের নানা আস্বাদনের মধ্যের কোনটাতেও স্থিতি লাভ করতে পারি নি। বিনীতার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই কিন্তু দৃঢ়ভাবে মানা করবার মত মনের জোরও নেই। বিয়ে না করাটা যদি জীবনের কোন সৎধর্মের প্রকাশ না হয়, তবে যে সেটার কোন নিজস্ব সার্থকতা নেই, এ কথা বিনীতার মত মেয়েরা জানতে পায় নি। তারা দেখছে ঘরে ঘরে অনেকেই বিয়ে না করে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু কেন তারা বিয়ে করেনি, বিয়ে না করে তারা কেমন আছে, কোন্ অবস্থায় কি মনোবৃত্তি নিয়ে বিয়ে না করা চলতে পারে—এ সকল চিন্তা এবং তার সমাধান কেউ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় নি। নিজেদের যা ভাল লাগে তাই করতে চাওয়ার মত একটা প্রবণতা তারা হাওয়ার মধ্য দিয়ে পেয়েছে। বিনীতাও কেবলই ভাবতে চেষ্টা করছিল বিয়ে না করবার কথা। তাই বিয়ের প্রসঙ্গ বাড়ীতে উঠলে সে প্রবল বিরক্তি প্রকাশ করতো অথচ একেবারে না করতে পারতো না। কারো সঙ্গে আলোচনা করে নিজেকে ভাল করে বুঝবে, একটা নিশ্চিন্ত পথের সন্ধান নেবে—এমন প্রাণখোলা মনের অবস্থা তার ছিল না, যেমন থাকে না অনেকেরই। কিংবা তাদের থাকবে এ কথাই বা বলি কেন? আমরা যারা অভিভাবক আমাদেরই তো উচিত ছিল বর্তমানের মেয়েরা যে দোটানার আবর্তে পড়ে যে অনিশ্চয়তার সংশয়ে দোহে মনে প্রাণে ক্লিষ্ট হচ্ছে—সেই অবস্থা সম্বন্ধে তাদের সজ্ঞান করিয়ে তাদের সামনে সমাধানের পথ খুলে ধরা। কিন্তু আমরাই কি ছাই ঠিক সমস্যাটা কি তা জানি, না তার সমাধান সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই সজ্ঞান?

বিনীতা দশজনের মত সহজভাবে বিয়ে করে সংসার করবে, এটাকেও সহজ বলে মনে করতে পারে নি—অথচ পড়াশুনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বিয়ে না করে থাকবে—যত অনিশ্চয়ই তা মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে হোক না কেন—সে দিকেও জোর পেলে না; দু'বারই সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হল। বিনীতার চোখের সামনে আর কোন পথ নেই।

তার লেখা থেকে মেয়ে মনের এই ছোটানা নিয়ে অন্তরালে সে বেশ কিছুদিন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে, কিন্তু পথ খুঁজে পায় নি। দুঃখ এই, নিজের ওপরই সে সমাধান নিজে করিয়ে রেখেছিল! তাই নিরুপায় বিনীতা নিজেকে নষ্ট করে দিলে।

অবশ্য পথ খুঁজে পাবার দায়িত্ব সবটুকু তার ছিল না। নিজেকে সে প্রকাশ করতে পারতো শুধু; নিজেকে নষ্ট করবার কোন অধিকার তো তার ছিল না। তবু চলে গিয়ে বিনীতা আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে বলে গেল।

সমস্যাটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে?—মেয়েরা আজ একটা নতুন আবহাওয়ার মধ্যে বেড়ে উঠছে। তারা জেনেছে তারা লেখাপড়া শিখতে পারে, সে জন্যে ঘরের বাইরে যেতে পারে, দশজনের সঙ্গে সেখানে মেলামেশা হয়—সেই দশজন যে ছেলেই হবে, তা-ও নয়, দশটি মেয়ের সঙ্গেও দেখা হয়; তাই সাড়ে এগারটায় ক্লাস আরম্ভ হলেও দশটাতেই বাড়ী থেকে কলেজে চলে যায়, তাদের কথা হচ্ছে বাড়ী বসে ভাল লাগে না, কলেজে তো মেয়েদের সঙ্গে তবু বেশ গল্প করা যায়—তারা চাকুরী করতে পারে, তারা নানা সমিতিতে যাওয়া-আসা করতে পারে—অর্থাৎ মেয়েদের জীবনযাত্রার ধরন হয়েছে অনেক, বিচরণ ক্ষেত্রের একটা পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট। কিন্তু এই পরিবর্তনটির সার্থকতা কেবল এতেই নেই—এই কথাটা বুঝতে হবে। পাশের পর পাশ করে মেয়েরা চাকুরী করে জীবন কাটাবে—সভাসমিতিই হবে সভা-সমিতির শেষ পরিণতি, হৈ-চৈ করাই সেখানে মুখ্য কাজ কিংবা গান-বাজনা রাজনীতি কোনটাই সেখানে জীবনকে সুন্দরতর কল্যাণতর প্রকাশের সহায়ক না হয়ে হয়ে উঠছে চিত্ত বিক্ষেপের কারণ—এ তো চলতে পারে না। বিশেষ কারণে বিশেষ ক্ষেত্রে বিয়ে না করবার স্বাধীনতা মেয়েদের আছে—কিন্তু সেটা সমাজের সর্বসাধারণ নিয়ম নয়। নানা রকমের যে বাধানিষেধ তাদের ওপর ছিল, সে বাধানিষেধ তেমনি নিয়ম বা আইন হিসাবে আর রাখা যাবে না, এটা ঠিকই। বাইরে তাকে যেতেই হবে—খানিকটা ধরে নিতে পারি স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত তাকে পড়াতে হবে, বাইরের আর দশটা কাজেও তার যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। তাই ক্ষেত্র-সংকোচন আজ আর তেমন সম্ভব নয়। শুধু মেয়েদের মনোবৃত্তিটাকে গড়তে হবে নূতন করে। কাজ-কর্ম মোটামুটি এই-ই করার সম্ভাবনা রয়েছে, বিয়ে করে সংসারধর্ম পালন করলেও বাইরে চলাফেরার স্বাধীনতা সুযোগ ও অবসর মোটামুটি তাদের অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। কিন্তু বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছিল যে সংযমনের জন্য, সেই সংযমটা আনতে হবে সহজ আত্মসংযমরূপে, যে আত্মসংযমনের ফলে বাইরে বিচরণ করেও বিপদে পড়বার অবস্থা না ঘটে। বাইরেটা তো তামাশার ক্ষেত্র নয়, সেটা শিক্ষা ক্ষেত্র, জীবনকে আস্বাদনের ক্ষেত্র। সেখানে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সে স্থানটা জীবনযাত্রার সঙ্গীকে বেছে নেবারও স্থান হয়ে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু বেছে নেবার জন্যে একটা তো মানদণ্ড থাকবে, যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে যা কিছু তাই-ই তো গ্রহণীয় নয়। এক-দিন যখন অভিভাবকদের ওপর ছিল বেছে দেবার ভার, তখন তাঁদের একরকম মানদণ্ড ছিল—আজ সে মানদণ্ডের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তা মানদণ্ড তো একটা থাকবেই—যা খুশী তাই করতে পারাটা তো স্বাধীনতাও নয়, জীবনের পক্ষে পরিপোষকও নয়। অর্থনৈতিক এবং সংগত একটা পরিবর্তিত আবহাওয়া মেয়েদের আজ বাইরে এনে দিলে অথচ সেই বাইরেতে চলবার পরিবর্তিত মনোভঙ্গ তাদের দেওয়া হল না, জীবনসঙ্গী বেছে নেবার নূতন মানদণ্ডও তাদের দেখান হল না। আধুনিক মেয়ে-দের সমস্ত অন্তর্বিরোধ এইখানে। নারীর পক্ষে তার নারীত্ব সম্বন্ধে একটি পরিবর্তিত মনোবৃত্তিই আজকের দিনের প্রয়োজন। বিনীতা বিয়ে করাটাকে সহজ মনে করতে পারছে না। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় বিয়ে করে মেয়েদের যে অবস্থা হয়, যেমনভাবে তাদের আত্মস্বাতন্ত্র্য নিঃশেষে মুছে ফেলতে হয়—সেই অবস্থাটাকে বিনীতা গ্রহণ

করতে পারছিল না, অথচ বিয়ে না করাটা যে খুব সহজ কথা নয়, তাও সে জানে! এমনি দ্বন্দ্বে, অসন্তোষে আর সংশয়ে মেয়েরা আজ বিক্ষিপ্ত। তার ফলে এ কথা বললে ভুল বলা হবে না যে, বিয়ে না করে আজ যারা আছে, তাদের জীবনে যেমন ব্যর্থতার, শূন্যতার, অসুন্দরতার জ্বালা, তেমনি যারা বিয়ে করে সংসার করছে তারাও যে বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। ঘরে বাইরে মেয়েদের এই যে অবস্থা, এই দ্বন্দ্ব, এই অসন্তোষ, স্বাধীন হওয়ার প্রেরণাবোধ অথচ পথ না জানার মূঢ়তা—এ অবস্থা আত্মহত্যাকর সন্দেহ কি?

তাহলে পথ কোথায়? এই আত্মহত্যা থেকে মেয়েদেরকে বাঁচাতে হলে মেয়েদেরকে তাদের আত্মস্বরূপকে বুঝতে হবে, নারীত্ব সম্বন্ধে পরিবর্তিত চিন্তাধারা বুঝতে হবে। তাদেরকে পথে চলতে হবে, দশজনের সঙ্গে মেলাও হবে, ব্যবহারের আদান প্রদানও করতে হবে, পড়াশুনা, গানবাজনা, রাজনীতি সভাসমিতি প্রভৃতিও মাত্রার মধ্যে চলবে। কিন্তু এ সবের মধ্য দিয়ে মেয়েদের মনুষ্যস্বরূপ বিকশিত হয়ে চলছে কি না লক্ষ্য রাখতে হবে সেইখানে। তেমনিই বিবাহিত জীবন যাপনের মধ্য দিয়েও—স্ত্রীত্ব, গৃহিণীত্ব, মাতৃত্ব প্রভৃতির মধ্য দিয়েও—নারীর মনুষ্যস্বরূপ বিকশিত হচ্ছে কি না, সেইখানেও লক্ষ্য রাখতে হবে তারই ওপর।

সেই পরিবর্তিত মনন্তত্ত্ব কি? নারী কিংবা পুরুষ উভয়েরই আত্মস্বরূপকে উপলব্ধির পথে বাধা জন্মায় তার অন্তর্নিহিত আসক্তি ও বিদ্বেষ। এই আসক্তি নারীর মধ্যে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাকে এই ভাবে দেখা যায়। পণ্ডিচেরীর শ্রীমা'র ভাষায় সেটা এই—

'No one can liberate women unless they liberate themselves. What makes them slaves is:

(i) Attraction towards the male and his strength.

(ii) Desire for homelife and it's security.

(iii) Attachment to motherhood.

If they get free from these slaveries they will truely be equal of men'—মেয়েরা নিজেদের নিজেরা মুক্ত না করলে অপরে তাদেরকে কি করে মুক্ত করবে? যে মনোবৃত্তিতে তারা দাসী হয়ে পড়ে তা হচ্ছে (১) পুরুষ ও তার শক্তির প্রতি আসক্তি, (২) গৃহজীবন ও তার নিরাপত্তার প্রতি আসক্তি এবং (৩) মাতৃত্বের প্রতি আসক্তি। এই তিন জায়গায় আসক্তি থেকে নারী যদি নিজেকে মুক্ত করতে পারে, তবেই পুরুষের সমকক্ষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে। আর তখনই নারী তার আত্মস্বরূপের আস্বাদনে সমর্থ হবে। পথও যেখানে নারীর বিচরণ ক্ষেত্র, সেখানেও এই তিন আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত নারী-প্রকৃতি নারীই পথ চলার পাথেয়। নারীর বিবাহিত জীবনকে মুক্ত স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল করতে হলেও পুরুষত্ব ও তার শক্তি সম্বন্ধে মুগ্ধতা নারীকে দূর করতে হবে, গৃহজীবনের নিরাপত্তা ও তার নানা সুখসুবিধার মোহ যেন নারীকে পেয়ে না বসে এবং সন্তান স্নেহে বদ্ধ হয়ে যাওয়া থেকে যেন নারী নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। পুরুষকে জীবনে গ্রহণ করা আর পুরুষত্ব ও তার শক্তির প্রতি আসক্ত হয়ে আটকে পড়া এক কথা নয়, তেমনি মাতৃত্বকে জীবনে স্বীকার করা আর মাতৃত্বের মোহে আটকে পড়া এক কথা নয়। এই আটকে পড়াটাই দোষাবহ—কোন বৃত্তি নয়।

বিনীতার মত অবিবাহিত মেয়েদের অন্তরেও সুপ্ত রয়েছে এই আসক্তিগুলিই—এই আসক্তিগুলিরই রকম-ফেরের কাছে নত হয়ে পড়েই মেয়েরা জড়িয়ে পড়ে নানা জালে। শুধু পুরুষত্ব ও তার শক্তির প্রতি তীব্র সংবেগই অবিবাহিত মেয়েদের পথে ঘাটে আজ এত বিপন্ন করছে। তারা যদি নিজেদেরকে মানুষ মনে করে জীবনের পথে অগ্রসর হয় এবং পুরুষত্বমাত্রের প্রতিই নত হয়ে না পড়ে, তাহলেই তাদের আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে। তখন বাইরেকে এত ভয় করবার কিছু থাকে না। যখন জানি বাইরেটা আমার পক্ষে কোন বিদ্বেষ, সেখানে বিপদই রয়েছে জড়িয়ে আসক্তির নানা রূপ ও রকম ফেরেরই অন্তরালে—তখন বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধের

প্রতি-আকর্ষণ বিপদে মেয়েদের কেলেবেই ! বাইরেতে যারা বেড়িয়ে পড়ে নি, অথচ বেরোবার প্রেরণা বোধ করে—বাইরের এই ভাই তাদের কাছে সামনের দিকের পথ রোধ করে রেখেছে। কিন্তু এই বাইর উলা কেবই আমার আত্মবিকাশের ক্ষেত্র—পুরুষদেরই প্রতি আসক্তিবিদ্বেষ নিয়ে খেলা করবার ক্ষেত্র নয়—যেমন তেমন করে স্থানকালপাত্র বিবেচনা না করে পুরুষদেরই কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবার ক্ষেত্র নয়—এই রকম চিন্তা আজকের মেয়েদের মধ্যে দিতে হবে—অন্তর্বিরোধ অনেকখানিই কাটবে এই পথে।

দু'বার পাশ না করে বিনীতা আর সামনের দিকে পথ দেখতে পেলে না। এ কথাটা বিনীতাকে কেউ জানায় নি যে জীবনটা পাশের চেয়ে বড়। পাশ করতে পারলে ভাল ছিল, না করাটা পাপের কথা নয়; কিন্তু তবু এই অজুহাত জীবনটার আনাচে কানাচে এত পথই বেরিয়ে যাবার রয়ে গেছে যে, এতদিন তাদের দেখা পেলে বিস্মিত হয়ে ভাবি এই অনন্ত চরাচরে এত পথই আমার পথ! মেয়েদের এ কথাটা জানতে হবে যে কোন পথই একমাত্র পথ নয়। এই বিশ্বের অনন্ত পথ দিয়ে ভগবান যেয়ে চলেছেন, তাঁরই পায়ে পায়ে আমারও চলার পথ—এর কি কোথাও কোনদিন শেষ আছে? নিজেকে এত ছোট মনে করবো কেন? আমি যে সেই তাঁর পথেরই যাত্রী—'যাত্রী আমি ওরে, পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে'—সেটা এই বিশ্বের মধ্যেই পথ চলার কাহিনী! এত কথাই জানবার ছিল—হায় রে বিনীতা, তার কিছুই না জেনে ক্ষণেক মত এই যে তুমি চলে গেলে—এ যাওয়ার অধিকার তো তোমার ছিল না। আর মনের কোন কোন দ্বন্দ্বের সমাধান হলে পড়াশুনা হয়তো তোমাকে দিতেও হতো তাই,—এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করে ফেললে?

বাইরেতে আজ এই যে এসে মেয়েরা দাঁড়াল, সেখানে মানুষ খুঁজে নেবার মানদণ্ড হবে কি? মানুষকে আজ মানুষ হিসেবে দেখবার মানদণ্ড এসেছে—জাতিকুলশীল অর্থ প্রতিপত্তিই বিচারের একমাত্র মানদণ্ড নয়। মানুষ বলব কাকে? যার জীবনে ব্যাপকতা এবং গভীরতা দুটোই আছে, আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে নিজেকে যে বিশ্বজীবনের অঙ্গীভূত মনে করে সংশ্লিষ্টজীবন যাপন করে, তাকেই মানুষ বলে মনে করতে পারা যাবে বলে বলা যায়। শুধু মাত্র পুরুষত্ব কিংবা শুধুমাত্র নারীত্বই যেন না আমাদের মানদণ্ডের প্রধান বিচারক হয়ে দাঁড়ায়। তা যখন হয় তখন প্রেমাস্পদ সেই আসক্তিরই আমরা দাস হয়ে পড়ি। আজ বড় দুঃখে বিনীতার কথা, বিনীতার মত মেয়েদের কথা মনে পড়ে। অন্তরের প্রেরণার অর্থ তারা বুঝলে না, কেউ তাদের বোঝাল না, দুইটি আদর্শের সংঘাতে পড়ে এমন কত কচি প্রাণ বলি হয়ে গেলো, কত প্রাণ ছিলে ছিলে বলি হচ্ছে। জীবনের আদর্শ কল্যাণ ও সৌন্দর্যকে রক্ষা করে প্রগতিকে জীবনে হজম করতে পারার আহ্বান এসেছে ভারতীয় নারী সমাজের কাছে—আমরা যেন এখনও অবহিত হই *

* বাইশ বৎসর আগের লেখা পুনর্মুদ্রিত।

"নর যদি অ-রমণ হইত, নারী যদি অ-রমণী হইত, নর ও নারী যদি পুরুষোত্তম অভিযোগে নিজের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিত, বিশ্বরূপ হইত এবং এইরূপে উৎ-আসীন হইয়া পরস্পরের মধ্যে গলিয়া এক অখণ্ড (indivisible) হইত, তবে তৎক্ষণাৎ এই সম্পর্কের ভিতর হইতে কাম গলিয়া পড়িত।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

নবারুণ

শ্রীগণেশ চক্রবর্তী

দিবা অবশেষে—
অন্ধকার স্তব্ধতার বেশে,
রাত্রির প্রহর গোণা শুরু।
আকাশের মেঘমন্দ্রে
বিদলিল বিদ্যুৎ ঝলকে,
পলকে চমক জাগে
নিরাশার অবসাদে
শ্রান্তিভরা সুপ্ত জীবলোকে।
আকাশের মহাশূন্যে আঁখি অগোচরে
পুঞ্জ পুঞ্জ যত ব্যথা
জমে উঠেছিল ঘরে ঘরে—
ক্ষুব্ধ অট্টহাসে আজ অশনি সংকেতে
আনে বার্তা রটিবার অশান্ত মাতনে
প্রতিবাদ—; প্রতিবাদ
প্রখর সূর্যের দাবদাহে।
তৃষিত মাটির মূক ভাষা
জানায়েছে যত অভিশাপ
সে সকল উষ্ণ বায়ুস্তরে
ধেয়ে চলে ঊর্দ্ধ আকাশেতে সংগোপনে
গুরু গুরু মেঘ কলরোলে
ফেটে পড়ে সমগ্রের ঐক্য আন্দোলনে।

আমারো শিরায় জাগে
যুযুৎসার রোষ গহি জ্বালা—
ধমনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ;
অক্ষয় ধৈর্যের মানবতা
মুক্তি পায় তীব্র অসন্তোষে—,
দুর্বলের ব্যর্থ ক্ষমাবাণী
আমার বোধের মাঝে
সহস্র ধিক্কার দেয় আমি।

চেয়ে দেখি নিছিদ্র আঁধারে যার রেখা
ক্ষণপ্রভায় যেন লেখা আছে ভবিষ্যের লেখা।
আমার অক্ষুব্ধ চিত্ত
তাতে তাই জাগে উপবাসী,
দারিদ্র্যের অভিশাপে
আজো যারা রয়েছো উদাসী, ছাড়ো ঘর
শেষ করো গোণা ক্ষীণ জীবনের অন্তিম প্রহর।
চেতনা জেগেছে এক ঠাঁই
তুচ্ছ ভেদাভেদ নিয়ে পিছনের পানে আর
তাকাবার সময় তো নাই।
ঘরের সীমাত ব'াধা ভ'ালে
নেমে এস নীল নভোতলে।
দেখ চেয়ে বিশ্বের অসীমে কত ধারা,—
ঘরের নেশায় ছিল যারা
শত শত শতাব্দীর
ঘূর্ণী ঝড়ে আজ সব হারা।

আনো আশা—
মুছে ফেল জমে আছে যে ব্যর্থ হতাশা,
আগামী জীবনে দাও
নতুন দিনের নব ভাষা।

সে ভাষায় রক্তিম বেদনা থাক্
প্রত্যাশের অনন্ত আশ্বাস—,
কুয়াশার জাল কেটে দেবা দিক
উজ্জ্বল প্রকাশ—
আপনার মনুষ্যত্বে জাগুক বিশ্বাস,
ধাত্রীর সৃষ্টির পরে তোমার আমার
আজি নহে প্রথম নিঃশ্বাস।

সূর্যের প্রথম রশ্মিপাত
যেইদিন ঘটেছিল,
আমিও পেয়েছি তার স্বাদ।
সেই হোতে
অনাদিকালের স্রোত বেয়ে
শাশ্বত আমির সত্তা
অসীম ভবিষ্যে চলে ধেয়ে।
সেই আমি বিশ্বের বিস্ময়
ভীতিরে করিয়া পরাজয়;
সর্বান্ত নিষ্ঠুর শক্তি
পেয়েছে আমার পরিচয়।
এ 'আমি' একক 'আমি' নহি—
সকল 'আমি'র বার্তা বহি
আনিয়াছি নূতন প্রভাত—
প্রতিটি একক 'আমি'
শিব, সুন্দরের সত্যে
পূর্ণ হয়ে হাসুক আঘাত।

সে আঘাত—
ধূলাতে লুটায়ে দেবে
উদ্ধত শক্তির অহংকার
ভেঙে যাবে দীর্ঘনিঃশ্বাসের কারাগার
তন্দ্রিতার ঘোর কেটে
খুলে যাবে জ্যোতিষ্কলোকের বন্ধ দ্বার।

আমার প্রাণের এই আশা
কত যুগ হতে বুকে বেঁধেছিল বাসা।
আজি এই হতাশ, বেদনভরা
রিক্ততার প্রান্তে,—
অশ্রুসিক্ত কথাগুচ্ছে মালাখানি গেঁথে
দিয়ে যাই নবীনের হাতে।
স্মৃতি নাহি চাই—
শুধু যেন শুনিবারে পাই,
নতুনের যাত্রাপথে
এক মন্ত্রে মিলেছে সবাই।

পুরুষোত্তমানন্দ-তত্ত্বকণা

কোন ব্যষ্টি স্ব-ই একাকী নিজের সত্তা চৈতন্য আনন্দ ও মুক্তি আস্বাদন করিতে পারিবে না। নিজের স্ব-কে সত্য সার্থকরূপে পাইবার তাগিদেই তাহাকে বিশ্বের সব স্ব-এর মাঝে মিলিয়া নিয়া জমিয়া উঠিতে হইবে। দুনিয়াকে লইয়া মুক্তির অভিযান চালাইতে হইবে।

সকলের সব স্ব-এর দাবীই সত্য।

সেই সত্য দাবীকে খোলা প্রাণে মানিয়া লইয়া তাহাকে কার্যান্বিত রূপ দিবার প্রয়াসই অহিংসা।

এই সত্য ও অহিংসা যেখানে যতটুকু সঙ্ঘবদ্ধতার মূল সূত্ররূপে স্বীকৃত হইবে, সেখানে ততটুকুই আত্মতৃপ্তি পরাণ পাওয়া যাইবে।

যাহা একান্তভাবে পাওয়া, এক দলকে দাবাইয়া অন্য দলের পাওয়া, সে পাওয়ার সামনের দিক রুদ্ধ, static। কোন নিশ্চিত পাওয়াই এই সমগ্র বিশ্বে সম্ভবে না।...

পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কর্ম করিয়াও কোন্ কৌশলে সেই কর্মকে অপরিস্থিতির ক্ষেত্রে নৈষ্কর্ম্যে বা বিপ্লবে রূপায়িত করা যায়, ইহা দর্শনশাস্ত্রের মূলগত প্রশ্ন।

কর্মের অন্তর্নিহিত অর্থগাংশই নৈষ্কর্ম্য বা বিপ্লব।...বিশ্বরূপায়িত কর্মই একাধারে কর্ম ও বিপ্লব।... কর্মের বিশ্বরূপ সত্তাই বিপ্লব।

নিপীড়িতের বুকফাটা কান্নাকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে জমাট করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টার নামই বিপ্লব।

জনসাধারণের তথাই প্রত্যেকের ঘ-ঘর। চরকাই মানুষকে সর্বপ্রথম ঘরে ফিরিবার কথা শুনাইয়াছে। ইহাই তাহার প্রথম বিশ্বরূপতা। বিশ্বমানবের আত্মিনার ঐক্য আনিবার যন্ত্র হিসাবে চরকার দ্বিতীয় বিশ্বরূপতা।

সৃষ্টি করার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য না থাকিলে ফলের বেলায় সম হইতেই পারে না—এই মহা সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চরকার মধ্য দিয়া বিকেন্দ্রীকরণের শিক্ষা লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সৃষ্টি করিতে পারাই স্বরাজের মূল রহস্য,...চাই সৃষ্টি সম্বন্ধীয় সর্বক্ষেত্রে সমতার আস্বাদন ও ঐকমত্য হওয়া। সর্বক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের দিকেই যদি মনোবৃত্তি।

ঐক্য আনিতে (১) প্রয়োজনে সমান, (২) শ্রমে সমান ও (৩) ভোগের অধিকারে সমান হওয়া চাই।

নারী যদি প্রাণ-সাধনার ভিতর দিয়া অন্তরের সুপ্ত বিশ্বরূপ শক্তির উন্মেষের দ্বারা অহিংসভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে, তবেই শুধু নারীর সত্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সম্ভব।

পরস্পরের উপর পরস্পরের অধিকার মানিয়া লওয়াই তো অহিংসা। এর তাহা অধিকারের ফলে আসিয়াছে হিংসা ও শোষণ।

মানুষের অন্তরের সহজ বিশ্বরূপ মানুষটিকে জাগ্রত করিয়া তোলাই গান্ধীজীর সকল গঠনকর্মপদ্ধতির মূল রহস্য।

জীবন্ত যন্ত্রে ক্ষুদ্রতম অংশও স্বয়ংপূর্ণ।

গীতায় এই মাটির ধর্মই প্রচারিত, যাহার মধ্যে সব 'সত্ত্ব' উদ্ভিন্ন—ইহাই গীতার শক্তি। গীতার শক্তি এই ধরণীর বুকে লোকোত্তর সংগ্রহে।

পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কর্ম করিয়াও কোন্ কৌশলে সেই কর্মকে অপরিস্থিতির নৈষ্কর্ম্যে বা বিশ্বরূপে রূপায়িত করা যায়—ইহা দর্শনশাস্ত্রের মূলগত প্রশ্ন।

সমপ্রয়োজন ও সমভোগের ক্ষেত্রে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে। অন্নবস্ত্রে সকলেরই সমান প্রয়োজন, তাই সঙ্ঘবদ্ধতা আনিতে হইলে অন্নবস্ত্রে সমান প্রয়োজন ও সমান রসাস্বাদন আনিতে হইবে।

God ও nature ontologically অর্থাৎ তাদের existence-এ, সত্তাগতভাবে পৃথক নয়—value ও quality-তে পৃথক।

God ও nature পরস্পর পরস্পরের মধ্যে in and through প্রকাশিত—পরস্পর পরস্পরকে তাঁরা সৃষ্টি করে চলেছেন।

দুটো বস্তু—আলো অন্ধকার, God Nature—contradictory—পরস্পরবিরুদ্ধ—এটা আমরা আগে থেকে pre suppose করে নেই, তাই ঐ রকম দেখি।

পরস্পর বিপরীত বস্তু থাকতে পারে না এ বিষয়ে এ্যারিস্টটল ঠিকই বলেছেন—কিন্তু কথা হচ্ছে তালের শত্রু যেমন মন্দ নয়, তেমনি আলোর বিপরীত অন্ধকার নয়, কল্পনের বিপরীত অকল্পন নয়, নরের বিপরীত নারী নয় ইত্যাদি।

সঙ্করাচার্যেরও একটি synthesis আছে, কিন্তু তা subjective ; তা কারো বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে synthesis নয়, তা G. C. M-এর synthesis, সেখানে আমি নাই, তুমি নাই, জগৎ নাই। কিন্তু পুরুষোত্তম-দর্শনের synthesis objective—সেখানে সকলের বৈশিষ্ট্য রেখে synthesis, এটা L. C. M.-এর synthesis, এখানে সকলেই আছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (৫০)

—১৯৫৪—

নিত্যগোপাল, তুমি আমার 'অনন্য'—উপলব্ধি করতে দেও—'যোঽন্যাং আত্মনঃ সর্বং বেদ সর্বং তং পরাদাৎ' —'যে অন্যকে অন্যায় বলিয়া সর্বকে দেখে, সর্ব তাহাকে পরাস্ত করে'। তোমাকে 'অন্য' বলিয়া দেখিলে ও আমাকে 'অন্য' বলিয়া দেখিলে তুমি আমি দুই-ই দুইকে পরাস্ত করিব। তাই না গৌরতনে কখনও 'কৃষ্ণ' বলিয়া, কখনও বা 'রাধা' বলিয়া কাঁদিয়াছ। 'আপনার লাগি আপনি কাঁদে' গৌ। আপন-হারা হয়ে রাধা কৃষ্ণের 'অ', কৃষ্ণ রাধার 'অ' দুই এক অনন্য—ইহারা এক বা দুই কিছুই নয়, আবার একও বটেন, দুইও বটেন। আমি বিশ্বকে অন্যত্র দেখিব না। আমি বিশ্বরূপ, বিশ্বনাগরিক হইব। তোমাকে বুকের মধ্যে পাইয়া আমি সব পাইব। তোমার জন্য যদি আমার সব যায়, তবুও তোমাকে লইয়াই সব হারাইব। তোমার জন্যই আমাকে সকলে ছাড়িয়া যায়, আমার অপরাধ আমি সত্যকে ভালবাসি, তোমার জগন্নাথ-রূপকে ভালবাসি। কুমার ব্যাঙ্ক, জগদীশ প্রেস, প্রিন্টিং পাবলিসিটি, খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানে যায়। ...রেণু সন্ধ্যার পূর্বে লেক মার্কেটে যাইয়া বাজার করিয়া আনে। উজ্জ্বল ভারত বৈশাখ সংখ্যা আসে ছটার মধ্যে। রেণু ও কুমার ব্যাপার লাগায়, ৩টায় কুমার পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। রেণুর শরীর ভাল থাকিলে সে নরনারায়ণ আশ্রমের পরিকল্পনার ৪০,০০০, টাকা সংগ্রহ করিতে পারিত বলিয়া বিশ্বাস করি। বিশ্বের সর্বত্র আমার ঘর। পৃথিবীটাকেই ভালবাসিয়াছিলাম। মানুষ লইয়া তাই টানাটানি করিলাম। আমার কোনও প্রয়োজনের জন্য নয়। মানুষ তাহার নিজের স্থানে স্থিত থাকিয়া নিজে পুরুষোত্তম-যোগাত্মার প্রতিষ্ঠিত হউক—ইহাই না চাহিয়াছি? কোনও অভিসন্ধি আমার নাই। মানুষের কল্যাণের কথা বলিবার জন্য মানুষের সঙ্গে আমার বিরোধ হইয়াছে। আমার প্রতি তাহাদের যে করণীয় ছিল তাহা না করার জন্য কোনও শাস্তি আমি দেই নাই। তাহাদের নিজের প্রতি তাহাদের যা করণীয় তাহা না করিবার জন্য মানুষের সঙ্গে তর্কণা করিয়াছি। কি বেদনা আমার! বেদনাই আমার চির সাথী। অতুল ২৫শে বৈশাখ পি এস ক্যাম্পে যাইবে। ২৯শে এপ্রিল।

কুরুক্ষেত্রে শিশু এক মুরলী বাজায়—শ্রীগৌরসুন্দর দেখিয়া ছিলেন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়ায়। ইহাই বিশ্বের সব চাইতে সত্য কথা। সর্বত্র এই মুরলীর গান ছড়াইয়া আছে। যে শোনে সে শোনে যাহার কান নাই সে শোনে না। যাহার চক্ষু আছে সে দেখে। দিবা নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, দেহস্মৃতিও নাই—উন্মাদ চলিয়াছে—কুরুক্ষেত্রে শিশু এক মুরলী বাজায়। কেন বাজায়? পাগল করিবার জন্য। সংসারের সকল আকর্ষণের মধ্যে সেই আকর্ষণই না জমিয়া উঠিতে চাহিয়াছে? বিশ্বের সবই তো বাঁশী বাজায়। কৃষ্ণের বাঁশী আজ সব বিধুর মধ্য দিয়া বাজিতেছে। শোন, শোন, কান দিয়া শোন। শ্রীগৌর আমার বিরহ-মূর্তি। তিনিই তো ৪৫০ বৎসর পরে আমার বুকের ধন নিত্যগোপাল। দিন নাই রাত্রি নাই চোখের জল আর সমাধি। সকল হৃদয়ে তোমাকে রাখিব। তোমার স্থান আমার বুকে-আমার বুক জুড়ানো ধন। ৮.. টার পর নীলু স্বপ্রকাশ আসে। রেণু লেকমার্কেট হইতে..আসে। কুমার বাটনা বাটে, কি আসে নাই। একটী সঙ্ঘের ভিতর প্রত্যেকে যদি অপরের ত্রুটির জন্য দায়ী মনে করে তবেই সেই সঙ্ঘ ভালভাবে চলে। রেণুকে ইহা ভালভাবে বলি। কিকে আজিকার ব্যাপারের কথা কেহ বলে নাই, সে ছুটি লইয়াছে—এই প্রসঙ্গে এই কথা

হয়। কুমারের দুই শালিকা ও পুত্র মোহন আসে। প্রায় ১২টায় প্রার্থনা করি—'আনন্দাৎ হি এব' ও 'সাপেক্ষত্বম্...' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের অন্তর্নিহিত ভাবের ধারার পার্থক্য আলোচনা করি। বর্তমান প্রাপ্তিবিধি অনুপনিষদিক আনন্দ হইতেই প্রতি ভূত রসধারা হইয়াছে—স্বর্গ নরক ঘুরিয়া মধু বাবি সংগ্রহ করিতেছে, বিশ্বময় তীর্থবারি সংগ্রহ করিতেছে পুরুষোত্তমের মহাস্নানের জন্য। তোমার স্বর্গ কোথায় নরক? প্রসাদ নিয়া দেবানন্দ আসে বীরেন ডাক্তার আসে। স্বপ্নার জন্য নীলুকে ১০৲ টাকা দেওয়া হয়। রান্না খুব সুস্বাদু হইয়াছে।...বিমলা আসে বড়ুরী লইয়া। পরিবর্তনা শুনানো হয় সে মাসিক ৫৲ টাকা দিবে বলিল। আমাদের খাওয়ার পর চিত্র আসে ... কুমার চিত্রয়া মজলসার বাড়ীখানি বাইবে স্থির করা হয়। বিমলা জিজ্ঞাসা করে কেন আমি সিনেমায় যাই না। আসল গৌরাঙ্গ যে দেহে, তাহার নকল গৌরাঙ্গ দেখার সাধ হয় না। কিছুদিন তো ঠাকুরের ঘটের সামনে প্রণাম করিতেই মন চাহিত না। যাঁহার সাক্ষাৎ চরণ এই মাথায় হৃদয়ে স্পর্শ করিয়াছি, তাঁহার ছবির সামনে মাথা নোয়াইতে বেদনা বোধ করি। ৩০শে এপ্রিল।

'নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যং মমেতি সমুপাসতে। তাভ্যঃ পরা ন মে পার্থ নিগূঢ়-প্রেমভাজনম্'। নিত্যগোপাল, আমি তোমার নিগূঢ়-প্রেমভাজন হইব, আমি ও আমার দেহপ্রাণমন তোমারই বলিয়া সম্যক্‌রূপে উপাসনা করিব। এইখানে আমি দেহবান হইয়াও বিদেহী হইব, 'শূন্য' হইব। শূন্য—+ —। শূন্যই তো সমন্বয়—plus minus-এর সমন্বয়। ইহাই প্রেম-প্রেমের সমন্বয়। জড় এই শূন্যেই অজড়ের সঙ্গে সমন্বিত। দেহ-আত্মা সমন্বিত। আমার দেহ প্রাণ তোমার হউক। আমার দেহই তো তোমার কাছে সম্যক্‌রূপে ন্যস্ত। ইহাই তো আমার সন্ন্যাস। আমার দেহ তোমার পরিচিত ধন। ইহার আমি আদর করিব। তোমাময় হইয়া আমি তোমার কাছে রহিব, তোমার সেবা করিব। আমির নির্বাণ হউক, লয় হউক।...রেণু ৪ টার পর সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নীরোদবাবুর ওখানে যায়। সুরেন্দ্রবাবু আবেদনে সহি দেন। আমার সম্বন্ধে রেণুর সঙ্গে তাহার কথা হয়। আমি ভাবিয়াই পাই না যে-প্রকৃতিকে পুরুষ এত ঘৃণা করে, পৃথক্‌রূপে পর্যন্ত যাহার স্বাধীনতা সে নিজে প্রস্তুত নয়—তাহাকে কেন সে ভোগ করিবে? ভজনা যাহার করিতে পারি না, তাহাকে ভোগ করা কি আত্মেন্দ্রিয়ের দিক হইতেও চলে? ব্রহ্ম যদি নিজ ব্রহ্মত্ব দিয়া পারমার্থিক ভাবে প্রকৃতিকে স্বীকার না করেন, তাঁহার কি ব্যবহারিকভাবে তাহাকে স্থান দেওয়ার মধ্যে কোনও শুচিতা থাকে? যে বস্তু স্বরূপেই অশুচি, তাহাকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা কোন্ শুচিতা? ব্রহ্মকে ব্যবহার করিলেই ব্রহ্মের মন যাচে। মায়া তাই রাধারূপে ব্রহ্মময়ী। এখানে প্রকৃতি ব্রহ্মের মত অনন্ত, সদা শুচি। রাধা তাই যোগমায়া। মায়ার ব্যবহারিক রূপ ও ব্রহ্মের পারমার্থিক রূপের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়া তাহা হইতে ব্রহ্মের মুক্ত হইবার এক অশুচি-সাধনায় প্রবর্তন করিয়া ঋষিনিকর কি অশুচির প্রশ্রয়ই না দিয়াছেন! বৃন্দাবন ইহার প্রকাণ্ড প্রতিবাদ। বৃন্দাবনই শুচির দেশ। এখানে ব্রহ্ম, মায়া, ব্রহ্মমায়ার সংযোগ সবই শুচি। আনন্দময় ব্রহ্ম প্রকৃতির স্তরের পর স্তর পরিপাক করিয়া অনন্তকাল চলিয়াছেন ও চলিবেন—ইহাই বৃন্দাবনের সাধনা। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ইহারই সার্থক আস্বাদন ব্রজধামে হইয়াছিল।...বৈকালে মণি বাগচী আসে...। ১লা মে।

নিত্যগোপাল, আমি তোমার 'ছায়া'—ইহাই আমার সার্থক পরিচয়। তোমার ছন্দ অনুবর্তন করিয়া চলিব, তোমার ঢং-এ কথা কহিব, ব্যবহার করিব, মেহপ্রাণমন দিয়া তোমাকেই প্রকট করিব তবেই না আমি সত্যকার আমি? আমাকে তো দেখাইয়াছিলে তুমি কৃষ্ণরূপে দাঁড়াইয়াছ—আর আমাকে রাধারূপে তোমার পাশে দাঁড় করাইয়াছ। রাধারাণীই আমার স্বরূপ, আমার সত্যকার আমি। তোমার চালচলন আমার হউক ছায়া যেমন কায়ার অনুযায়ী সং কিছু ব্যবহার করে। তোমার জীবনে জীবন গলাইয়া দিয়া তোমার কাছে রহিব। আমি শূন্য হইয়া তোমাকে জড়াইয়া রহিব। সকল হৃদয় জুড়িয়া

তোমার আসন পাতিব—ইহাই আমার বাসনা। আমি অপৃথক হইয়া থাকিব। কুমার ৪টার পর বিশ্বভারতীতে যায়, ট্রামের টিকেট কেনে, বাসন্তী বাইডিং হইতে পরিবর্তনা আনে, পরে আবার নীরোদ বাবুর সঙ্গে দেখা করে। রেণু সকালে মঠে কিশোরীবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসে। ৪টার পর জগদীশ প্রেসে রবির বই ছাপাইতে মনকে আমার হাইটা দিতে, পরে নীরদবরণবাবুর কাছে ২৬৵- দিয়া আসিতে যায়।...মিত্তির জেদ লইয়া আমি বিপন্ন; এ স্থান ছাড়া তাহার তো কোন স্থান নাই। অথচ সে সকলের সঙ্গে নিজের পছন্দমত চলার জেদ লইয়া অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। আর তাহার জন্য দই কিনিয়া আনা হয়, সে বলে, ইহা বাড়াবাড়ি, আমি খাইব না। ইত্যাদি। ঠাকুর, তাহার সুবুদ্ধি দেও। আমার বাথার দিকে কি কাহারও দৃষ্টি নাই?...বাগুইআটি শুক্রবার সকাল ৮ টার মধ্যে পৌঁছিব ইহা নীরোদবাবুকে জানানো হইয়াছে। সেখানেই খাওয়া দাওয়া সারিব। বরা যে।

নিত্যগোপাল, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া, তোমার আদর স্নেহ, কাছে রাখিবার আকুল আগ্রহ জীবনের সামনে রাখিয়া আমি পথ চলিব, তোমার মনোমত চলিব, তোমার বাঞ্ছা পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমার সকল গতি-বিধি নিয়ন্ত্রিত করিব। তোমার মনের মত গড়িয়া উঠিব—ইহাই আমার পরা মুক্তি, পরা গতি, পরম সাধ, পরমা সিদ্ধি। তোমার ছন্দে আমার দেহ প্রাণ সব কিছু ভাবিত হইবে, পুষ্ট হইবে—ইহাই তো সারা জীবন চাহিয়াছি। তোমার সর্ব সম্বন্ধ আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আমি সকল দুনিয়া হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি। আমি যে এ পথে একেবারে একা। তোমার আশ্রিতদের সঙ্গেও তো চলিতে পারিলাম না। কুমার ৬টায় বাগুইআটি যায়। সেখানে চিনু, বাচ্চু ও রুনু আসে। মাঠটা কণ্টকমুক্ত করা হয়। কুমার সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। নীরোদবাবুর ওখানেই উহারা যায়। রেণু ১টায় কুমারেশে যায়...১ বছরের বন্দোবস্ত কর্মে সই করিয়াছে। রাধারমণ ও রমণীবাবুর কাছে পরিবর্তনার জন্য কিছু চাহিয়াছেও। ফেরে ৬টায়। আমার বাম কোঁকে একটা নউরালজিক ব্যথায় বেশ কষ্ট পাই। Sp. ২০ বার বার খাই। একদিন সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া প্রতিজ্ঞা আদিয়াছিল। আমি তুলিয়া লইয়াছিলাম। মিনুকেও তুলিয়াছিলাম। আমার সংগতির দিকে চাহি নাই। কোনও দিন ভাবি নাই সেই হৃদয়ের উপর আমার শত শত আঘাত আসিয়াছে। পুত্র-কন্যাদেরও বুকে লইয়াছিলাম। আজ তাহারা সঙ্গে নাই। আমাকে তো চলিতে হইতেছেই সকল আমার চোখের জল, পথ, আঘাত ও ঠাকুর: অন্ধকারের মধ্যে একদিন ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইয়াছিলাম। তিনিই আমার অবলম্বন। যদি মানুষ একটু অনুগত হইত, তাহাদের কিছু সেবা করিতে পারিতাম। আজ সংসারের চিত্র দেখিয়া সংসারের মানুষ ভীত। আমি পুরুষোত্তমকে পাইয়াছি, আমি ভয় করি না। নিত্যগোপাল আমার ধ্রুব-তারা। তিনি আমার বুকে। আমি তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিয়া বিভীষিকা পার হইব, নূতন সৃষ্টির কূলে উঠিব। ওঁতা যে।

নিত্যগোপাল, তুমি সহজ। সহজ হইয়াই তোমাকে পাইতে হয়। কেননা তুমি সাধন-দুর্লভ তুমি ত্রিভঙ্গ, বঙ্কিম বলিয়াই তুমি সাধন-দুর্লভ। সাধনা করিলেই কলঙ্কিনী বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হয়, যে বুদ্ধি কোনও একটী ভঙ্গির আশ্রয় না নিলে দাঁড়ায় না। তুমি যে বঙ্কিম, বাঁকা। বঙ্কিম এই জগতে বুদ্ধির দৌড় কতদূর? বিষটা যে নিতান্তই complex। এত বড় বাঁকা এই বিশ্বে সাধন করিয়া কেহ পাইবে? তোমাকে 'সহজ' ভাবেই পাইয়াছি। পিতা দিয়াছিলেন সন্ন্যাস-দীক্ষা, একদিন বলিয়াছিলেন, 'বের হও আমার বাড়ী হইতে'। আর তুমি দিলে সংসার-দীক্ষা। তুমি বলিয়াছিলে, 'সংসারে যাও, কাজ আছে'। কি কাজ? তোমার ছাঁচে বিশ্ব গড়িয়া তুলিব—ইহা ছাড়া আমার আবার কি কাজ? তোমাকে পাইয়াছি। তোমার বিশ্বকে তোমার মত গড়িয়া তুলিয়া তোমাকেই বুকে জড়াইয়া ধরিব। রেণু রাজকরন যায়—প্রভুর সেবার সঙ্গে দেখা হয় না।... যাদবেন্দ্র পাঁজার ওখানে পরিবর্তনা রাখিয়া আসে।

কাল যাইতে বলিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ মোদক, তাঃ জে সি মুখার্জীর ওখানেও যায়। ধরেন দাশগুপ্ত তাহার দুঃখ নৈরাশ্যের কথা বলে, উজ্জ্বলতারতের টাকাও দিল না। মাখনবাবু আসে। বেণুকে বুদ্ধ শঙ্কর রবীন্দ্রনাথ মিলাইয়া কিছু লিখিতে বলে। কুমার ৯৭৫ টাকা আলীপুর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গিয়া নূতন declaration-এর সংবাদ নিয়া আসে। চিত্তাহরণ চাটার্জীর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য অতুল যায়। ...কুমার প্রেস ও প্রিন্টিংয়ের ব্লক দিতে যায়। মিনু আমার কথামত প্রাণপণ করিয়া চলিতে বলিল। আমাকে শান্তিতে রাখিলেই সে শান্তিতে থাকিবে। সেদাই বাবদ চামেলী বহুর ওখান হইতে মিনু ও নন্দরাণী টাকা নিয়া আসে। মিনু পায় ২৫৲। বীরেন বাবাজী আসেন। তিনি আভাসে বলেন, 'নিত্যগোপাল যদি ভগবান, তবে লোকে জানে না কেন? শঙ্করের মত উচ্চ স্তরে কেউ ওঠে নাই।' আমি বলি, বুদ্ধ তো পরিচিত, অথচ বুদ্ধ শঙ্করে কত তফাৎ! Either শঙ্কর or বুদ্ধ —অসম্ভব। দুই জনকেই থাকিতে হইবে। কে মিলাইবে নিত্যগোপাল ছাড়া? One world কাহার দর্শন দ্বারা সম্ভব? সেবানন্দ সন্ধ্যায় আসিয়াছিল। তাহাকে কাল রাত্রি ৯টায় এখানে আসিয়া থাকিতে বলি। ওঠা যে।

ঠাকুর, সব বড়রাই তৎকালীন পরিচিত বড়দের দ্বারা পরিচিত হইয়াছেন। তুমি তাহার ব্যতিক্রম। তুমি আসিয়াছ পণ্ডিত-অপণ্ডিতের, কুলীন-অকুলীনের, ধনী-দরিদ্রের ভিতরকার শক্ত ব্যবধান ঘুচাইয়া এক সমান স্তরে সকলকে দাঁড় করাইয়া একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে। তাই তুমি পণ্ডিত-কুলীন-ধনী শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া আস নাই। তুমি গণতন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ। তোমার শিষ্য নাই শঙ্করের শিষ্যের মত। তবুও তুমি ভগবান। এবারকার ভগবানের ইহাই যোগ্যতা। জনগণের যিনি দেবতা তাহাকে এমনি একাই আসিতে হয়। তুমি সর্বক্ষেত্রে মধ্যস্থ লোপ করিতে আসিয়াছ। তাই তুমি সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, গুরু, ধনী, পণ্ডিত, কুলীনের আচরণ হইতে দূরে ছিলে। তাই তুমি এত অপরিচিত। সর্ব পরিচিত হইবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই তুমি এত অপরিচিত। তুমি সর্ব ভূতাধিবাস বলিয়া এত অপরিচিত। তোমার জয় হউক রেণু রায়চক্রন গিয়া প্রফুল্ল সেন ও যাদবেন্দ্র পাঁজার সই আনে। প্রিয়রঞ্জন রায় ৫০৲ টাকা দিলেন। কুমার কেরে নীলুর ওখানে যায়, নীরোদ বাবুর ওখানে হইয়া আসে ওখানের জন্য ও সের বাতাসা, ফুলের মালা, (নীরোদবাবুর রাধাগোবিন্দ ও নিত্যগোপালের জন্য) সন্দেশ কেনা হয়। ২ দিন আগে বড় বৌ এখানে আসিয়াছিল তাহাকে বাগুইআটী যাইবার কথা বলিয়া দিয়াছি। সন্ধ্যার পর নীলরতনবাবু আসেন। তাহাকে পরিকল্পনা দেই। অতুল মুখার্জী আসেন সন্ধ্যার পর। তাহাকে বলি—"আগে কাজ, পরে টাকা" —ইহা আমার সারাজীবন চলিয়াছে সেবানন্দ ৯৲ টার পর আসে। সুধাংশু বৈকালে আসিয়াছিল। সে যাইতে পারে বলিল। কুসুমের ৫।৭ দিন হইতে জ্বর—এই খবরটুকু মাত্র দিয়াছে। ইহাদের বুদ্ধিতে আশাহত হইতেছি। এই যে।

নরনারায়ণ নিত্যগোপাল, তোমাকে বুকে লইয়া পথ চলিয়াছি তোমার কৃষ্টি, পুরুষোত্তম-কৃষ্টিকে ধরার বুকে রূপায়িত করিবার জন্য। বলরাম গিয়াছিলাম, হয় নাই। আজ বাগুইআটি যাইতেছি তোমার 'অখণ্ড সমাধান' জীবনের ছাঁচে বিশ্বের সকল দ্বন্দ্বের সমাধান করিব। নরনারায়ণ আশ্রম পুরুষোত্তম-কৃষ্টির কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমিই নবীন বুদ্ধ, নবীন শঙ্কর। আচার্য শঙ্কর এই বৈশাখের শুক্লা পঞ্চমীতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ দিলেন ক্ষণের আস্বাদন, শঙ্কর দিলেন ক্ষণাতীতের তাবুকতা। তুমি দুইয়ের অখণ্ডমাস। নরনারায়ণ আশ্রম তাহারই বাহক ও বাহক। পরিকল্পনা তোমার স্পর্শে সার্থক হউক। যাহারা এই আশ্রমের সহিত একদিন যুক্ত ছিলেন, আজ সেই স্পর্শকে 'বর্তমান' অনুভব করিয়া যাত্রা করিব। সকল অতীত আমার বর্তমান হউক। ৬।০টায় রওনা হইয়া আমি, উদাসিনী, সুধাংশু, প্রতিভা, রেণু, মিনু সোপা যোগে যাই, পরে ট্যাক্সীতে ৮টার অনেক পূর্বে বাগুইআটি পৌঁছাই। কুমার সেবানন্দ ও অতুল ৬'৪৫-এর গাড়ীতে যায়। দক্ষিণেশ্বর হইতে চিনু, পাঞ্চু,

নীলু, পরিমল, বাচ্চু, সুব্রত ও রেণু আসে। আমাদের জন্যে পরিষ্কার করিয়া চায়ের জল চাপানো হয়। দক্ষিণা-বাবুর এ্যাপেনডিসাইটিসের জন্য তাঁহার ওখানে যাই। আমাদের মেয়েরাই রান্না করে। সন্ধ্যার পূর্বে জলধর চট্টোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ প্রামাণিক আসেন পুরুষোত্তম কৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। 'The old physics has showed', 'It is as true to say' ইত্যাদি আলোচনা হয়। ভারতবর্ষে balance হারাইবে না। পাশ্চাত্য-দর্শন প্রভৃতিতে, নারী-স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিলেও 'ঘরসংসারের' প্রভাবকে পুরুষোত্তমকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। গল্প সভা আরম্ভ হয় সুবোধ মুখার্জী আসে। প্রথমে নীলু, 'তুমি মধু' গান করে। পরে হরেকৃষ্ণবাবু রেণুর লেখা আমার পরিচয় ও অভিনন্দন গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে পাঠ করেন। সভাপতি হন তুলতি সেন। রেণু পরিকল্পনা পাঠ করে। জলধরবাবুও কিছু বলেন। আমি বলি, জীব যেমন স্বরূপতঃ ব্রহ্ম (fact), এই বিশ্বও তেমনি স্বরূপতঃ ব্রহ্মধাম। fact-কে task-এ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ব্রহ্মধাম গড়িয়া তুলিবার জন্য পথে বাহির হইয়াছি। ব্রহ্মধাম হইল শোষণ-মুক্ত সমাজ। নর-নারী, জীব-ঈশ্বর, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, মাটি-আকাশ—সর্বত্র চলিবে স্বাধীনে স্বাধীনে প্রীতি। তোমাকে স্বনির্ভরতায় প্রতিষ্ঠিত না করিয়া তোষণ করা নোংরামি হরির লুট দেওয়া হয় কীর্তনের শেষে।...ওই যে

ঠাকুর, এই বিশ্বের প্রতিটী অণু একমেবাদ্বিতীয়ম্, স্বয়ম্পূর্ণ স্বরাট্। স্বরাট অনন্ত অণু জীবকে তুমি তোমার প্রাণের মধ্যে এক করিতে, সঙ্ঘরূপে গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছ। শোষণের মধ্যে সব বিশ্ব আজ প্রলয়-পয়োধি জলে নিমগ্ন। তুমি এই পারাবার পাড়ি দিবার মন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছ। 'তরঙ্গের সাথে লড়ি বাহিয়া চলিতে হবে তরী।' প্রাণের আধারে সঙ্ঘ গড়িব। সকল উচ্চ নীচ, সকল শোষক-শোষিতকে সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সঙ্ঘ গড়িতে তুমি আসিয়াছ। রাধাই সঙ্ঘমূর্তি, কায়ব্যূহরূপিণী। তুমি শ্রীরাধা, আমার প্রাণদেবতা, আমার বাঁচিবার মন্ত্র শ্রীরাধা। মাখনবাবু আসে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে রেণুর লিখিত প্রবন্ধটী নিয়া যায়। এখানে যাহারা থাকে, তাহারা বাহিরে গেলে লোকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করে —ইহা মানুষের এক খারাপ রিপু ব্যাধি। আজ আলোচনা হইল—প্রত্যেকের একটী মাত্র পরিচয় 'আমি আশ্রমবাসী'। আমার পরিচয়েই তাহাদের পরিচয়। গোত্র তাহাদের নিত্যগোপাল। বহু দেশের, সমাজের বহু স্তরের লোক এখানে আছে ও আসিবে। তাহাদের কুলের পরিচয় নিয়া মানুষকে মাথা খাটাইতে দেওয়া হইবে না। 'আমরা আশ্রমবাসী'—বস্ এই পর্যন্ত। মানুষের প্রশ্নের মাথামুণ্ড কিছু নাই। গ্রামাবার্তা লইয়া থাকিতেই তাহারা চায়। যেখানে যাইব, পুরুষোত্তমের কথার অবতারণা করিতে হইবে। পুরুষোত্তম-গত জীবন লইয়া মানুষের মধ্যে চলিতে ফিরিতে হইবে। বাগইহাটী একটি গ্রাম। গ্রামের প্রকৃতিক আবহাওয়া ভাল। কিন্তু মানসিক আবহাওয়া দলাদলিতে, পরশ্রীকাতরতা ঘটনে বিষাক্ত। ইহার মধ্যে থাকিতে হইবে। সব সময় আত্মস্থ হইয়া বাহিরের লোকদের সঙ্গে অযথা মেলামেশা না করিয়া তাহাদের সমস্যার মধ্যে জড়াইয়া না পড়িয়া, আমাদের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ কথা হইলেও বাদ প্রতিবাদের মধ্যে দিয়া জড়াইয়া না পড়িয়া, জীবন সফল করিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। মিথ্যা অপবাদ দিনেই তাহা মানুষ নেয় না, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও censorship আছে। সৎ কর্মীর পক্ষে মিথ্যা অপবাদ দুই দিনেই ভঙ্গ হয়। বড়রা আগাইয়া গিয়া সকলের সব আলোচনার সমাধি করিয়াছেন। শুধু পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম। যমুনা মধ্যের অংশ নিবে না ...রেণুর কাছে কুমারের মা চিঠি দিয়াছে। ...ওই যে

নিত্যগোপাল, 'সমগ্র' আমার, আমি তোমার 'I am a cosmopolitan' বাণীর মূর্ত বিগ্রহ হইব। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম ইব ভবতি'—সমগ্রের বেত্তা হইয়া আমি সমগ্রের মত হইব। তোমার 'সর্বতঃ পাণিপাদম্' রূপের ভজনা করিব। তোমার 'পাদপদ্ম' সমভাবে দেবালয়ে ও বেশ্যালয়ে স্থান পাইয়াছে, সীতার বুকে ও শবরীর বুকে সমাদর লাভ করিয়াছে। তুমি সমগ্র, তুমি বিশ্বনাগরিক। আমি আত্মবাদী অনাত্মবাদীকে বুকের মধ্যে পুরিয়া চলিব। 'অয়ে

নয় সুখধা রায়ে অন্যান্। যুযোধি অস্মৎ যুযোধ্যস্মৎ।'—ছোট মনে করার পাপ হইতে মুক্ত কর, সকলের সুখদুঃখ, সকলের সমস্যাকে নিজ মনে করিয়া সাগ্রহ মৈত্রীর ভূতলে দলিব। আমি আর্য অনার্য আদিবাসী হইব। 'অহং ব্রহ্ম অস্মি', 'শিবনামরিকোঽহম্'। ওরে ছেলে দেবু আসে ...। বেলুনা ২ টার পর যায়, বেণু ৪টার পূর্বে প্রথমে সন্তোষ মোদক, পরে প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে হরিদাস ভট্টাচার্যকে দেখিয়া অন্যাদের বাসায় যায়। সন্তোষ মোদকের সঙ্গে বেণুর একটা কথা হয়। তখনই চলিয়া আসে। আমি ও কুমার ৬টার পর যাই। আমাকে ৯টার পর পাঁচু দিয়া যায়। কুমার আসে প্রায় ১১টায়। ওরার কার হালকা হওয়ায় আমিও হালকা মনে করিতেছি। সকলের সব সমস্যাতেই তো নিজ মাথায় বহিতে চাহিয়াছিলাম। মানুষকে চাহিলে বা পাইতে হইলে সমস্যাগুলিই পাইতে হয়। কিন্তু মানুষ এত নির্বোধ, সে কি অন্যকে তাহার সমস্যার ভার বহিতে দেয়? বর্তমান সমাজে কে একা নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের সমস্যার ভার বহিতে সক্ষম? আজ প্রত্যেকের সমস্যাকে একটী সঙ্ঘের কাছে দেখিয়া দিতে হইবে, তাহারা যাহা করিবে। প্রত্যেকের সঙ্গে identified হইয়া প্রত্যেককে চাহিতেছি। আউটাইয়া যাই নাই। আমি জানি কেমন করিয়া আসক্তি অনাসক্তির ভাবে ভাবিত হয়। সকলের সঙ্গে একাত্ম হইয়াই আমি চলিয়াছি। ভজনা না করিয়া কে কাহাকে ভোগ করিবে? প্রত্যেকের স্তরে দাঁড়াইয়াই প্রত্যেককে বুঝিতে ও পাইতে সারা জীবন চাহিয়াছি। বেদনা আমার বুকে প্রচুর। বাহিরে দাঁড়াইয়া চাহিলে কে কাহাকে পাইবে? যাহাকে চাহিব, তাহাকে দিয়াই তাহাকে পাইব—ইহাই আমার জীবন-সাধনা। আমার প্রাণ লইয়া আমি আজ একা। দুপুরে বেণু রান্না করে। ৮ই মে।

ঠাকুর, তুমি হইয়া আমি তোমাকে চাহিব, পাইব, আস্বাদন করিব। তোমার 'অন্য' হইয়া তোমাকে চাওয়ার বা পাওয়ার মূল্য কতটুকু? আমি 'অনন্য' হইব, তোমার আমার ব্যবধান অব্যবধান ঘুচাইয়া অর্থাৎ প্রাণের স্তরে উঠিয়া আমি প্রাণের ধারা বাহিয়া চলিব। প্রাণ-দর্শনকে জীবনে মূর্ত করিয়া 'উত্তর সাধকে' ছড়াইয়া দিব, সব মতা বৈত্র বাঁচিয়া উঠিবে নূতন প্রেরণা লইয়া। প্রাণের পূজারী আমি প্রাণ চির পুরাতন হইয়াও চির নবীন, সে ধীরে ধীরে বিশ্ব প্রকৃতির বুক চুরিয়া আপনার মধ্যে আপনি পুষ্ট। আমার সম্বল শুধু এই প্রাণ মানুষের সকল সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করিয়া সকলকে পাইবার জন্য কি না প্রাণপণ করিতে চাহিয়াছি!—ইহাই আমার সাধা জীবনের সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাস। উজ্জয়ন্তাকারের জন্য 'ভারতীয় পদ্ধতি' প্রবন্ধ লিখি। কুমার অসুস্থ। প্রায় ৩ মাস থাকিয়া অতুল আজ দুর্বলতা কাটাইয়া চলিয়া গেল। কেহই এবার সমস্যার মূল সমাধান করিতে পারিবে না। অন্যের সমস্যার সঙ্গে নিজের সমস্যা গুলাইয়া না ফেলিয়া। কিন্তু মানুষ 'মাহে-ফিতে আলাদা মজলবাহ' করিতে চায়। এত অল্প-বুদ্ধি লইয়া সংসার চলে না। যদি প্রত্যেকে অন্ধ হইত, ধনিক-শ্রমিক, নর-নারী, ভক্ত-অভক্ত অন্ধ হইত, তবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের যোগ ও ক্ষেম বহন করিত—'যোগক্ষেম বহাম্যহম্'—সেখানে অনন্যতা, পর্যুপাসনা ও নিত্যাভিযুক্ততা সেখানেই যোগক্ষেম উপস্থিত—ইহা ভগবানের সঙ্গেই হউক বা এই পৃথিবীর কোনও বস্তুর সঙ্গে হউক 'অন্যোঽসৌ অন্যোঽহমস্মি'—এই বুদ্ধি কোন যোগক্ষেম বহন করে না।—৯ই মে

নিতাইগোপাল, চিরসাথী আমার, কত মানুষ আসিল, কত ঘটনা ঘটিল, সবই চলিয়া গিয়াছে, যে যাহার 'দান' রাখিয়া গিয়াছে! তুমি সব পরিবাহকে, সব পরিবর্তনকে নিংড়াইয়া অপরিণামী আজিও আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ। তুমি আছ সকলের প্রতীক্ষায়—তোমার প্রাণের উপর সকলেই হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে। তবুও তুমি আছ। 'কেবে-হিলাম ঘুরে সরে গেছ বুঝি, দেখি এক পা-ও সরে যাও নি'। আমাকে তোমার মত স্বচ্ছ, স্বচ্ছ করিয়া লও। ভালবাসিয়াছ, আর কোন কথা নাই, ভালবাসিয়াই চলিয়াছ। আমি স্বচ্ছ হইব, স্বচ্ছ হইব, তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিব, তোমার ইচ্ছার মূর্ত বিগ্রহ হইব। তোমাকে ধরার বুকে ছড়াইয়া দিব। বেণু সকালে প্রেসে গিয়া রসিদ বই ও খানা আনে, বিমলার ওখানে হইয়া আসে। ২টার পর

সুবোধবাবু, আইডিয়েল এ্যাডভারটাইজিং, অমিয়বাবু, ষ্টাণ্ডার্ড ফটো, মুখার্জি হইয়া ৭টার পর ফেরে। ৫টার পর ভরা আসে, ২৲ টাকা আমার সেবার জন্য দেয়। গত রবিবার তাহাদের ওখানে বসিয়া কর্মের রহস্য সম্বন্ধে কথা হয়। 'ক্রিয়মানং খলু যৎ কর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি। সুকরৈঃ কৈশ্চ তস্যৈব কর্তুঃ কর্মকর্তেতি হি স্থিতিঃ' কর্তার স্বরূপ দ্বারা ক্রিয়মান কর্ম যখন স্বয়ংসিদ্ধ হয়, তখন তাহা কর্ম হইয়াও কর্তা। কর্তা যদি নিরভিমান সমর্পণযোগে যুক্ত হয়, তখন তাহার জীবনে স্বরূপ অর্থাৎ পুরুষোত্তমরূপ অবতরণ করে। তখন কর্ম কর্তার মত নিজের গতিতে, নিজের impetus-এ নিজে চলে, তখন কর্ম সহজ হয়, কর্ম আর বন্ধন হয় না, ভারী হয় না। ঠেলাঠেলি করিয়া, একটা 'ব্যাপার' করিয়া তোলও বড় কর্ম হয় না। প্রাণ যেমন নারের শরীর হইতে পুষ্টিসাধনের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করে, প্রাণধনের কর্মও সেইরূপ বিশ্বপ্রকৃতি হইতে রস আহরণ করে। বাগুইআটি দক্ষিণাবাবুকে ··চিঠি দেওয়া হয়। আদিপুর হইয়া কুমার নূতন declaration-এর জন্য ডেমি ৫ খানা কিনিয়া আনে। হরিধার তোলাগিরির আশ্রমের প্রাপ্য কুমার ২৫৲ টাকা আজ পাঠাইয়া দেয়। রেণুর তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের দারিদ্র নিয়াছি, দারিদ্র পূরণ করিবার জন্য শক্তি দেও, ইহাদিগকেও যোগ্য করিয়া দাও। ইহাদের দিয়াই তো ইহাদের দারিদ্র তার বহন করিব। না হইলে দারিদ্র যে বোঝা হয়। ১০ই মে

নিত্যগোপাল, তুমি যাহাকে বরণ কর, সে-ই তোমাকে লাভ করে, তুমি তাহাকে তোমার যা শুভ প্রদান কর। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্'। তুমি আমাকে চাহিয়াছ, আমি তোমাকে কি সর্বতোভাবে পাইব না? তোমার যা শরীরী শুভ, মানসী শুভ কি আমাকে দিবে না? এই সেদিনও বাগুইআটিতে কোন বৃদ্ধা তোমার ফটো দেখিয়া বলিয়াছিল, 'এই বুঝি স্বামীজীর বয়সের কালের ছবি?' তোমার দর্শন ও জীবন বিশ্বের কাছে বহন করিয়া লইয়া যাইবার উপযোগী শুভ কি আমাকে প্রদান করিবে না? তোমার জীবনে জীবন লাভ না করিলে তোমাকে বহন করিব কি করিয়া? বিশ্ব-দরবারে তোমার পরিচয় করাইবার মত উপযোগী যা কিছু আমাকে দেও। তোমার কথা বলিবার জন্য যে আমার প্রাণ পাগল। কুমার বাহির হয় ১ টার পর, রেণু ২টার পর। হাইটার্স বিল্ডিং-এর মিঃ গুহ ৫৲ টাকা আশ্রমের পরিকল্পনার জন্য দিয়াছেন। কেহ কেহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। সতীশ চক্রবর্তী, ধীরেনবাবু (নবদ্বীপ), পূর্ণ বাগচী প্রভৃতির কাছে পরিকল্পনা পাঠানো হয়। রেণু, কুমার ১০ টায় পরদিন হারের সঙ্গে দেখা করে। তিনি সই দেন। প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাইবার মত সময় আসিয়াছে। মিঠু কথামত চলিতে বলিতেছে। সে অনেক কিছু করিতে পারিত সে আমার ব্যক্তিগত সেবাটুকু করিয়া আমাকে সুস্থ রাখিতে পারিত। বাগুইআটিতে সে-ই আমার সমস্তের বন্দোবস্ত করিয়াছে সে-ই শীতকালে মুখ ধোবার জন্য গরম জল দেয়। এই ছোটখাট সেবার ভিতরই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। বলে, সারা জীবন নিজের ঝেল নিয়া চলিয়াছি। এখন বয়লাইতে কষ্ট হয়। সেলাই সংগ্রহ করিতে সে বাহির হয়।···মন ভাল থাকিলে শরীরও ভাল হইবে। আমি তো মানুষকে আদর করিতে চাই—মানুষ আমাকে ছাড়িয়া যায়। নিত্যগোপালের ভাণ্ডারে আদর স্নেহ মমতা কর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রতিষ্ঠা কিছুরই অভাব ছিল না। মানুষ নিবে না। আমি কি করিব? বৈকালে জ্যোতি প্রসাদ (দক্ষিণ গোবিন্দপুর) আসিয়াছিল। জগন্নাথ সাহা রবিবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে যোগদান করিতে বলিতে আসিয়াছিল। Responsive cooperation ছাড়া, প্রাণ ১ করিয়া না দিলে যাইব না বলিয়া দিয়াছি।··· ১১ই মে

নিত্যগোপাল, নরনারায়ণ আমার, তুমি আমার লাগিয়াই আসিয়াছিলে, আমার জীবনের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইলে, আমাকে আকর্ষণ করিয়া জীবনের সকল ফেল, সকল water tight সংস্কার গলাইয়া দিয়া পথে বাহির করিলে। আমার তো কিছু নাই—জাতি নাই, কুল নাই, আছ শুধু তুমি। বাহির হইলাম, বাহিরেও রহিলাম, কিন্তু বাহিরে তো তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলাম না।

বিশ্বমানবের যে বড় প্রয়োজন ছিল তোমাকে নিয়া। বিশ্বের সকল দরজা কে, সকল ক্ষেত্রকে স্পর্শ করিয়া তাহার সমাধান দর্শনে ও জীবনে তুমি রাখিয়া দিয়াছ। কিন্তু তোমাকে না চিনিলে তো বিশ্ব সে সমাধান পাইবে না। তাই তোমাময় হইয়া তোমাকে চিনাইব—ইহাই আমার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। আমার দেহমনপ্রাণ বুঝিয়া লও দয়াময়। রেণু সকালে প্রফুল্ল দেন, সন্ধ্যে ঘরে, অপর্ণা বসুর ওখানে যায়। অপর্ণা বসু পরিক্রমার জন্য ১০৲ টাকা দিয়াছে। প্রফুল্ল ২৪শে মে যাইতে বলিল... সন্তোষ বিষ্ণুই কোম্পানিতেও যায়। উভয়েই ফেরে ১২টায়, আর বাহির হয় না। বিশ্বনাথ মণ্ডল সকালে আসে। শান্তি সাহা আসিয়াছিল—জানাই সাহা প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর সাজীতে আগামী ২৪শে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় 'সন্তবামি যুগে যুগে' বিষয়ে বক্তৃতা দিতে বলে ... ১২ই মে

নিত্যগোপাল, আমার সকল ভালবাসা—ঘরের প্রতি ভালবাসা, স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রতি ভালবাসা, অন্যের প্রতি ভালবাসা, আদর্শের প্রতি ভালবাসা—তোমার প্রতি ধাবিত হউক; তেমনি তুমিই সকল ভালবাসার উৎসমূল, উৎস। সর্বার্থ আমার চিত্ত যখন যে অবস্থাতেই থাকুক, তোমার তাকে যেন সাড়া দেয়। আমার সকল বৃত্তি একতান হউক। তোমার বিশ্বে তুমি একতান হইয়া সব দিতেছ, হৃদয়ের মধ্য দিয়াই পাইতে চাহিতেছ। সকল দেওয়া পাওয়া সার্থক যখন বুক দিয়া দেওয়া ও পাওয়া হয়। অন্য অন্যকে দিতে পারে না, অন্য অন্যের কাছ হইতে নিতেও পারে না। আমার ভিক্ষার ঝুলি, অন্যের কাছ হইতে অন্য বুদ্ধিতে অপমান ভরা দান নিঃশেষ হউক। ভিক্ষায় সত্যিকার স্নেহ আদর কিছুই পাওয়া যায় না। আমাকে রিক্ত কর, শূন্য কর, তোমার গোপন দানে পূর্ণ কর। হৃদয়ের দান হয় গোপনে। তোমার দান সম্মানে ভরপুর। তুমিই সত্যিকার দানী। আমাকে তোমার বাঁশী করিয়া লও। তোমার গান আমার জীবনে বাজুক। আমার জীবন তোমার সঙ্গীতময় হউক। রেণু মন্মথবাবু, হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু, সেক্রেটারিয়েট, সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু, মনোরঞ্জন বসু প্রভৃতির সঙ্গে পরিক্রমা লইয়া দেখা করে। সকলেই বলে, 'এত টাকা বর্তমানে কি করিয়া আদায় হইবে'? তা জানি না। হিসাব করিয়া পথে নামি নাই। সবই পথের হিসাব করিবে। তবে নিজেদের কিছুত শৃঙ্খলা ও খুব পরিকল্পিত কার্যসূচী চাই। এখানে যাহারা থাকিবে বা আসিবে তাহাদের রীতিনীতি এখানের দর্শনের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। আমার ব্যাপক tour করার কথা ভাবিতেছি। একটা আন্দোলন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কণ্ঠ যে আমার আগের মত নাই। চাঁটু দুইটী দুর্বল। ও কথা বুঝি বলিতেও পারি না.... কুমার নীরোদবাবুর কাছে...জানাইয়া আসে। সে সকালেও একবার বাহির হয়।...১৩ই মে

নিত্যগোপাল, তুমি বড় অসময়ে আসিয়াছ এই ৭২ বৎসর বয়সে। কিংবা যখন তুমি আস তখনই 'সময়'। সকল কালই তোমার কাল—অনন্ত উৎসাহ আমার সকল বাধা ঠেলিয়া পরিপাক করিয়া তোমার পাদুকা শিরে বহন করিয়া আগাইতে দেও। আমার মদনমোহন, বিশ্বের সকল বিরুদ্ধ ধর্মের মাঝে, জড় ও অজড়ের, পুরুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক তোষণের মধ্যে তুমি দাঁড়াও। আমার ঘরে বাহিরে তুমি দাঁড়াও। জীবনের সকল বিরুদ্ধ বৃত্তি দিয়া—আসক্তি দিয়া অনাসক্তি দিয়া তোমার ভজনা করিব। 'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমার নবীন জীবন-ভোরে'। তুমিও নূতন আমিও নূতন। আমাদের এই নূতন মিলন নূতন করিয়া অভিযানের পথ প্রশস্ত করুক। আমি আগাইবই—ইহা আমার সঙ্কল্প। অসার হইয়া মরিতে চাই না। কুমার ১টার পর বাহির হইয়া হৃষীকেশ ব্যানার্জী, সুশিতবাবু প্রভৃতির ওখানে যায়। বৈকালে যায় চক্ষু দেখাইতে। বহুনা এক পত্র তাহার মায়ের কাছে দিয়াছে—সে উত্তর দিকের রাস্তার সামনের জায়গা চায় ...যাহা হউক, নীলুর আপত্তি না থাকিলে নীলুর জায়গাই তাহাকে দেওয়া হইবে।...পাবনা হইতে লক্ষ্মী রেণুর কাছে পত্র দিয়াছে। ...রেণুকে যীশুর সন্ধ্যার পর auto-vaccine ইনজেকশন দেয়। ১৪ই মে

নিত্যগোপাল, অনাগত বিশ্বের তুমিই ভিত্তি স্থাপন

করিয়া গেলে। তুমি অনাদি হইয়াও আদি; আর বিশ্বের সর্বত্র দুর্নীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে দুর্নীতির মূল রহিয়াছে ভড়ংভড় সম্প্রদায়ের, এবং এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি আলো বিপরীত হইতে আসিয়া যেখানে মিলিত হয় সেখানে হয় অন্ধকার। প্রাচ্য পাশ্চাত্য যেখানে যুক্ত সম্প্রদায় নিষ্ঠ, সেখান হইতে দুর্নীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তুমি রাখিয়া গেলে ভড়ংভড় সম্প্রদায়। বিশ্ব-জীবনের সমাধান তুমি ছাড়া আর কাহারও দেখি না ...ভড়ংভড় সম্প্রদায়ের মত বিরাট ব্যাপার এই বর্তমানে আর কি হইতে পারে? তুমি তোমার 'I am a cosmopolitan'-এর বজ্রনির্ঘোষে বিশ্বনাথীর কানে শুনাও তুমি আমার মুখ, বিশ্বজীবনের মুখ আজ মহানির্বাণ মঠে শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্রমহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মধ্যেন্দ্রপুরী প্রসঙ্গ পাঠ করিতেছেন। আমি পত্রিকার কাল দেখিয়াছি ... শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ছিলেন সারা জীবনব্যাপী যোদ্ধা—সত্যের জন্য, প্রেমের জন্য। তিনি ছিলেন যুগ-স্রষ্টা। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বকে ধরার বুকে বর্তমান যুগের মত করিয়া প্রকাশ করিতে তাঁহার দান কম নয়। তিনি না-মানিয়া মানিয়া ছিলেন। 'গোলে হরিবোল' দেওয়ার মানুষ বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন না। তিনি শ্যামসুন্দরকে বর্তমান যুগের কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া তবে নিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দরকে অনেক পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল বিজয়কৃষ্ণকে পাইবার জন্য। তিনি একদিন বিজয়কৃষ্ণকে চোখ ঠার দিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে মানি না'। না-মানিয়া মানার, না-মানা ও মানার মূর্ত দুইটি বিজয়কৃষ্ণ। তা. টার পর ভক্তিদর্পণ পাঠ হয়. কুমার জিতেশ রায় ও শৈলেন সেনের টাকা আনে সকালে বাহির হইয়া। আসার আনা স্বতন্ত্রভাবে আজ দুপুরে ঠাকুরের জন্য কি-ভাত রান্না হইয়াছিল। বড় বৌ অনেক-গুলি জামকল আনিয়াছিল। সকালে মাখনবাবু আসিয়াছিল। ১৫ই মে

নিত্যগোপাল, তুমি পূর্ণ আমি শূন্য নিবিবল্প নিবিবর্ত নিরঞ্জন। আমি-শূন্যের বুকে তুমি পূর্ণ। তোমার আমার অন্তর্নোটখুলের ফলে বিশ্ব জগৎ গড়িয়া উঠিবে, আমি মহৎ ব্রহ্মযোনি, তুমি বীজপ্রদ পিতা। তুমি আছ, আমি নাই। আমার না-থাকার বুকেই তোমার বীজপ্রদ সকল ধারা সার্থক সুন্দর আমার দেহপ্রাণমন সব বৃত্তিগুলিও আমাকে শূন্য করার পূর্ব তোমার মহাপ্রকাশকে বুকে ধরণ করিবার জন্য। আমার হৃদয়বিহারী নিত্য-গোপাল, বিশ্বের অন্তরতম প্রদেশে যে প্রাণধারা অতি গোপনে প্রবাহিত হইতেছে, সেই কৃষ্ণ-ভাবিনী আত্ম-নিবেদনময়ী রাধা-ধারারই মূর্ত প্রকাশ তুমি। তুমি আমার আমি তোমার, তুমি আমি আমি তুমি কুমার বাহির হয় হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ, স্টাওার্ড কটো ইত্যাদি খুরিয়া ও টায় ফেরে। রেণু সেনগুপ্ত প্রমোশান, এ মুখার্জী প্রভৃতি ঘুরিয়া ফেরে ৪টার পর। ...সভারত আসিয়াছিল। পরিকল্পনা দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণী: salt তৈয়ার করিতে কোথায় আটকাইয়া গিয়াছে: তাহার জন্য বলি, 'ধৃত্বো শরণমন্বিচ্ছ', 'যিনো যো ন প্রচোদয়েৎ', 'যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা' তাঁহার শরণ নিতে বলি। তাঁহার পায়ে মাথা কুটিয়া বুদ্ধি বাহির করিতে বলি। বীরেন ব্যানার্জী আসেন বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে কি বলিবেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন কিছু বলি। তাহার 'সীতাপরিচয়ে'-র সমালোচনার কথা বলি। তিনি বলেন, 'বস্য নাহংকৃতভাবঃ' ইত্যাদি শ্লোক contradiction পূর্ণ। যাহার অহংকৃত ভাব নাই সে হিংসাই করিতে পারে না। আমি বলি—দৈবী সম্পদের আনীত অহিংসা সত্য কি কৃষ্ণ-জীবনের অহিংসা সত্য?...নিজের লেখার বিরুদ্ধেই নিজে বলেন। সেবানন্দ আসে। রেণু সুবোধ সুধাংশুর স্থানে যায়। আগামী রবিবারের উত্তরপাড়ার বক্তৃতার বিষয় হইতেছে 'ভবিষ্যৎ ভারতের সমাজে নবীন দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়'। সভাপতি অমরবাবু, তাঁহার বাড়ীতেই হইবে। মায়া (অমার বোন) তাহার পুত্রের মারফত উদ্বোধন-ভারতের ৪, টাকা+২, টাকা ও কিছু বড়ি আম ইত্যাদি পাঠায়। সুধাংশু এখনও আসে বৈকালে। ১৬ই মে

নিত্যগোপাল, তুমি যে-পথ আমার সামনে খুলিয়া রাখিয়াছ, তাহা সৃষ্টির পথ, তপস্যার পথ, অনন্ত বাধা ঠেলিয়া বা পরিপাক করিয়া চলার পথ ; অসীম ধৈর্য, অনন্ত বল ও বীর্যের পথ তুমি শুনাইয়া গিয়াছ, 'শরৎ, ধৈর্য ধর'। ধৈর্য ধরিয়াই তো চলিয়াছি। আরামের পথ যে এ নয় তা মানি, তবুও আর যেন পারি না 'ধীরং মনি নিধি'। একটী নূতন মতবাদ, নূতন সৃষ্টির নূতন দর্শন একটী ধ্বংসোন্মুখ বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়া বলা কি যে সে বীর্যের পরিচায়ক ? তুমি সেই বীর্য আমায় দেও। আমি তোমাকে বিশ্বমানবের ঘরে পৌঁছাইব। সেই ভাষা সেই ওজঃ আমাকে দেও। তোমার মুখের দিকে চাহিলে আমার সকল অবসাদ কাটিয়া যায়। নূতন বলে বলীয়ান হইয়া আবার পাগলের মত ছুটিতে ইচ্ছা হয়। কুমার সকালে জ্যোৎস্না বোসের কাছ হইতে ৪৲ টাকা নিয়া আসে। রেণু বৈকালে প্রেসে গিয়া Ist form-এর order দিয়া আসে। কুমার ওটার পর জেনারেল হিস্টার্স-এ ঠাকুরের ব্রতের জন্য, হীরালাল ঘরের কাছে চাঁদার জন্য ও সন্তোষ করের দোকানে যায়। ...পরিজনকর আসে—৪৲ টাকা দেয়। তাহাকে পরিবর্তনা দেওয়া হয়। ধীরেন রেণুকে ইনজেকশন (auto vaccine) দেয়। নিত্য ঘরে বসিয়াই কিছু কিছু order পায়। আজ বৈকালে কোন কোন বাড়ী গিয়াছিল order-এর জন্য। এখানে অনুগত হইয়া পড়িয়া থাকিলে সব সুযোগই মিলিবে। শুইয়া পড়িয়া সমুদ্রের ঢেউকে সামলাইতে হয়। ভগবৎ-শরণাগত হইয়াই প্রকৃতির এই তরঙ্গকে face করিতে হয়। অহঙ্কারীর অহঙ্কারের জোর কতটুকু ? রাত টা থাকা সামাল দেওয়াই দুষ্কর। ১৭ই মে

নিত্যগোপাল, আমার হৃদয়ের রাজা, 'এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে'। তুমি আমারই লাগিয়া আসিয়াছিলে। চিত্তের সকল স্তর সকল বৃত্তিকে স্পর্শ করিয়া আমাকে পূর্ণ করিয়া তুমি আসিয়াছ। আমি তোমাকে পাইয়া তৃপ্ত। আমি তোমারই সঙ্গে তোমার শ্রীচরণ অনুসরণ করিয়া বিশ্ব-পরিক্রমায় বাহির হইয়াছি। বিশ্ব আমার ঘর, সব দেশ আমারই দেশ, সব জাতি আমারই জাতি, সব মতবাদ আমারই মতবাদ। ওগো নিত্যধন, বিশ্বনাগরিক, তোমার মত আমাকে করিয়া লও। তোমার বিশ্ব রূপই আমার বৃন্দাবনমোহন রূপ বিশ্ববৃন্দে তোমার এই রূপেরই প্রতিষ্ঠা করিব—ইহাই আমার জীবন-পণ।... নীলু আসে ২টায়, তাহার স্নান সম্বন্ধে কোনও হাঙ্গামাই নাই। কাজে ধাক্কিলেই তাহার হইল ...তিন দল ব্রতপোষী—কুমারী, সন্তানবতী বিবাহিতা ও সন্তান-হীনা বিবাহিতা—ইরুকের স্থানে 'আওসু'—বাসিলেন। এই আশা হইল যেন নিজের স্থানে আসা। সকল টান যেখানে পরিসমাপ্ত হয়, সার্থক হয়, তিনিই তো গুরু, তিনিই তো ভগবান। যখন সব তুলিয়া অনন্যসাধক হয়, তখনই ভগবান সেই সবের ভার নেন,—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। স্বামী-পুত্রের প্রতি যে টান সেই টান দিয়া ভগবান ভজনা করিলে ভগবান স্বামীপুত্রের ভার নিজ হাতে নেন কোন্ টানে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের চাকুরী ছাড়িয়াছিলাম ? যাহার পিছনে এটী প্রাণী খাওয়ার জন্য নির্ভরশীল, তাহার কি 'আশিয়া' ছাড়িয়া যেওয়া চলে ? কোন্ টানে বৃন্দাবন গিয়াছিলাম ? তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলাম বলিয়াই ছেলেদের ভরাডুবি হয় নাই না হইলে যে ভাবে নামিয়াছিলাম তাহাতে ইহাদের অন্ন বস্ত্রের জন্যও কষ্ট পাইতে হইত। ঠাকুর ইহাদের ভার আমার পক্ষ হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে আর ইহারা ছাড়ী করিতে পারিবে না। নীলুকে ১ শিশি স্পেসিফিক ১ দেওয়া হয়। শিশুদের পেটের অসুখ। ১৮ই মে

নিত্যগোপাল, আমার দেহের প্রতি টান, আত্মার আকর্ষণ সবকই তোমার প্রতি ধাবিত হউক, আমার দেহাত্মবোধ ও অধ্যাত্মবোধ তোমার জীবনে সম্মিলিত হউক। তুমি ডাক, ডাকের বিরাম নাই, তুমি টান, টানারও বিরাম নাই। কিছুতেই চিত্ত কোনও পরিচ্ছিন্নতার মধ্যে আটকাইয়া থাকিতে চায় না। তোমার ডাকে ও টানে মন আমার কেমন করে, আনচান করে। সকল অবস্থার মধ্যে আমি তোমাকে পাই, তুমি আমাকে

পাইবে। আমার সকল সুন্দর, সকল অসুন্দর, সকল সাত্ত্বিক, সকল রাজসিক, সকল তামস তোমার গানে শান্তির হউক, ছন্দে গড়িয়া উঠুক। ভিক্ষা তরা আমার এই থালি তোমার নির্মল আনন্দধারাপূর্ণ দানে পূর্ণ হইয়া উঠুক। তুমি আমার আমি তোমার। ... সুধার সকালে ও বিকালে বাহির হয়...গ্রাহকের ১২৲ টাকা আনে রেণু, সুমারেশ, সুবোধবাবু, রাইটার্স বিল্ডিং প্রভৃতি স্থানে যায়। দুই রকমের সাধনা আছে—(১) প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া, (২) প্রবৃত্তির উপর চাপ না দিয়া তাহাকে নিবৃত্তির সঙ্গে সমন্বিত করিয়া। দ্বিতীয়োক্ত সাধনা ব্রজগোপীদের চলিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া। এই সাধনায় এমন একজন মানুষের প্রয়োজন যাহার সঙ্গে সকল মনোবৃত্তি দিয়া তাহার মনোবৃত্তি মেশানো যায়। এখানে সাধনার 'মন লইয়া ঘুরে ঘুরে' থাকার কোনও মূল্যই নাই। নিজের মধ্যে নিজে কিংবা নিজেকে লইয়া নিজে যাহারা থাকিতে চায়, তাহাদের পক্ষে প্রবৃত্তি নিরোধের পথই একমাত্র পথ। যেখানে প্রাণখোলা মিলন নাই, নিজের সকল সরলতা দুর্বলতা নিবেদন করার মত সরলতা নাই সেখানে নিবৃত্তির পথই প্রশস্ত।...সারাজীবন দেখিলাম আমি কথা না বলিলে কেহ কথা কয় না। আমি যদি চুপ, তাহারাও চুপ। কতদিন এইভাবে চলিবে? যে যাহার কথা নিয়া যেন নিজের মধ্যে আছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে তাহারা মরিবে, আমি কি করিব? মনে মনে পারস্পরিক মিলন না হইলে 'মন' স্থির হইবে? 'মন' কি নিজের মধ্যে নিজের মীমাংসা আনিতে পারে? 'মন' যখন 'মনসঃ মন'-এর সঙ্গে যুক্ত, তখনই তাহার মীমাংসা। সুবোধ ঘোষ জানাইয়া যায় যে আগামী মঙ্গলবার লাঙ্গাউন চেয়ারের সুরেনবাবুর বাসায় অশ্বিনীকুমার শতবার্ষিকীর প্রথম কমিটির সভা, সেখান হইতে তাহাই ঠাকুরের ঠাকুর বাড়ীতে যাইব। ১৯শে মে

নিতাগোপাল, বিনা সাধনায় 'পাওয়া' তোমাকে অনন্ত সাধনার মাঝে অনন্ত কাল ধরিয়া তোমাকে পাইব, বিনা উপার্জনে 'পাওয়া' তোমাকে স্ব উপার্জিত ধনরূপে, আত্মিয়স রূপে সকল দেহমনপ্রাণ নিংড়াইয়া পাইব, 'মধু' করিয়া পাইব, সকল 'মমতা' দিয়া তোমার আদর করিব। তোমাকে বুকে লইয়া এই বিরাট বিশ্বের বুকে অভিযান করিব। তুমিই বিশ্বের সকল সমস্যার মীমাংসা, আমার জীবনেরও মীমাংসা। আমার সকল মনোবৃত্তির সঙ্গে তোমাকে জড়াইয়া পাইব। মনোবৃত্তিতে মনোবৃত্তিতে যোগ না হইলে সে যোগ শুধু বাহিরের যোগই হয়, পূর্ণাঙ্গ যোগ হয় না। তুমি আমি inter penetrated, intertwined হইয়া চলিব। রেণু ১টায় বাহির হইয়া রাইটার্স বিল্ডিং, সুবোধ মৃণালী ও মৃণালের আনন্দবাজার হইয়া ফেরে। উত্তরপাড়া সম্মেলনের পক্ষ হইতে আগামী রবিবারের ৫।-টায় মীটিং-এর বিজ্ঞাপন ছাপাইতে দিয়া আসে। এক ভদ্রলোক রাইটার্সে-এ ৫৲ টাকা দেয়। সকালে রেণু ও কুমার শরদিন্দুবাবুর ওখানে যায়। তিনি ৫৲ টাকা দেন। কুমার ৪টায় পর কুমারেশের 'রজতজয়ন্তী' উৎসবে যোগদানের জন্য যায়। ফেরে ১০টায়। [ক্রমশঃ]

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত

গরমে চলুন হালকা পায়ে

গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে আপনার পথের সাথী বাটার এই স্যান্ডাল আর চপ্পল। হাল্কা পায়ে চলাফেরা আর সেই সাথে পায়ের পরিচর্যার জন্য আদর্শ এইসব মজবুত, খোলামেলা জুতো।

মিটালি
সাইজ ২-৭

প্লেটাইম
সাইজ ৭-১০
১১-১, ২-৫

কোর্ভাডিস ১২
সাইজ ৫-১০

সুবীর
সাইজ ৪-১০

Bata Bata Bata Bata

ফিকসড ডিপজিট স্কীম ইউবিআই তে

সুদের হার বাড়লো !

ইউ বি আই-এর ফিকসড ডিপজিট স্কীমে এখন টাকা জমানো বেশী লাভজনক। পয়লা এপ্রিল ১৯৭৪ থেকে সুদের হার আরও বেড়েছে। মাত্র পনের দিন থেকে পাঁচ বছরের বেশী সময়ের মেয়াদে টাকা রাখা যায়। মেয়াদ অনুযায়ী গ্রাহকরা ৩ থেকে ৮ হারে সুদ পাবেন। ইউ বি আই-এর ফিকসড ডিপজিট স্কীমে বেশ মোটা রকম সুদের আয় হয়।

পুরনো সুদের হার	মেয়াদ		নতুন সুদের হার
২½%	১৫ দিন থেকে ৪৫ দিন		৩%
৩½%	৪৬ দিন থেকে ১০ দিন		৩½%
৪½%	৯১ দিন এবং তার বেশী কিন্তু ৬ মাসের কম		৫%
৫½%	৬ মাস এবং তার বেশী কিন্তু ১ বছরের কম	৬ মাস এবং তার বেশী কিন্তু ৯ মাসের কম	৫½%
		৯ মাস এবং তার বেশী কিন্তু ১ বছরের কম	৬½%
৬%	১ বছর এবং তার বেশী কিন্তু ২ বছরের কম		৬½%
৭%	২ বছর থেকে ৫ বছর অবধি	২ বছর থেকে ৩ বছর অবধি	৭½%
		৩ বছরের বেশী থেকে ৫ বছর অবধি	৭½%
৭½%	৫ বছরের বেশী		৮%

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UDF-7-74Ba

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম:" বলিলে ব্রহ্মই সমস্ত ইহাই বুঝিতে হয়। ঐ শ্রোত বাক্যানুসারে কিছুকেই 'অব্রহ্ম' বলিয়া বুঝিতে হয় না। যদিও কিছুকেই 'অব্রহ্ম' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কিছু ব্রহ্মজাতও বা কি প্রকারে বলা যাইবে? যেহেতু জাত বাহা তাহাকে নিত্য বলা যায় না। জাত যাহা তাহা অবশ্যই ছিল না। ছিল যাহা তাহাকে জাতই বা কি প্রকারে বলা যাইবে? ছিল যাহা, নাই হয় না যাহা, তাহা ত নিত্য। ব্রহ্ম ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন, মায়া ছিলেন, মায়া আছেন এবং মায়া থাকিবেন। অতএব ব্রহ্ম এবং মায়া যে সমস্ত হইয়াছেন সে সমস্তও অজাত এবং নিত্য। অথবা কেবলমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নিত্যত্বহেতু সে সমস্তকেও নিত্য বলিতে হয়, ব্রহ্মের অজাতত্ব হেতু সে সমস্তেরও অজাতত্ব স্বীকার করিতে হয়। অতএব সে সমস্তের জাতি নাই-ই বলিতে হয়। অজাত হইতে জাত হইতে পারে না যারম্বার বলা হইয়াছে।..."

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল রচিত
'জাতি দর্শন' হইতে।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৪·০০

শ্রীলীলিমা ঘোষ, এম. এ, বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	২·৫০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৫০
বাংলার ঋষি	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৭৫
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ১০·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

9 JUL 1974

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা দেহের অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। ভূমাকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে। 'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove he greatest burden of man, namely the expolitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। ভূমসূত্র (অনূদিত ভাষ্য)	
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২·০০
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮·০০
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৭·০০
২। ঈশোপনিষৎ	২·০০
৩। কেনোপনিষৎ	১·০০
৪। কঠোপনিষৎ	৩·০০
৫। প্রশ্নোপনিষৎ	১·০০
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ	·৭৫
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	২·৭৫
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৩·০০
মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৩·০০
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ	·৫০
১১। গীতাজয়ন্তী	·০৬
১২। উজ্জলভারত (পুস্তিকা)	·৫০
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৩·০০
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। দশ বৎসরের ডায়েরী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির গল্পকথা	১·২৫
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	·৩১
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়ঋষি শ্রীনিত্যগোপাল	·৬২
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ওরিয়েণ্ট বুক কোং প্রকাশিত	৩·০০
৪। রবীন্দ্র-স্মরণ	৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, (তারা—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
মানবায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড় অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক ... বিশ্বই আমার মহামঠ

BOWEL

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮১, ১৯৭৪ সম্পাদিকা - রেণু সিংহ ২৭-তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

নরনারায়ণ আশ্রমের আবেদন

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৯৩২-এর আগষ্ট আন্দোলনে জেলে থাকাকালীন ১১খানি প্রধান উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদগীতার সর্বসমন্বয়ময় সামগ্রিক জীবনাদর্শে অবধূত-ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত ৯খানি উপনিষৎ ও শ্রীগীতাভাষ্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমানে 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ'খানি মুদ্রিত করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব সকলের নিকট কাতর আবেদন জানাই—যিনি যাহা পারেন অর্থ-সাহায্য করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের প্রাণতত্ত্ব সাধারণের নিকট উপস্থিত করুন।

সূচীপত্র

উজ্জয়ন্তভারত শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮১

১। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৮৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লেখা হইতে

২। জয়তু শিবাজী (কবিতা) ১১
শ্রীসুরঞ্জন কাব্যতীর্থ

৩। নরনারায়ণ আশ্রমসংঘের ১৯৭৩-৭৪ ১২
আর্থিক বৎসরের কার্যবিবরণী

৪। প্রার্থনাকালীন ভাবণ (১২) ১৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-প্রদত্ত

৫। সুকান্ত-স্মরণে (কবিতা) ১০২
শ্রীগণেশ চক্রবর্তী

CALCUTTA UNIVERSITY

উত্তরভারত

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৪ ১৭-তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

সেই কত কত বৎসর আগে মানুষ-দেহ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নামে যিনি এসেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে গবেষণা আজও শেষ হয় নি। তিনি কি, কী তাঁর কথা, তার শেষ কেউ পায় নি বলেই মহান মধুর অনুরাগ সেই মানুষটি নিন্দা-স্তুতির সমুদ্র পেরিয়ে আজও অনেকের ভাল লাগার মধ্যে আটকে আছেন। এই ভাদ্রমাসে তাঁর আবির্ভাব-ক্ষণে তাঁকে একটু স্মরণ করি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্যে যে ভাষায় তাঁকে স্মরণ ও বন্দন করেছেন সেই ভাষায়—

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে যতখানি বিদ্যার ও গভীরতা আস্বাদিত হইয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী অন্য কোনও পুরুষে যেন যায় নাই বলিয়া তাঁহাকেই 'স্বয়ং ভগবান' বলা হইয়াছে। যদি শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে অপর কোনও পুরুষে অধিকতর বিদ্যার ও গভীরতা দেখিতে পাই তবে তাঁহাকেই আমরা স্বয়ং ভগবান বলিয়া মানিয়া লইব। কিন্তু অত বড় গভীর ও বিস্তীর্ণ জীবন বিশ্বে আজ পর্যন্ত হয় নাই, হইবার আশাও সম্ভবতঃ নাই। তিনি যুগ যুগ সর্বক্ষেত্রকে পরিপাক করিয়াই এক আশ্চর্য ভগবান্। তিনিই শুধু বাস্তবের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বলিতে পারেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। তাঁহার জীবনই নমনধর্মশীল জীবন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কোনও কোঠা-বিভাগ নাই। তিনিই 'সর্ববাদ বিষয় প্রতিরূপশীল'।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের জীবন দৃষ্টান্তরূপে অর্জুনের সামনে রাখিয়া উপনিষৎ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আমরা দেখিয়াছি কেমন করিয়া স্তুতির 'তৎ এজতি' (তিনি কাঁপেন) ও 'তৎ ন এজতি' (তিনি কাঁপেন না)-এর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। অগ্রে জীবন পরে তত্ত্ব-প্রচার—ইহা বর্তমান যুগের activity method।

ধর্মক্ষেত্র আজ আর নৈমিষারণ্য নয়, ভারতের শেষ সেনান্ত পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের বুকে উচ্চারিত হইয়াছিল। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই ভাগবতের 'বাসুদেবঃ সর্বম্'।

পুরুষোত্তম-জীবনে পুরুষ যেমন অনাদি অনন্ত, প্রকৃতিও তেমন অনাদি অনন্ত।

পুরুষোত্তম-জীবনে প্রকৃতি যেমন 'অনন্ত', 'কালও তেমনি 'অনন্ত'। কাল ও কালাতীত পুরুষের সমন্বয়ই পুরুষোত্তম।

পুরুষোত্তম-জীবনে কালের মত 'ধর্ম'ও অনাদি অনন্ত।

'উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি।' পরস্পর বিরোধী উৎপত্তি প্রলয়, অগতি ও গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যার গূঢ়ার্থ যিনি জানেন তিনিই সর্বপদার্থপ্রধান 'দ্বন্দ্বসমাস' ভগবান বলিয়া বাচ্য—দ্বন্দ্বস্যাপি সামাসিকস্য চ।

পুরুষোত্তম বলিবেন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যোগ যখন 'যাত্রা'-র মধ্যে অর্থাৎ পুরুষোত্তম-'যাত্রা'-র মধ্যে পুরুষোত্তম-ছন্দে সংঘটিত হয়, তখনই তাহাকে 'সহ করা' সম্ভব, পরিপাক করা সম্ভব। পুরুষোত্তম-যাত্রা

বিশ্বের সর্বত্র অনুস্যূত। আইনষ্টাইন যেমন বিশ্বের 'ত্রিমাত্রা'-র পরেও আর একটি চতুর্থ মাত্রার আবিষ্কার করিয়াছেন, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও তেমনি বিশ্বের ভূত-মাত্রা ও প্রজ্ঞামাত্রা, ভূতমাত্রা ও প্রজ্ঞামাত্রার সংযোগ-মাত্রার সঙ্গে প্রাণবল্লভ-পুরুষোত্তম মাত্রাকে জুড়িয়া দিয়া একটি জীবন্ত জগতের ছবি আঁকিয়াছেন। সর্বমাত্রা যেখানে স্ব স্ব মাত্রা বজায় রাখিয়া সমন্বিত সেখানেই সর্বমাত্রাসমন্বিত অমাত্র পুরুষোত্তম-বস্তুর দিব্য আবির্ভাব। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পুরুষোত্তম-মাত্রায় সংযোগকেই সর্বেন্দ্রিয়ে ও সর্ব বিষয়ে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবেই 'তিতিক্ষস্ব' পদের সার্থকতা মিলিবে। প্রাণ-চুম্বিত ভূতমাত্রা ও প্রজ্ঞামাত্রার সংযোগের বুকেই পুরুষোত্তম-আস্বাদন সম্ভবপর।

ভূতসমূহকে পুরুষোত্তম-তত্ত্বে উৎ আসীন দেখিলে প্রতি কারণ ও তাহার কার্যের মাঝে এবং প্রতি কার্য ও অন্যান্য কার্যের মাঝে দাঁড়ানো পুরুষোত্তমই দৃষ্ট হন। পুরুষোত্তম-সূত্রেই কারণের সঙ্গে কার্য ও কার্যের সঙ্গে কার্য পারস্পরিকভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। কার্য কারণ শৃঙ্খলার যে কঠিন দম্ভ রাগদ্বেষযুক্ত ধর্মাধর্মবিদ্ধ মানুষকে প্রচলিত Law of karma-র মধ্যে টানিয়া আনিয়া নাজেহাল করিতেছে, এই যোগের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে তাহা গলিয়া যায়। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি'—গাঁঠগুলি সব ভিন্ন হয় এবং 'ক্ষীয়ন্তে চ অস্য কর্মাণি'—প্রারব্ধাদি সব কর্মই তখন ক্ষীণ হয়। সব বিষবস্তুটা, দেহযন্ত্রটা তখন organic হয়, মুক্ত হয়, ঝরঝরে হয়, সহজ হয়, ভারহীন হয়।

যে যে-রূপে আমাকে চায় আমি ঠিক তাহার চাওয়ার অনুরূপ হইয়াই তাহার ভজনা করি, সেবা করি। আমি জীবনোপাসকের কাছে জীবন, মৃত্যুর উপাসকের কাছে মৃত্যু। আমি আস্তিকের অস্তি, নাস্তিকের নাস্তি, শূন্যবাদীর শূন্য, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত, দ্বৈতবাদীর দ্বৈত, কৈবল্যবাদীর কৈবল্য, অভেদবাদীর অভেদ এক, ভেদবাদীর ভেদ বহু; আমি ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে ব্রহ্মণ্যদেব, ক্ষত্রিয়ের দৃষ্টিতে বসুদেবনন্দন, বৈশ্যের দৃষ্টিতে নন্দের নন্দন, শূদ্রের দৃষ্টিতে বিশ্বসেবক; সন্ন্যাসী আমাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে, বানপ্রস্থী সাজাইয়াছে বানপ্রস্থী, সংসারী আঁকিয়াছে আমাকে বিষয়ীরূপে, ব্রহ্মচারী দেখিয়াছে রাসক্রীড়ামণ্ডলে আমার আত্মসম্ভোগবারুদ্ধ-গৌরে ব্রহ্মচারী রূপ। যে কোন বৃত্তি দ্বারাও আমি ভজনীয়—'গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বিভোঽন্তি'। আমি কর্মী জ্ঞানী ভক্ত যোগী। আমি রাজনীতিজ্ঞ, আমি বেদান্ত প্রচারক, আমি সাধবি, আমি লৌকিক, আমি পারমার্থিক, আমি আত্মা আমি অনাত্মা, আমি সকল হাঁ, আমি সকল না। আমি দুষ্টের দৃষ্টিতে শত্রু, সাধুর দৃষ্টিতে মিত্র, আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি? আমি আমার শক্তি, আমার জগৎ, আবার সাধনা প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই প্রত্যেকের হত, অথচ কাহারো একচেটিয়া নই, পরন্তু প্রত্যেককে রাসচক্রে গৃহীতকণ্ঠ করিয়া প্রত্যেক দুইটির মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি অপূর্ব নটবর রাসক্রীড়ারত পুরুষোত্তম। আমি প্রত্যেকের কাছে তার তার দৃষ্টিকোণে ধরা দিয়াও অধর। আমার মতই তাহারা হয় না, তাহাদের মতই আমি হই। আমি বহুরূপী।

সমগ্র সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির সন্ধিতে থাকিয়া ও সৃষ্টির অতীতরূপে, সৃষ্টির পরকীয়রূপে আমি অনাদি অনন্ত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপিনী দিব্য সৃষ্টি আস্বাদন করিয়া চলিয়াছি। আমি প্রতি বিশেষ সৃষ্টিকে স্বরূপপূর্ণ করিয়াও বিশেষ সৃষ্টির অতীত। বিশেষভাবে আমি সংহারেরও কর্তা। একান্ত স্রষ্টাই আমি নই। অব্যাহত সৃষ্টিই যদি সত্য হইত, মৃত্যু অর্থাৎ সৃষ্টির ভ্রম আমাকে গ্রাস করিত। সর্বোপরি আমার দর্শনে যাহা সৃষ্টি করিয়াছি হইও যেমন সত্য, এই বিশ্ব নিজেকে নিজে সৃষ্টি করিয়া আপনা আপনি গড়িয়া উঠিতেছে, আমাকেও গড়িয়া তুলিতেছে ইহাও তেমনি সত্য। আমি সৃষ্টির মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া

সৃষ্টিময় হইয়া কর্মকর্তৃত্বাভ্যে নিজেকে নিজে সৃষ্টি করিয়াছি, সৃষ্ট হইয়াছি। সৃষ্টির মাঝে আমার সবটুকুর অনন্ত লুট লাগাইয়া দিয়াও আমি অবায়, পূর্ণ।

সকলেই স্বরূপতঃ স্বয়ম্পূর্ণ এবং সকলেই সম সাক্ষাৎভাবে, সম মর্যাদায় পুরুষোত্তমে যুক্ত হইয়া নিজের ব্যক্তিগত স্বয়ম্পূর্ণত্ব আস্বাদন করিতে পারে। পুরুষোত্তম-ভাবনের মধ্যে প্রতি স্বয়ম্পূর্ণ আত্মাগুলিকে নিজের মধ্যে এবং নিজকে তাহাদের মধ্যে পাইবার মত 'সম' বুদ্ধি যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই সমবুদ্ধি হইয়া যোগারূঢ়দের মধ্যেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, কেননা একমাত্র ইনিই লোকসংগ্রহ করিতে সক্ষম। এই সমবুদ্ধির দৃষ্টান্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে সুহৃৎ পাইয়াছেন, মিত্র পাইয়াছেন, অরি শিশুপালাদি পাইয়াছেন, উদাসীন আত্মারাম পাইয়াছেন, মধ্যস্থ পাইয়াছেন, দ্বেষ্য সম পাইয়াছেন, বন্ধুগণ পাইয়াছেন, সাধুরা পাইয়াছেন, দুরাচারও পাইয়াছেন।

আমি কর্মের অগ্র বা পশ্চাতের কোন অভিসন্ধি লইয়া কর্ম করি না, আমি কর্মের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত আত্মানন্দ রসই আস্বাদন করি। পাইয়াছি, পাই নাই, পাইতে হইবে—ইহার যে কোনও একটীই উপাধি সৃষ্টি করিবে। সব কয়টার সমন্বয়ে উপাধিবিধুর লীলাকর্মই আমি করিয়া যাইতেছি। একান্ত পাইয়াছি বলাও ভুল কেননা না পাওয়াও অনন্ত। একান্ত 'পাই নাই' বলাও ভুল কেননা অন্তরে অন্তরে পাওয়ার অনুভূতি, একটী স্বতঃসিদ্ধ পাওয়া স্বীকার না করিলে পাইবার লালসাই জাগ্রত হয় না। একান্ত 'পাইতে হইবে' বলাও ভুল কেননা যাহা পাই নাই তাহাকেই পাইতে হইবে বলিয়া বিধিলিঙ্ দ্বারা নির্দেশ করা হয়। যেখানে পাওয়াতেই আরম্ভ সেখানে পাইতে হইবে বলার অর্থ কি!

অর্জুন, তুমি ভাবিয়াছিলে যে যুদ্ধ করার ফলেই স্ত্রীগণ দুষ্টা হইবেন, বর্ণ সঙ্কর সৃষ্টি হইবে; কিন্তু আমি দেখিতেছি অন্য চিত্র। আমি বলিতেছি যে যুদ্ধ না করিলেই বর্ণ সঙ্কর সৃষ্টি হইবে। বর্তমান যুদ্ধ যে কারণকে বুকে লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই কারণের মাঝেই রহিয়াছে বর্ণ সঙ্করের বীজ। তুমি কি অর্জুন বুঝিতেছ না, যে রাষ্ট্রের বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে একজন নৃপতি সমস্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্রের চোখের সামনে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সত্ত্বেও রাজ-পরিবারের একটা নারীকে উলঙ্গ করিবার দুঃসাহস করিল, সে রাষ্ট্রের অন্তরে অন্তরে ব্যভিচার কিরূপভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইয়াছে, বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হইয়াই বসিয়াছে! দৌপদীর উপর এই লাঞ্ছনাকে নারীকুলের প্রত্যক্ষ করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে তাহাদের না দাঁড়ানোর ভিতর দিয়া কি প্রমাণ পাইতেছ না যে নারীগণের নৈতিক দুর্বলতা কোন্ অধঃস্তরে পৌঁছিয়াছে? সখা, তুমি চাহিতেছ যুদ্ধ না করিয়া সেই বর্ণসঙ্করকে পাকা করিতে, আর আমি চাহিতেছি তোমাকে নিমিত্ত করিয়া বিশ্বে রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া সেই বর্ণসঙ্করকে পরিপাক করিতে, সমূলে বিনাশ করিতে।

শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসের দ্বারা বিষমঙ্গলের বুদ্ধিভেদ জন্মান নাই, সংসারের দ্বারা সনক-সনাতন আদির বুদ্ধিভেদ জন্মান নাই। অথচ তিনি দুই দলকেই কি এক অজানা কৌশলে সমভাবে আকর্ষণ করিয়া নিজ শ্রীচরণে স্থান দিলেন, লোক-সংগ্রহ করিলেন, দুই দলেরই সমভাবে অধর হইলেন। যিনি সন্ন্যাসীর দৃষ্টিকোণে ধরা দিয়াও অধর, সংসারীর দৃষ্টিকোণে ধরা পড়িয়াও অধর, অথচ যিনি দুইকেই দুইয়ের মাঝে নিজের বাহুদ্বারা 'গৃহীতকণ্ঠ' করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন তিনিই কাহারও বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া প্রত্যেককে তার তার স্তরের খণ্ড বুদ্ধির পথে পরিচালিত করিয়া প্রত্যেকের বুদ্ধিকে অন্যের বুদ্ধির মাঝে গলাইয়া দিয়া এক অখণ্ড সমগ্র বুদ্ধি, বুদ্ধিযোগের সৃষ্টি করিয়া লোকসংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি 'সেতু', 'বিধরণ', ধৃতপাল। শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান লোক-সংগ্রহ। তিনিই বিশ্বের জন্য একটী সর্ববর্ণ-সাধারণ সর্বাশ্রম-সাধারণ যজ্ঞ স্বরূপ

(platform) এক অখণ্ড পুরুষোত্তম জীবন লইয়া অবতীর্ণ।

যে জন বিশেষ কোনও একটী গুণ বা কর্মের উপর আস্থাবান হইয়া তাহাকেই একমাত্র সিদ্ধির সোপান মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে এবং অপরাপর সকলকে দাবাইয়া তাহারই মাঝে প্রবেশ করাইতে কিংবা অনুগত করিয়া রাখিতে প্রাণপণ করে, সে-ই একদেশদর্শী; পক্ষান্তরে তিনিই কৃৎস্নদর্শী যিনি প্রতি গুণ বা কর্মের স্বয়ম্পূর্ণতা জানিয়া প্রতি স্বয়ংপূর্ণ গুণ ও কর্মগুলির সংবেদন করিয়া সর্বগুণসমন্বয় সর্বকর্মসমন্বয়রূপ জীবন দর্শন করেন।

কৌতরি পরাশর জড়ভরত আদি জ্ঞানী যতই প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া ও পুরুষের জয় গাহিয়া প্রাণকে অস্বীকার করুন না কেন, সর্বমঙ্গলা প্রকৃতি-মাতা রক্ত-মাংসের এই কাঠামো খাড়া করিয়া রাখিবেনই যাহারা ভিতরে প্রজ্ঞা তাহার আদর্শকে আধান করিতে পারে। এই প্রাণের ধারণ পোষণেই প্রজ্ঞা পুষ্ট হইয়া জন্মিয়া উঠিতে থাকে। আদর্শকে ধারণ পোষণ করার দিক দিয়া প্রজ্ঞার চেয়েও প্রাণ বড়।

পুরুষোত্তম-দর্শনই হইতেছে ইষ্ট অনিষ্ট নির্ধারণের মানদণ্ড। এই দর্শন হইতে চ্যুত হইয়া পুরুষব্যাপারতন্ত্র স্তরে দাঁড়াইয়া যে ইষ্টঅনিষ্ট নির্ধারণ তাহা নিছক মিথ্যা জ্ঞানেরই কার্য; সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত রাগদ্বেষের কখনও বশীভূত হইবে না; কেননা পুরুষব্যাপারতন্ত্র স্তরে বিশ্বরূপ স্বরূপ সমন্বয়-দৃষ্টি না থাকায় ইষ্ট অনিষ্ট বলিয়া এবং অনিষ্ট ইষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হইবেই। তখন ইষ্টকে রাগও সত্য বাস্তব অনিষ্টের কারণ হইবে; অনিষ্টই সত্য বাস্তব ইষ্ট হওয়ার ফলে অনিষ্টে দ্বেষও মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া অনিষ্টের কারণ হইতে পারে।

ধর্ম জাতি কুল বর্ণ ও আশ্রম যখন গ্লানিগ্রস্ত, তখন কী যে স্বধর্ম, কী যে পরধর্ম তাহা কি বোঝা সহজ? ব্রাহ্মণের মধ্যে আসিয়াছে ক্ষত্র-বৈশ্য-শূদ্রগুণকর্মযুক্ত পুরুষ, তেমনি ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যেও আসিয়াছে অন্যান্য গুণকর্মযুক্ত পুরুষ। কবিরের স্বধর্ম কি? রইদাসের স্বধর্ম কি? চিন্তামণির স্বধর্ম কি? ব্রজগোপীর স্বধর্ম কি? প্রাকৃতিক বিধানে যে যেখানে আছে তাহার উপর কোনও টানাটানি না করিয়া সেখান হইতে পুরুষোত্তমে রওয়ানা হওয়াই গীতার বিধান। পুরুষোত্তম ধর্ম প্রতি জীবের প্রকৃতির ক্ষেত্রে অবতরণ করিলে যে রূপে পরিণত হয় তাহাই সত্য বাস্তব স্বধর্মের স্বরূপ।

পুরুষোত্তম কামই স্বচ্ছন্দ কাম। পুরুষোত্তম, তাঁহার লীলা-শক্তি ও তাঁহারই কার্য এই জগৎ-সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানরূপ কারণের কার্যভূত ঐ রাগদ্বেষ ইন্দ্রিয়ের পিছু পিছু ধাবমান যে মনকে গ্রাস করে, যে মন মনোময় পুরুষোত্তম-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুরুষোত্তম-বিচ্ছিন্ন হইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া মনে করে 'কর্তা অহম্', সেই কাম মনোজ কাম। মন যদি পুরুষোত্তমে অর্পিত হইয়া স্থিত হইত, দ্বন্দ্বের (রগড়া) ভিতর মৈথুন স্থাপন করিত, তাহা হইলেই পুরুষোত্তম-স্তরে কাম অকাম-ভাবিত হইয়া উঠিত এবং হৃদরোগ কাম দূরীভূত হওয়ার ফলে হৃদয়ে শ্রীভগবান প্রকাশিত হইতেন।

কামের উপর কোন মায়া ও ইন্দ্রজাল চলিবে না; কামের মত মায়াবী কে আছে? মহীরাবণ বিভীষণের রূপ ধারণ করিয়াই হনুমানের মোহ উৎপাদন করিয়া রামলক্ষ্মণকে হরণ করিয়াছিল। কাম মায়াবী বলিয়াই সে কামরূপ, শাস্ত্রের রূপ, বিবেকরূপ ধরিয়াও আসিতে পারে। এই কামকে বশে আনা মিথ্যা জ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়ানো জীবের অসাধ্য। তাই তো মিথ্যাজ্ঞানের স্তর হইতে কোন নীতিই কামকে বশে আনিতে সক্ষম হইবে না। ভগবান 'অসাধ্য' এই কামকে দমন করিবার ব্যর্থ প্রয়াসের উল্লেখ করিয়া নিজের মদনমোহন বৈষ্ণবের যোগেশ্বর সর্বরসকদম্বমূর্তি রূপের মাঝে আকর্ষণ করিয়া, প্রবেশ করাইয়া, ভাব-ভাবিত করিয়া মদনকে মদনমোহন স্তরে উৎ আসীন করিবার অদ্ভুত লীলা-কৌশল সহযোগে নিজেকে অর্জুনের সামনে, বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করিলেন।

জীবের দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি যখন কামের অধিকারে চলিয়া যায়, জীবের হাতছাড়া হয়, তখন কামের অধিকার হইতে উহাদিগকে কাড়িয়া লওয়ার পূর্বে সেই কামাসক্ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির দ্বারা হইতে যাহা কিছু সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে প্রচারিত হইবে তাহা তো শত্রুরই সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই সত্য বাস্তব আর হইতে পারে না, যাহা দ্বারা পুরুষোত্তম-প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে।

পুরুষোত্তম তাই গীতাশাস্ত্রে তাঁহার সঙ্গে যোগবিধানের দ্বারা কামের ঘাঁটিসমূহ দখল করিয়া নিজ আয়ত্তে আনিয়া পরে সাধন বা সিদ্ধি আস্বাদনের উপদেশ দিয়াছেন। সর্বাগ্রে পুরুষোত্তমে যোগ স্থাপন করা ও পরাস্ত নিজেরই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে দখল করার পরেই তাহাদের সহায়ে পুরুষোত্তমকে আস্বাদন করার প্রশ্ন উঠিতে পারে। ঘাঁটি দখলের পূর্বে হাতছাড়া নিজেরই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির আত্মা বা অনাত্মা সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য নয়, রসনের যোগ্য ক্ষেত্র নয়।

পুরুষোত্তম-শ্রীচরণে উৎসর্গ করাই কামের সত্য বাস্তব প্রমাণ, তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করার বাহিরেই কাম হয় নিত্য বৈরী, তাঁহার চরণে উৎসর্গীকৃত কাম divine, নিত্যবন্ধু, অপ্রাকৃত নবীন মদন, স্বয়ং পুরুষোত্তমেরই বিকাশ।

জয়তু শিবাজী

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

যখন হিন্দুর ভাগ্যাকাশ থেকে পূর্ণেন্দু অস্তমিত,
দশ দিক কুয়াসাচ্ছন্ন,
নেমে আসে ধর্মান্তরকরণের প্রবল বন্যা ;
মন্দিরের চূড়া চূর্ণ বিচূর্ণ : বিগ্রহের নিগ্রহ
সংস্কৃতির পুণ্যাঙ্গনও তমসাবৃত
তখন মহারাষ্ট্রে শিবাজী-সূর্যের অভ্যুদয়।

খসে পড়ল কুহেলীর কাল আবরণ
সত্য ন্যায়ের ধর্ম্মের ধ্বজা হ'ল উড্ডীন
বীর্যে সুগম্ভীর উদিত হ'ল এক ক্ষাত্রতেজ—
গুহার নিদ্রিত সিংহের যেন জাগরণ।
সেই কেশরী গর্জ্জনে কেঁপে উঠল আলমগীর
তার আগ্রাসী নীতির নেমে এল যবনিকা।

আকাশে উড়ল বৈরাগীর পূত উত্তরীয় পতাকা
রামদাস স্বামীর পাদপদ্মে অর্পিত প্রাণ
গো ব্রাহ্মণ প্রতিপালক রাজর্ষি শিবাজী।
বরিয়া সারং তাঁর নৌ-সেনাপতি
ন্যায়াধীশ বিজাপুরের প্রাক্তন বিচারপতি ;
চৈত্য, মন্দির, মসজিদ্ সব একাকার
তাপিত চিত্ত শীতল ছত্রপতির ছত্রছায়ায়।

মহাকাল কালে কালে কত কীর্ত্তিই না কুক্ষিগত করেছে
কিন্তু মহারাষ্ট্রের মহানায়ক, তোমার স্মৃতি অমর
ভরতের ইক্ষুদণ্ডার ন্যায় ত্রিশত বর্ষ পরেও স্বর্ণোজ্জ্বল।
তোমার অভীপ্সা নব ভারতের আদর্শ
দাক্ষিণাত্য থেকে আর্য্যাবর্ত্তের অন্তরে অন্তরে পূজারতি
আজো কোটি কোটি কণ্ঠে নিনাদিত—
জয়তু শিবাজী।

নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘের ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরের কার্য-বিবরণী

আমরা এক বৎসর পরে আবার এতজনে মিলিত হইলাম। কিন্তু সারা বৎসর যদি আপনারা সকলে এই সকল প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সচেতন না থাকেন, তাহা হইলে এগুলির প্রতি আপনাদের কর্তব্য করা হয় না। যাহা হউক, নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘের চারিটি বিভাগ—গ্রন্থাগার, মেয়েদের সেলাই কেন্দ্র, নিম্ন ও প্রাক্ বুনিয়াদী দুইটি বিদ্যালয়—গত আর্থিক বৎসর ১৯৭৩-৭৪এ মোটা-মুটি ভালই চলিয়াছে। তবে ভালত্বের যখন কোন সীমা-রেখা টানা যায় না তখন প্রতি মুহূর্তে আরও ভালর কথা ভাবিয়া যাহা হইতেছে তাহাতে সন্তুষ্ট আমরা থাকিব না এ কথাও সত্য।

বিভাগানুযায়ী বিবরণ নিম্নরূপ:—

নরনারায়ণ গ্রন্থাগার (গ্রামীণ):—

সভ্য সংখ্যা ৩১।৩।৭৪ তারিখে	১২৪
(পূর্বের যাহারা একেবারে আসিতেছেন না তেমন ৩৪ জনের হিসাব ইহার মধ্যে ধরা হইল না।)	
পুস্তক সংখ্যা ৩১।৩।৭৪ পর্যন্ত :—	৩৯০০
প্রদত্ত পুস্তক সংখ্যা এই এক বছরে :—	৭৪৬২
বিভিন্ন রকমের পত্র-পত্রিকা :—	৪৭
প্রতিমাসে কেনা হয় দৈনিক	১টি

তাহাছাড়া Career Digest, Competition Master, Science-To day, শুকতারা :—

গত এক বৎসরে লাইব্রেরীতে বই যোগ হয়েছে :— ১৯০টি

বই কেনা হয়েছে :— টাকা ৪৫৯'৬২

গ্রন্থাগারের স্থান ও আলমারী উভয়েরই অভাব সম্বন্ধে কোন সমাধান এ পর্যন্ত করা যায় নাই। গ্রন্থাগারের সকলপ্রকার সম্প্রসারণ খুবই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে গ্রন্থাগারের জন্য সরকার-হইতে যে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে উহা অস্থায়ী বন্দোবস্ত, তাই গ্রন্থাগারের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে ইহার নিজস্ব অর্থ-বিল বাড়ানো উচিত একথা যেন আমরা মনে রাখি।

নরনারায়ণ মহিলা শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র :

৩১।৩।৭৪ তারিখে এখানে ছাত্রী সংখ্যা ২৫। ডিপ্লোমা বিভাগেই ছাত্রী বেশী করিয়াছে। এ বাজারে এতটা খরচ করিয়া সেলাই শেখা সুবিধা নহে মনে হইতেছে। অথচ ছাত্রী না থাকিলে স্কুলটি রক্ষা করা মুস্কিল হইবে। কেননা দুইটি শিশু বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের মত এই স্কুলের খরচ বেশীটাই অন্য স্থান হইতে পাওয়া যায় না। সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড হইতে বছরে মাত্র ১২০০০ টাকা পাওয়া যাইতেছে। শিক্ষিকার মাহিনা বছরে ১৬৮০০০ টাকা লাগিতেছে; অথচ বোর্ড হইতে পাওয়া যায় ৭৫০০০ মাত্র। অতএব স্কুলটির জন্য একটা প্রচার সর্বদা চালাইয়া রাখা দরকার; অথচ সেদিকে আমাদের ক্ষমতা বড়ই সীমাবদ্ধ। আমি এই সভার সদস্যদের, বিশেষত স্থানীয় সদস্যদের, এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাই। এ বৎসর ১০জন ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিয়াছিল যদিও ১২ জন পরীক্ষার জন্য ফী দিয়াছিল। বিভিন্ন কারণে ২জন পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। ১০ জনের মধ্যে ৮ জন পাশ করিয়াছে, ২ জন শুধু থাতায় পাশ করিয়াছে; তাহাদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে শিক্ষিকা অবহিত ছিলেন। এই স্কুল সম্বন্ধে নূতন কোন সম্প্রসারণ কিছু এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

নরনারায়ণ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় :—

বর্তমান বৎসরে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা নিম্নরূপ :—

শ্রেণী	I		৫৩
"	II	(ক)	৪৭
"	II	(খ)	৪৭
"	III	(ক)	৩৮
"	III	(খ)	৩৪
"	IV		৩৮
"	V		১০
	মোট		২৩৭

শিক্ষক শিক্ষিকা ৭ জন। গত বৎসর যে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার অনুমোদন স্কুল বোর্ড হইতে সংগ্রহ করা গিয়াছে। কিন্তু গ্র্যান্ট সম্বন্ধে স্কুল বোর্ড-এর সঙ্গে হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। টীচারদের মাহিনা নিয়মিত দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ইহা বড়ই অসুবিধাজনক হইতেছে। দিন দিন মাহিনা বাড়িতেছে, এক তহবিলের টাকা অপর তহবিলে খরচ করাও অসুবিধা, অপর তহবিলের টাকাও না থাকার মত। তাই প্রতি বিভাগের নিজস্ব টাকা থাকা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। লেখাপড়ার মান কিংবা অন্যান্য বিষয় কতটুকু কি হইতেছে তাহা সঠিক জানিতে হইলে আপনাদের সাহায্য আমি প্রার্থনা করি। আপনারা সচেতন ও সক্রিয় না হইলে স্কুলগুলির মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমার একার পক্ষে বিস্তৃতভাবে সকল দিক দেখা সম্ভব নয়। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা অর্থাৎ বৃত্তি পরীক্ষার ফল এই রূপ : ২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ম বি ৫, ২য় বি ১, ৩য় বি ১৩ জন, ২ জন ফেল করিয়াছে।

প্রাক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ঃ বর্তমান বছরে এ বিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি করা হইয়াছে ৫৪ জন। এখানে লেখাপড়া সাঙ্গ হয়—শিশুদের প্রথম শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলা এবং অন্যান্যভাবে তাহাদের শিক্ষা ও আনন্দদানের প্রয়াস করা হয়। এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাইতে আমি আপনাদেরই শরণাপন্ন হইব। আপনারা উদ্যোগী না হইলে প্রতি বিভাগে আরও উৎকর্ষ সম্ভব নয়। এ বছর এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা দীর্ঘ ৫ মাসের ছুটিতে আছেন, হেডটীচারও অসুস্থতার জন্য দুইবার ছুটি লইয়া ছিলেন, এমনকি নিকর একজন মাত্র ষ্টাফ ছিলেন, তখন আমি একঘণ্টার উপর ক্লাস নিয়াছি।

এই দুইটি বিদ্যালয়েই প্রায়ই নানা ঘটনা ঘটে—তাহাদের গ্র্যান্ট সম্বন্ধে হাঙ্গাম তো আছেই। টাকা তো এগার মাসের আগে পাওয়া যায়ই না, তদুপরি সরকার ফাইল হারাইয়া আবার সব কাগজপত্র চায়, অডিট রিপোর্ট দিলেও বলে দাও নাই ইত্যাদি নানা হাঙ্গামা লাগিয়াই থাকে। গ্রন্থাগার ও সেলাই স্কুলের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণই সেখানে চিন্তার বিষয়। কিন্তু এই দুইটি স্কুলে নানা ব্যাপার। তাই এই দুইটী বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ না করিলে আমার পক্ষে খুবই অসুবিধা হইতেছে—ইস্কুল দুইটির উন্নতির জন্যও আপনাদের অবহিতি প্রয়োজন বোধ করিতেছি। আমি সভাকে এ বিষয়ে বারবার অবেদন জানাইতেছি।

—সম্পাদিকা, নরনারায়ণ আশ্রম-সংঘ

মেসার্স ইণ্ডিয়ান একস্‌প্লোসিভ লিঃ-এর কর্মচারীবৃন্দ হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ বিরচিত ছান্দোগ্যোপনিষৎ-এর অবধূত ভাষ্যখানা ছাপাইবার জন্য নরনারায়ণ আশ্রমের কার্যকরী সমিতির সভ্য শ্রীনির্মলকুমার গুপ্ত মহাশয়ের মারফত ৬৭০০ (সাতষট্টি) টাকা এবং শ্রীগুপ্ত মহাশয়ের নিজের ৩৩০০ (তেত্রিশ) টাকা অর্থসাহায্য পাইয়া তাঁহাদিগকে আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

নরনারায়ণ আশ্রমের সেবকসেবিকাবৃন্দ।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৯২)

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

১১।২।৫৮ :—আমরা যারা আশ্রমে আছি তাদের সকলেরই এটা মনে রাখতে হবে যে এটা আশ্রম। আশ্রম-দেবতা শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শনকে রূপ দেব এজন্ত এসেছি। ···এখানেও সকলে খায় দায় ঘুমায় —তবু এটা সংসার নয়। ···সংসারেও ভগবান লাগে —কিন্তু সেটা পাহারাদারের মত—তাদের সংসারটাকে সুন্দর করে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্তে···। সংসার ভগবানকে বলে, ঠাকুর, আমার ছেলেপুলেকে সুখে রেখো, বাঁচিয়ে রেখো, কোন বিপদ আপদ না হয়, আমি অমুক কাজে যাচ্ছি তুমি রক্ষা করো ইত্যাদি ইত্যাদি। ···সেখানে আমার ভাগবত জীবন যাপন করবার কোন প্রশ্ন নেই···। সংসারে আমার জীবন আমি যাপন করব, ভগবান তুমি এসে সেখানে আমার প্রয়োজনগুলি পূরণ করে দিও···। আর আশ্রমের কথা হচ্ছে—আশ্রম-দেবতাকে ভালবাসব, তাঁর জীবন দেখে আমার জীবন ব্যাপকতর গভীরতর করে গড়ে তুলবার প্রয়াস পাব, তাঁর কাজ, তাঁর কথা, বিশ্বের মানুষের জন্ত তাঁর ভাবনা নিজের বলে নেব···। সংসারীরা অভিসন্ধিপরায়ণ, ভগবানকে তাঁরা নিজের কাজে লাগাতে চায়, আশ্রম ভগবানের কাজে নিজেকে লাগাতে চায়। ···নিজের প্রয়োজনের জন্ত আশ্রমে কারো থাকা চলবে না···। তোমার প্রয়োজন যখন আশ্রম-দেবতার প্রয়োজনের সঙ্গে মিলে যাবে সেইখানে তুমি আশ্রমে থাকবার যোগ্য, সেইখানে তুমি নিরাপদ। ···নবী কোন্ প্রয়োজনে সাগরকে ডাকে ? ··· যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। ···সংসারী শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটাতে চায়, নিজেকে দিয়ে বাটনা বেটে শালগ্রামকে দিতে চায় না। ···নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন-বোধ নিয়ে আশ্রমে আসার সার্থকতা কি ? ··· আশ্রম-দেবতার সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে চল—জীবনের রস চির দিনের জন্ত বজায় থাকবে। ···মাটির সঙ্গে যদি গাছের মূল যুক্ত না থাকে, রস পাবে কোথা থেকে ? ···নিত্যগোপালের জীবন ও কথা প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে··· মনে রাখতে হবে তোমরা তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতে এসেছ—তাঁর প্রতিষ্ঠা হলে তোমাদের প্রতিষ্ঠা হবে। ···নিজের প্রয়োজন ভুলে যাও। ···আমার যা সামর্থ্য, মানুষের জন্ত আমি তার থেকে বেশী করি। ··· নিত্যগোপাল একদল 'মানুষ' তৈরেছেন, যারা স্বেচ্ছা-সেবকের মত তাঁর কাজ করবে। ···দেহযন্ত্র হল সংঘের সার্থক রূপ—দেহযন্ত্র যেমন করে চলে, তেমন করে আশ্রম করতে হবে। ···সংসারী এসে আশ্রমে দেখবে কেমন করে পারস্পরিক প্রীতির মধ্য দিয়ে একটা কাজ হয়ে যাচ্ছে···। আশ্রম হবে বিশ্রাম স্থল—যেখানে সকলের একপ্রাণতা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। ···দেহযন্ত্রে চোখের কাজ কান করে না, কানের কাজ নাক করে না ···এক দিক দিয়ে তারা সকলে পৃথক, কিন্তু আর একদিক দিয়ে—জীবনের দিক দিয়ে—তারা পৃথক নয় তারা এক। সবাই মিলে তারা জীবনেরই সেবা করছে—জীবনকে বাঁচিয়ে এগিয়ে নিচ্ছে···। দেহযন্ত্রে প্রত্যেকে দায়ী প্রত্যেক কাজের জন্ত যতই প্রত্যেকের আলাদা কর্মবিভাগ থাকুক না কেন। আশ্রমের দায়িত্বও সামগ্রিক—কাজের বিভাগ থাকতে পারে—থাকবেই। কিন্তু দায়িত্ব সকলের সমগ্রভাবে। দাঁতে কাঁটা ফুটলে জিহ্বা খোঁচাতে থাকে—একটী যন্ত্র পীড়িত হলে প্রত্যেকে তাকে সুস্থ করার জন্ত খোঁচাতে থাকে, সচেতন হয়ে ওঠে। ···আশ্রমের কোন একটা কাজ হল কি হল না, সেজন্ত প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকতে হবে। ···সম্পদ সকলের, বিপদও সকলের।

…যার যার কাজ নিয়ে সে চলেছে, অন্য বিভাগ ডুবে গেলেও কিছু করবে না—এটা বুরোক্র্যাটিক।…প্রত্যেক কাজের জন্য প্রত্যেকে দায়ী…। অলসতা আশ্রমে থাকতে পারবে না—অথচ তাই চলছে কিন্তু। …ভাগের মা গঙ্গা পায় না…নিত্যগোপালের শতবার্ষিকীর দায় কে নেবে? তখনও নিত্যগোপালের ৫০ জন শিষ্য ছিল।…যে কমিটী তৈরী করা হল তারা স্থির করল নবদ্বীপে শ্রীনিত্যগোপালের প্রচার হবে না—কেননা টাকা নেই …আমি বললাম আমি দেব। আমি কোথা থেকে দেব? …তবু কাজ হবে না…এই শতবার্ষিকী উপলক্ষেও নবদ্বীপে—যেখানে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন…তাঁর নাম ও তত্ত্ব প্রচার হবে না—এ তো প্রাণে সহ্য হয় না। গেছি নবদ্বীপে—বিয়েছিও টাকা যথাসম্ভব—বক্তৃতায় তাঁর কথা বলেছি। …জীবন্ত সংঘে প্রত্যেকের দায়িত্ব সমান …মৃতসঙ্ঘে যার যার ভার ভার…। নরেনকে স্নেহ করি—ঠাকুরের উৎসবের পর দিন উঠোন ঝাড় হয় নি—সে জন্য কারো মাথা ব্যথা নেই—শেষ পর্যন্ত আমিই ঝাড়ু হাতে নেই—আমি ঝাড়ু হাতে নিতে নরেন এসে আমার হাত থেকে ঝাড়ু নিয়ে উঠোন ঝাড় দিয়েছিল: …মাটি কাটাই আমার কাজ, গরু দোয়ানো নয়—আশ্রমে তা হয় না—গরু দোয়ানো না জানলেও ব্যবস্থা তো করতেই হবে—চোখ বুঁজে থাকলে তো চলবে না। …যেখানে মিলন সেইখানেই টাকা, যেখানে মিলন সেখানেই বিপদের উদ্ধার…। পায়ে খোঁচা লাগলে টিটেনাস হয় কেন?…সমগ্র দেহযন্ত্র যে একসঙ্গে, অঙ্গাঙ্গী …। বিচ্ছু বা যোগেন কেউ যেন নিজস্ব প্রয়োজন না রাখে। …প্রাণের মিলন চাই…নিজের নির্দোষত্ব প্রমাণ করলেই তো কাজটা হয়ে যাবে না? …তোমার মত কাজ হবে, না কাজের মত তুমি হবে?…আশ্রমের মত তুমি চলবে, না তোমার মত আশ্রমকে চালাবে? …কী মুক্তি যে নিত্যগোপাল আমায় দিয়ে গেছেন! আমি আস্তিকের দলে যেতে পারি, নাস্তিকের দলে যেতে পারি …কর্মীর দলে পারি, জ্ঞানীর দলে পারি,…কী অপূর্ব মুক্তি। …শিবানী বিড়ালী শুধু মাছ দুধ খেতে পারে—কি সহজ জীব! কিন্তু মানুষ সব খেতে পারে—এইখানে তো ভগবান মানুষকে গৌরবান্বিত করেছেন…কিন্তু মানুষ সাধ করে নিজের হাতে বেড়ি পরে—আমি এটা পারি, ওটা পারি না; আমি অমুকটা খেতে পারি না—এই ভাবে নিজের ক্ষুদ্র ভাল মন্দ লাগা দিয়ে নিজেকে মানুষ আবদ্ধ করে। …মানুষকে সংসার হতে হবে, সেইসঙ্গে সন্ন্যাসীও হতে হবে…। নিত্যগোপাল দিয়েছেন—সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পারেন এক মাত্র নারায়ণ। …রসিক সব রস থেকেই রস আহরণ করে…। মধুকরের মত সব জায়গা থেকে সব অবস্থা থেকে রস আহরণ করতে পারতে হবে মানুষকে।…যেখানে কাজ হচ্ছে না সেইখানে ছুটে যাবে…। প্রাণ খুলে খাট…পথ হবে…। অলসের অর্থ আদবে না। … আমি কোন চার্চ দিতে পারব না…। কোন কাজ পড়ে রইল অথচ তুমি বসে রইলে…। রুটি কে তৈরী করবে তা নিয়ে ঠেলাঠেলি হয়…এ বড় দুঃখের। প্রাণ নিয়ে থাক, প্রাণ নিয়ে চল…প্রত্যেকের ভার প্রত্যেকে নাও। …আশ্রম সেবার জন্য।…যারা সেবক, যার ত্যাগী তারা কোথায় কোন কাজ পড়ে রইল খুঁজে খুঁজে বেড়াবে। …অংশদৃষ্টি নিয়ে থেকো না…। পথ যদি কারো থাকে তাহলে বিদায় হওয়াই ভাল—যার পথ নেই সে-ই আশ্রমে থাকুক। …প্রাণস্পর্শ পেলে আজও আমি অসুরের মত খাটতে পারি…বন্ধুর বাড়ীর নিমন্ত্রণের কাজে পাতা ফেলা পর্যন্ত আমি আছি। …যেখানে ভাগাভাগি নেই সেইখানে শিব—শ্মশানে ভাগাভাগি কাড়াকাড়ি নেই—তাই শ্মশানই তাঁর স্থান…। বাইরের কাজ করবার লোকও থাকবে, গরু দুইবার লোকও থাকবে …তোমরাও আছ, আমার তো এত টাকা নেই।…কারো অসুখ হলে আমি যতটা সম্ভব তার জন্যে ব্যবস্থা করি—আমি তো পরের মত উদাসীন থাকি না। …সমস্ত যে উলোট-পালট হয়ে গেছে, যাচ্ছে—আগের দিনের বুদ্ধি দিয়ে যে আজ আর পথ পাওয়া যাবে না। পথই যদি পাওয়া যেত তাহলে এখানে কেন এসেছ? …বিশ্বাস কর আর নাই কর—জেনে রাখ এখানে ভগবান জাগ্রত—তাঁর

প্রয়োজনানুযায়ী কাজ করতে হবে। ...সংসারে রক্তের টানে কাড়া করেও মেলে, এখানে রক্তের টান নেই—সম্প্রেমের মধ্যে, নিত্যগোপালের আকর্ষণের মধ্যে অধিকন্তু ভাবে মিলতে হবে...। মিলতেই হবে... আমি প্রণামের জন্য, দীক্ষার জন্য কোন জোর করিনি, করব না...কিন্তু মিলতেই হবে। এটা যেমন মানতে হবে তেমনি আশ্রমের শৃঙ্খলা ও নিয়ম মানতেই হবে যতক্ষণ আশ্রমে আছ।...চাটে লেখা কাজ এখানে হবে না...। এটা জীবন্ত সংঘ—এই জীবন্ত সংঘে যার যার নিজের বাইরেও কাজ করতে হবে—সমস্ত কিছুর জন্য নিজেকে দায়ী বলে মনে করতে হবে।...নিত্যগোপালের কাছে প্রার্থনা কর—বুদ্ধি দাও, হৃদয় দাও।...ধরার ধূলিকে ব্রহ্মধূলি করতে হবে, ধরার মানুষকে ব্রহ্ম-মানুষ হতে হবে।...আমি মূর্খ...কিন্তু নিত্যগোপাল আমাকে সব সম্প্রদায়ে মিশবার মত প্রাণ দিয়েছেন...। আমার এখানে শক্তিত নয় কেউ—কিন্তু তাই বলে প্রাণবান হতে আটকায় কিসে?...মানুষ হও। এই সব কথা আমার অনুরোধও বটে, তোমাদের জন্য ultimatumও বটে। কেননা এ ভাবে চললে আশ্রমের ভবিষ্যৎকে তোমরা নষ্ট করবে।...যার যার বলছি আমার টাকা নেই—আমি প্রাণের দায়ে দায়িত্ব নিয়েছি।...নিত্যগোপাল, মানুষ নিয়ে ঝঞ্ঝাট আমার আর সয় না...এদের তুমি মানুষ করে দাও...লক্ষ লোকের যেন আশ্রয় হয় এটা.....অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদের মিলন অর্থাৎ পরস্পরবিপরীত দর্শনগুলির মিলনের কথা আমি বলি যেখানে...সেখানে দুই ভাইতে ছোটখাট ব্যাপারে মিলতে পারবে না?...নিত্যগোপাল, তোমার প্রয়োজনে তুমি আশ্রম করিয়েছ—তুমি প্রতিষ্ঠিত হও...। প্রতিষ্ঠিত তুমি হবেই—তুমি মাগে আর পরে।...

১, ৩, ৫৮ প্রভৃতি শনিবারে আলোচনা সভা হয়—নিজেদের ভেতরে পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা অগ্রসর হওয়ার জন্য...দোষ দর্শনের জন্য নয়...দোষদর্শনের ব্যাপার ঘটলেই সংঘ ভেঙে যায়।...তোমরা এ বিষয়ে সাবধান হও।...আজ আশ্রম ও সংঘ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলতে চাই। রাজনীতিতে অহিংস অসহযোগ বলে একটা চিন্তাধারা এসেছে। অসহযোগ হচ্ছে যেমন ইংরেজের আইন ও বিচারে আমি নেই...তুমি সুবিচার করবে না জানি...ইংরেজের শাস্তি মানি না—আমার জীবন দিয়ে প্রমাণ করব আমি নির্দোষ...। আমার জীবনই আমার ব ণী—এটা প্রতি মানুষকে বলতে পারতে হবে।...কথা কাটাকাটি তো কোন দিন করিনি—নীরবে নিন্দা অপমান সহ্য করেছি...কোনদিন আত্মপক্ষ সমর্থন করিনি—তিনবার জেলে যাওয়ার সময়ও নয়।...আশ্রমে তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলছে...এটা বন্ধ করতেই হবে। পরস্পরং বোধয়ন্তঃ ছাড়া কোন আশ্রম টিকতে পারে না, কোন আদর্শ রূপ নিতে পারে না।...আশ্রম এই সংকল্প নিয়ে করেছিলাম যে সব প্রশ্নের জবাব জীবন দিয়ে দেব।...ধারা যেন—অন্তরের আলো জ্বালিয়ে তোল।...কথা কাটাকাটি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি তোমরা কথা সংযত কর?...একটা কথা আছে—বৃন্দাবনে গেলে ডাল ও গাল সইতে হবে... বিনা তপস্যায় কিছু পাওয়া যায় না। ...বুদ্ধির বিচার এখানে আশা করো না—বুদ্ধির কূটনীতির মধ্যে আমি নেই।...আমি তোমাদের টাকার জোরে আনিনি, বুদ্ধির জোরেও আনিনি—এনেছি প্রাণের জোরে—প্রাণ দিয়ে একান্ত হয়ে আমি সবাইকে ভালবাসি—সবাইর স্বার্থ তার সাথে সেই প্রাণে একান্ত হয়ে দেখি...। শৃঙ্খলা আনতে হবে, সংযত হতে হবে...ঘুষ—চুপুরে—চলবেনা। ...সংসারে যদি মানুষ এই সব নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলত তাহলে সংসার আরও সুখের স্থান হতো।...অলসের ভগবান নাই, শান্তি নাই, অর্থ নাই।...পুরুষোত্তমের রাজ্যে বাস করতে কথা বন্ধ করতে হবে।...জীবনে আগুন নাই, এখানে থাকবে কি করে?...যে নিজের দোষ দেখে না, কেবলি পরের দোষ দেখে—সে-ই জীব।...আর একজনে দোষী প্রমাণিত হলেই কি তুমি নির্দোষ হবে? তা হয় না।...প্রতিদিন চিন্তা করবে

পরস্পরের মধ্যে ভেদ বাড়ছে, না মিলন আসছে ?··· প্রীতির বন্ধন যদি না আসে, না বাড়ে, তাহলে আশ্রমে থাকা কেন ?···বলমাইস কি বলে আমি বলমায়েসী করেছি ?···অনেক আশা নিয়ে আশ্রম করেছিলাম—দেখছি যে যেখানে ছিলে সে সেখানেই আছ ।···বার বার সাবধান করছি কথা বন্ধ কর ।···অন্যের অত্যাচার সহ্য করলেই তো ঘটনা ঘটতে দেয় না ।···নিজের বিচার নিজে করবে বৈকি, কিন্তু তোমার সিদ্ধান্তকে শেষ সত্য বলে ধরে নিওনা···নিজের জীবনের দুঃখের জন্য নিজে দায়ী —এটা বুঝতে ও মানতে পারলে নিজেকে বদলাতে পারবে। প্রত্যেকে নিজে দায়ী।···কথার মত শত্রু নেই···। তোমাদের প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, সংহতি নেই— তাহলে অনেক সহ্য করতে পারতে ।···আমি যীশুকে চিনি, সক্রেটিসকে চিনি, নিত্যানন্দকে চিনি···সহ্য করতে হবে। ···গাল দিয়েছি ?.. সইতে হবে ।···দুঃখের পথই ভগবানের পথ ।···বৃন্দাবনের পথ সকলের পায়ের নীচ দিয়ে ।··· পুলিশের লাঠি থেকে মানুষের দেওয়া অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়েছি···তবু মানুষকে ভালবাসি ।···জনসাধারণ আমাকে ভালবাসত। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির সঙ্গে আমার প্রাণের বুদ্ধি তো আলাদা তারা আমার বুদ্ধিকে সইতে পারবে কেন ? ···আমি বৈরাগী···। সাধারণ মানুষ বড়ই newsmongar ···এ সম্বন্ধে তোমরা অবহিত থাকবে । নিজেরাও এ সংবাদ সে সংবাদ নিয়ে আড্ডা দেবে না, অপরেও যেন তোমাদের মধ্যে বসে সে রকম করতে না পারে সাবধান থাকবে। বহু লোকই তো এখানে আসে—কার কি উদ্দেশ্য থাকে কে জানে ?...নিজের দুঃখের জন্য প্রথমে নিজেকে দায়ী কর···। কেন আমার এ দুঃখ এ প্রশ্ন তো কেউ করে না ? জীবন-জিজ্ঞাসা আসুক—আঘাত পেলেও অনেকের এ জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয় না। আবারও বলি আমি প্রাণের পথে চলেছি—বুদ্ধির খেলা খেলিনি . আজও প্রাণের থেকেই তোমাদের সব দায়িত্ব নিয়েছি আমাকে দুঃখ দেওয়া কি তোমাদের উচিত ?···দিনে দুবলে আমি সইতে পারি না···। জীবনের উপাসক কষ্ট পায় না, বুদ্ধির উপাসক কষ্ট পায় ।···এক সের সওয়া সের দুধ হয়, তাই আমি ভাগ করে খাই—এ কি কেউ খায় ?···সরৎচন্দ্রের সাবিত্রীর মত অপরাধ মেনে নিয়ে জীবন দিয়ে প্রমাণ কর যে তুমি নিরপরাধ···। সহ্য কর, সহ্য কর। বারোবীর ব্রহ্মচারী বলেছিলেন কলির ত্রিতাপ হল—অর্থনাশ, বন্ধু বিয়োগ, বাক্যবাণ ।···নিজের সার্টিফিকেট নিজে দাও কেন ! নিজের দুর্গতির জন্য নিজেকে দায়ী কর—এক দল তোমাদের ভাল দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর চাপকে ঘুলিয়ে দিয়েছিলাম। নরনারায়ণ আশ্রমের প্রথম শিক্ষা—নিজের দোষ দেখ। নিজের দোষ তোমরা লুকাও কিন্তু একজন সব কথাই আমার কাণে পৌঁছে দেন···নইলে এ বোকা মানুষটা কি বাঁচত ? হাসি সহ্য কর···হাসি সহ্য করেই যীশু সক্রেটিস গাড়ী বড় হয়েছেন। ক্রাসের মত পকে পড়ে যার ধাওয়া নয়—বীর্যের সঙ্গে সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে দুঃখ সহ্য করতে হবে।···নিজেকে ফাঁকি দিও না। আড়াল করো না। অকপট হও···। নিজের উদ্ধার যদি নিজে করতে পার, তাহলে আমার কাছে এসেছ কেন ? বৃন্দাবনের দুয়ারে কালী ও শিব দাঁড়ানো— তাঁদের কাছে বুদ্ধি বলি দিয়ে তারপর প্রাণ সম্বল করে বৃন্দাবনে ঢুকতে হবে বুদ্ধির খেলা শেষ করতেই হবে, বুদ্ধি পুড়িয়ে দিতেই হবে।.. যে একলা খাইবে সে সুখ পাইবে না—একথা ঠাকুর শুনিয়ে গেছেন। মানুষকে এসব কথা বলতে চাই বলেই তো আমায় দুঃখ পেতে হয়— নিজের জীবনে তা আচরণ করি বলেই বলতে চাই... মানুষের বুদ্ধি—একলা খাওয়ার বুদ্ধি—বদলাবার জন্য প্রাণপণ করেছি।·· তোমরা সম্মিলিত হও সংগচ্ছধ্বং···। ···মহাপ্রভুর কীর্তনের দলে কত প্রেম—এখানে পরস্পরের মধ্যে কি প্রেম আছে ? তোমাদের সকলের পেছনে থেকে থেকে তোমাদের কল্যাণ করবার প্রচেষ্টা কি এই বয়সে আমার পোষায় ? আমার আশা ভেঙে গেছে..। প্রত্যেককে লিখতে হবে সারাদিন কি কর···। যাক্ ··। নিত্যগোপাল আমার আশ্রম-দেবতা, নিত্যগোপাল জগন্নাথ.. আমায় তুমি আশীর্বাদ করছ...আমি জীব, আমার কতটুকু ক্ষমতা !·· এইটুকু তৃপ্তি তোমার জগতের আমি সেবা করতে চেষ্টা করেছি—ভাল খাই নি, ভাল

পারি নি.. যা কিছু অর্থ পেয়েছি তা দিয়ে মানুষের সেবা করেছি। আমাকে তুমি স্বীকার কর...। আত্মপক্ষ সমর্থন তো প্রেম নয়। রাধার নাম কৃষ্ণ কেন, কৃষ্ণের নাম রাধা কেন। নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে খুঁজো না তোমার নাম যখন মানুষ লোক করবে, তখনই তুমি প্রতিষ্ঠিত হবে।...আমি যদি তোমাদের সমর্থন করতে পারি তাহলেই তোমাদের নাম চলবে। গাছের মত আজও দাঁড়িয়ে আছি। বুদ্ধি চালালে কল্যাণ হবে না...বুদ্ধি চালাতে চাইলে পথ খোলা, চলে যাও। আমার দুঃখের জন্য আমি কাউকে দায়ী করব না..অযাচিতভাবে তাঁকে পেয়েছি, কিন্তু তাঁকে বুকে রাখতে প্রাণ তো বেরিয়ে যেতে চায়। প্রাণ যেখানে নাই, সেখানে অর্থ আসবে না...। কী যাদুমন্ত্র আমি জীবনে খেটেছি তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো পুরুষোত্তমানন্দ, এ কথা বরিশালের লোক জানত...তাই তারা আমায় নেতা করেছিল। আমি ঐশ্বর্যের পথের যাত্রী, আমি দুঃখ দিতে জানি না · আমার ঠাকুর বৈরাগী, তপস্বী—আমি স্বরাজের উপাসক ·

৩, ৩, ৪৮···আমি জ্বরের বেসাতি নিয়ে চলি, উপবাস-ক্লিষ্ট নগেন ঘড়ই যখন এসে খেতে চাইল না করতে পারি নি।···তার আত্মমর্যাদা বজায় রেখে নিজে খেটে খাওয়ার মত বুদ্ধি তাকে দিয়ে তারপর তাকে বিদায় দেব—এই ইচ্ছা ছিল। তার অভিভাবক হয়ে তার কল্যাণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে পথ পেলে না, আজ তাকে যেতে হল।···আমি কাউকে শোষণ করি নি···প্রাণপণে চেষ্টা করি মানুষকে, যারা আমার কাছে আসে তাদের, পথ চিনিয়ে দিতে। অভিভাবকহীন মানুষ কখনো পথ পায় না...। নগেনের জন্য কষ্ট হয়, তবু আমি তো প্রশ্রয় দিতে পারি না···। কৃষ্ণের পরিচয় প্রসঙ্গে কাল বলেছিলাম যে কৃষ্ণ পিতা-মাতার যত্ন তবু কম পান নি।···আমাকেও তাই তাকে যেতে দিতে হল।···অভিভাবকহীন হয়ে কি বাইরের টান সামলাতে পারবে? বাইরেটা যে ভীষণ স্থান···। যতদিন পথ চিনে উঠতে না পার, যতদিন নিজের দায় নিজে বুঝে চলতে না পারবে, আমি পাহারাদারের মত তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে চাই, পথ ভুল হলে বাতলে দিতে চাই শুদ্ধ পথ।···কিন্তু কতদিন আর আমার এ পাহারাদারের চাকরী করতে হবে? নিত্যগোপাল-পথ তোমরা বুঝে নাও।···আজকের প্রায় সব লোকই নিজের দোষ দেখে না, পরের দোষগুলি বেশ দেখতে পায়। এটা মায়াবাদের ফলে এসেছে—ব্রহ্ম নির্মল ছিলেন, মায়ার দোষে তিনি মলিন হলেন। আমার ছেলে ভাল ছিল, অপরের দোষে আমার ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেল।··· নিশিকান্ত রায়চৌধুরী বলেছেন, উদ্বোধনের মত এমন r tional পত্রিকা দেখি নি, আশুতোষ মল্লিক, ডেপুটী স্পীকার বলেছেন, এই পত্রিকাটিতে food for reflection পাওয়া গেল। নিত্যগোপালের এই কথাগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই তো বেঁচে আছি।...অভি-ভাবক বলে মানতে শেখ, পান খেতে শেখ—দেখবে নূতন ভাবে দেখা দেবে এই জীবনটাই।.. এখনকার যুবকদের থেকে আমার যৌবন এখনও বেশী আছে—যৌবন মানেই নূতন সৃষ্টির সংকল্প, প্রেরণা...অফুরন্ত আজও আমি। আমি পণ্ডিত খুঁজিনি...তোমরা পণ্ডিত না হতে পার, কিন্তু ব্রহ্ম তো—কেন সাধনাবলে সে ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে তোমরা সজ্ঞান হবে না?...সত্যি সত্যি অসুখ হলে দায়িত্ব নিতে পারি...। সকল সবলতা দুর্বলতা বলবার সাহস থাকা দরকার।··তোমরা সাবধান হয়ো. এখানে প্রকৃতি বদলাবার সাধনা···জপ দেই নি, তপ দেই নি) কিন্তু প্রকৃতি বদলাতে হবে—যে যে স্বভাবের আছ তাই-ই থেকে যাবে—অথচ বলবে তোমায় নিত্য-গোপালকে ভালবাস? ..আমার জ্বরের উপর বেদনা দিলে আমি বেশীদিন কাউকে কিছু করতে পারি না। ..লোক না থাকে না থাকুক, তবে একজন লোক থাকবে, বাতি জ্বালাবে। নিত্যগোপাল বর্তমানের সমস্ত ভাঙনের মধ্যে পথ প্রদর্শক। পথ যদি তোমরা হারিয়ে থাক পথ আছে তাঁর আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছিলাম, তোমরা নিলে না..। সময় যাচ্ছে, যদি সময় রক্ষা করতে জানা যায়। কলকাতায় বন্ধুদের টানবার মত আমার একটা সুযোগ ছিল...। এখানে এসেছি, তাঁর আশীর্বাদে মানুষ

হয়ে যেয়ো...। পৃথিবীতল লোক খারাপ হলেও তোমাকে ভাল হতে হবে। নিন্দা করে? নিন্দাকে হজম করে প্রশংসাকে ফুটিয়ে তোল।...নিন্দার চাপে তুমি দুর্বল। ...মানুষ নিন্দার ওপারে, লাঞ্ছনার ওপারে। সমস্ত মহতের জীবনে এই দৃষ্টান্ত। সকল লাঞ্ছনার উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব—বাঁচেন শ্রীমন্ত কখনও কারো কাছে মাথা নীচু করেননি...। দারিদ্র্য হজম করবার দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর, আশুতোষ মুখার্জীর বাবা। বিশ্বের পথে তোমাদের দাঁড় করাতে চাই...।

১৮, ৩, ৫৮ যুগে যুগে সকলেই প্রশ্ন করেছেন কঃ পন্থা—কি পথ? যক্ষরূপী ধর্মের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছেন, মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।... মহাজনদের মধ্যে বিরোধ···কেউ বলেন জ্ঞানের পথই পথ, কেউ বলেন ভক্তির পথই পথ।...পথ নিয়ে কাড়াকাড়ি চিরদিন চলে আসছে···পথ না চিনলে জীবন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। পথে যে দাঁড়ায় সে সব পথে যেতে পারে।···ডাঃ ভগবানদাস মহাজন অর্থ বলেছেন জনসাধারণ। কিন্তু জনসাধারণ তো সকলে এক পথে চলে না—তদুপরি তাদের ভোট তো নানাভাবেই আদায় করা যায়।··উত্তম পথ সেইটে যে পথে জগন্নাথ রথে বেরিয়েছেন···ছাপ্পান্নভোগ ত্যাগ করে তিনি পথে চলেছেন··। পথ নিয়ে পারস্পরিক নিন্দাবাদকে মিটিয়ে দিয়ে তিনি চলেছেন। এতদিন ছিল সব পথ আলাদা ...জগন্নাথ নিতাগোপাল এমন একটা পথ এঁকে দিয়েছেন যে পথে দাঁড়ালে সব পথের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়...। কামের পথ মোক্ষের পথ এতদিন আলাদা ছিল—কিন্তু নিতাগোপালের পথ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের মধ্য দিয়ে গেছে। তিনি এই জন্যই জগন্নাথ যে তিনি রাজনীতিরও নন, কর্মেরও নন,—কোন একটির নন। সেই পথে চললে অর্থ আসবে অনিবার্য, মুক্তি আসবে অনিবার্য। জগন্নাথের চলার পথ রচনা করতে হলে তো শুধু কর্মীর পথ রচনা করলে চলবে না,···জগন্নাথ তো শুধু কর্মীর নন। জগন্নাথের চলার পথ সকলেরই পায়ের তলা দিয়ে...তিনি সকলকে মিলিয়েছেন তাঁর কাছে...। তাই তো তাঁর কথা আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, সন্ন্যাসী নই,.. আমি বিশ্ববাসী বলেছেন তিনি। এই বিশ্ববাসীই মহাজন। এই বিশ্বপথে সংসারী সন্ন্যাসী রাজনৈতিক সবাই এই পথে চলবে—এ জগন্নাথের পথ। বর্তমান যুগে এই জন্যই পথ এত জটিল হয়ে পড়েছে—মানুষ কোন এক পথে চলতে পারলে আরাম পায়—কিন্তু সব পথই যেখানে আমার পথ—সেটা সহজ হলেও এ কথা কেউ জানত না বলে আজ কঠিন লাগছে। সন্ন্যাস না থাকায় সংসার বিনষ্ট হয়েছে, সংসার স্বীকার না করায় সন্ন্যাস নষ্ট হয়ে পড়েছে। নিতাগোপাল ফুটোর সমন্বয়ের পথ এনেছেন—এই-ই ব্রজপথ...এই স্থানেই আস্তিক নাস্তিক গলাগলি করে বসবে। সকলকে ডেকে নিয়ে সকলে মিলে পারস্পরিক বোঝা পড়ার মধ্য দিয়ে আনন্দ করে থাকব—নরনারায়ণ আশ্রমের এই-ই পথ। এ পথ মুক্তিক্ষেত্র, অর্থক্ষেত্র—এটা প্রীতির ক্ষেত্র...। বামন হয়ে চন্দ্র—রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা··। এই পথে চলার কৌশল প্রয়োজন কমানো..।.. মানুষের মতি স্থির নেই · আজ এ বাসে কাল ও বাসে, আজ কর্মীর জীবন, কা। জ্ঞানীর জীবন, আজ সাংখ্যের দলে, কাল বৈশেষিকের···ছ জনায় মিলে পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলি হে...নান্যদস্তীতিবাদীনঃ— এটা হল ব্যর্থ বিশ্বাসের পথ—রেষারেষি, ...ভেদাভেদের। আর ব্রজের পথ গলাগলির, কোলাকুলির। আমি কোনদিন প্রয়োজন বাড়াই নি—আমাকে যে অনেক দূর যেতে হবে...। বিজ্ঞানের চাপে মানুষ এত প্রয়োজন বাড়িয়েছে। যে ঘুমিয়ে দিন কাটায় সে শ্যামনগর যেতে বাস নেবে কেন? দেহকে একদিনে সারা ভারত ঘুরতে হয়—তিনি এরোপ্লেন ব্যবহার করতে পারেন..। সোনা চিবিয়ে যেমন বাঁচা যায় না, তেমনি চালের থেকেও চা বড় নয়। অনেক দূরের যাত্রী যারা, তাদের লাগেজ কমাতেই হবে। মানুষ ঠিক অন্নে মরে না মরে সিনেমায়, বিলাসিতায়। সুস্থ মানুষের জামা কম গায়ে দেওয়া, কম খাওয়া ইত্যাদি শিখতে হয়···, খালি পায়ে হাঁটতে অভ্যাস করতে হয়, মাটির সাথে যুক্ত থাকতে হবে, বাইরের বাতাস গায়ে লাগাতে হবে...।

আজ কাল মানুষ সহজ জীবন ভুলে গেছে··। চা, বিড়ি সিগারেট একটা জাতিকে মেরে ফেলবে। আমার যোগ্যতায় আমি মানুষের মধ্যে চলব—আমার যোগ্যতায় চলব না।··আমার থেকে মানুষ বড়।...প্রয়োজন বাড়িয়ে দিলে, তার হাতে বন্দী হয়ে গেলে আর মনুষ্যত্বের মানে কড় হওয়া ঘটবে না··। যার খাওয়া জোটে না, তাকে দুটো টাকা দাও, নিজে কম খেয়ে দুঃখ থাক। মান উন্নয়ন মানে দিনেমা দেখার সুযোগ দেওয়া নয়··। নরনারায়ণ আশ্রম এই পথ নিয়ে চলেছে। অর্থ আর পরমার্থ একত্র চালাতে হবে। এখানে অর্থ আসবে। আশ্রমে খাওয়া আছে কিন্তু সঙ্কোচের মধ্যে। বিষয়ীরা খাওয়া কেবলি বাড়ায়। দুঃখের অভ্যাস করেছি। রাস্তায় শুয়ে কাটিয়ে দেবার মত যোগ্যতা অর্জন কর··। মানুষ যদি কর্মী হয়, অনলস হয়, শরণাগত হয়, যদি প্রয়োজন কমিয়ে রাখে, ভগবান তাকে অন্ন দিতে বাধ্য··এই হচ্ছে পথ। নিত্যগোপালের সেই কথা মনে রাখ—সকল দল লয়ে আমার এক অখণ্ড দল। নিত্যগোপাল, যেখানে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মানুষ আটকে গেল, সেখানে কে তোমার অখণ্ড দলে আসবে?··

২২, ৩, ৫৮ সংসারীর ভগবান ও আশ্রমের ভগবানে পার্থক্য—সংসারী নিজের প্রয়োজনে ভগবানের নাম নেয়, আশ্রম অপ্রয়োজনেই ভগবানের নাম নেয়। ··আশ্রমে থাকতে এইটে বুঝতে হবে যে আমি আমার প্রয়োজন সাধন করবার জন্য আছি, না তাঁকে ভালবাসি বলে আছি? তাঁকে ভালবাসতে ভাল লাগে তাই তাঁকে ভালবাসি, কোন প্রয়োজনে নয়। আশ্রমে থাকতে আর একটা প্রধান দরকারী যোগ্যতা হচ্ছে অন্যকে মান দেওয়ার মনোবৃত্তি। মহাপ্রভু বলেছেন, তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—অমানী হয়ে অন্যকে মান দেবে—অন্যকে মান দিতে না পারলে আশ্রমে থাকা চলে না নিজের সমালোচনা করার যার যোগ্যতা নাই, সে যাবে বৃন্দাবনে? নিজের দোষ দেখতে শেখ।...আর একজন খারাপ হলেই তুমি ভাল তা প্রমাণিত হয় না। যদি জীবনের পথ খুঁজতে না এসে থাক, তাহলে এ পৌঁজামিলের অর্থ কি?···অর্থ দিয়ে বর্তমান সময়ের সমস্যার মীমাংসা হবে না।...আগে পথ ঠিক করতে হবে··। ঠিক পথ না হলে, এলোমেলো চললে তো জীবনে এগোতে পারবে না।... কোথায় তোমাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা? প্রথম কথা, একটু মাথা নোয়াও—গীতাঞ্জলির প্রথম গান—মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলির পরে··। এই সাধনাটা নাও যে, যত অপ্রীতিকর কথা বা ব্যবহারই হোক না কেন, আমি মেজাজ খারাপ করব না, ধৈর্য হারাব না—আমার কাজ করে যাব। সারা জীবন আমি হৃদয়ের পথে চলেছি যখন যাকে পেয়েছি তার সমস্যার কথাগুলি আমিই সব ভেবে রেখেছি—অপরে তার কথা বলবে তারপর আমি ভাবব এমন করে ভাবি নি—আমার পক্ষ আর তার পক্ষ দুটো আলাদা পক্ষই রাখি নি...। কিন্তু আজ ভয় হচ্ছে —আমার এ পথের কথা তো মানুষকে বোঝাতে পারলাম না। যখন দেখি তোমরা আমার কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাও, তখন আর থাকতে ইচ্ছা হয় না। শিশুর কথা মা বলেন, শিশুর অপমান হলে মা গর্জন করে ওঠেন। আমার ওপর তোমাদের সব সমস্যার ভার তো দিয়ে রাখতে পারতে। মানুষের কাছ থেকে আঘাত খেয়ে খেয়ে আজ মনের দিক থেকে অনেক আলগা হয়ে গেছি। আমার পক্ষের কথা তোমরা কও, তোমাদের কথা আমি কইব। আমি গেলে গীতা পড়বে কে রবিবারে রবিবারে? ···সুধাংশু, কুসুম, নীলু··প্রত্যেককেই এক একটা বিশ্বাসের জন্য ডেকেছিলাম—আমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়।... প্রত্যেকের যোগ্যতা ফুটিয়ে তোলবারই চেষ্টা করে এসেছি ··সকলের সব রকম বোঝা নিতে চেয়েছি, নিয়ে এসেছি —কিন্তু তোমরা যদি নিজেদের পথ ঠিক না কর আমি তোমাদের এ পথে সার্থক করে তুলব কেমন করে?··· আমি একটা গভীর দুঃখ নিয়ে যাচ্ছি··। আমি একলা ছুটব—আর জীবনের দিক থেকে তোমরা এগোবে না —তাহলে আমি আর কী করতে পারব? ···একটু মাথা নত কর এই একটী কথা জীবন দিয়ে বল দেবি—আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-

পন্ন বলে। সুরেশগুপ্তের সোনের বিয়েতে আমি ২০০ টাকা দেই কেন? আমি একটা সাধারণ ইস্কুল মাষ্টার? সেই প্রাণের টানে—কাউকে তো নিজের থেকে আলাদা করে দেখতে পারিনা। তার সমস্যা আমারই সমস্যা। এই অভিন্নহৃদয় না হতে পারলে, মানুষকে এমনি করে ভালবাসতে না পারলে ভগবানকে, নিত্যগোপালকে ভালবাসলাম কি? আজকালকার এত অবৈষ্ণবতার মধ্যে আমি থাকব কেমন করে? বিনয়ই যদি না শিখলে এখানে এসে হবে কি? নিজের মান নিজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করো না—পারবে না। বিশ্ব তোমায় মান দেবে—তোমার গুরু, তোমার ভগবান তোমাকে মান দেবেন। প্রহ্লাদ তো শত লাঞ্ছনা সয়েছেন, তার বাবার সঙ্গে তো তার ঝগড়া হয়নি। আমি তো টাকার জন্য আসিনি কাউকে, আমি দুঃখ সইবার জন্য এসেছি। আমার বৈরাগ্য দেখে যদি কেউ আসতে পার, তাহলে আস। মন কি আমার প্রতি সত্যি সত্যি নোয়ায়ে দিয়েছে? রসগোল্লা দিলে তো সকলেরই ভাল লাগে। কিন্তু তেতো যদি দেই? খাওয়া পরা শোওয়া—সব বিষয়ে বৈরাগ্য আনতে হবে আজ পর্যন্ত যে বুদ্ধিতে আছ, তাতে এখানের পথ খুলবে না। এখানে থেকে শেষে ভবিষ্যতের পথ না বন্ধ হয়, আমি সকলেরই পথ খোলা রেখেছি···। যদি মনে কর সংসারে পথ আছে তাহলে এখানে থেক না, যদি বোঝ সংসারে স্থান নেই, তাহলেই থেকো। আমার আশ্রম চলবেই—যিনি বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে আছি—তিনিই চালাবেন। নিত্যগোপাল পথিবৎ সংসারের পথ এঁকে দেবার জন্যেই তিনি এসেছেন।

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-প্রদত্ত ভাষণ এইখানেই শেষ হইল। ১৯৭৮ সনের ২৮শে মার্চ রবিবার রাত প্রায় ৮টায় শ্রীমৎ স্বামীজী শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের পুণ্য সমাধি মহানির্বাণ মঠে (১১৩ রাসবিহারী এভিন্যু, বালীগঞ্জ) তাঁহার জন্মোৎসব বাসরে বক্তৃতাকালীন অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ১টা নাগাদ তাঁহার জ্ঞান হয়, রাত ৩টায় তাঁহাকে পি, জি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়—ইহার পূর্বে এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় নাই। সোমবার সারাদিন সারারাত কাটাইয়া মঙ্গলবার ১লা এপ্রিল ১৯৭৮ ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে দেহ রক্ষা করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের সঙ্গে মিলিত হন।

তাঁহার এতদিনের ভাষণকে এক কথায় প্রকাশ করিলে এই ভাষায় লেখা যায়—জগন্নাথ ও জগতের প্রতি—শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের প্রতি—সেবাবুদ্ধি, সংঘবদ্ধতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও প্রীতি, শুশ্রূষা, নিয়মানুবর্তিতা, আত্মতৃপ্তি, শরণাগতি, পরশ্রীকাতরতা না থাকা, পরের সুখে সুখী হওয়া, পরের দুঃখে দুঃখ পাওয়া, নিজের দোষ দেখতে পারা, পরের দোষ নিয়ে সমালোচনা না করা প্রভৃতি প্রভৃতি।

সুকান্ত স্মরণে

॥ শ্রীগণেশ চক্রবর্তী ॥

সুকান্ত—
তুমি এসেছিলে
যুগের বার্তা নিয়ে
এক স্বল্পস্থায়ী জীবনের মেয়াদে।
কালের মেয়াদ হল শেষ
চলে গেলে বিশ্ব ছেড়ে অন্তরে,
আমাদের দিয়ে গেলে চরম বাস্তবের নিশানা।
প্রাগ্‌কৈশোরে পেয়েছিলে যুগের ইঙ্গিত,
ভবিষ্যতের ছবি ছিল দৃষ্টিতে,
তাই 'চিলে'র পরিণতি
দেখতে পেলে
মনশ্চক্ষে।

'সিঁড়ি' তার বেদনা জানিয়েছিল
তোমার সদাজাগ্রত প্রাণে।
'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি'র
তুমি ছিলে অন্তরের মানুষ।
তাই তার বুকে জমে ওঠে বিদ্রোহের আগুন।
সেই সব শক্ত শক্তিকে করে ভস্মীভূত—
যার মুহূর্তের খেয়ালে
এরা হয় ভস্মসাৎ।

সুকান্ত,—
তুমি এসেছিলে
অভিশপ্ত ভারতের
এক অপ্রত্যাশিত শুভ মুহূর্তে।
দিয়ে গেলে অনাগত ভবিষ্যতের 'পূর্বাভাষ',
অঙ্কুরিত জীবন পেল 'ছাড়পত্র'
বিশ্বাসোন্মুখ প্রাণের
পাথেয় হিসেবে।

পেয়েছি :—
আমিও পেয়েছি—
তোমার দেওয়া অমূল্য
সেই 'ছাড়পত্র'।
সানন্দে
সশ্রদ্ধ চিত্তে
গ্রহণ করলাম তোমার 'ছাড়পত্র' আর
আবদ্ধ হলাম অঙ্গীকারে
জানব বিপ্লবের আগুন
বিদ্রোহের আগুন
মানুষের অন্তরে।
বোধের উৎস হোক 'বোধন'।
শপথ নিলাম
'ঘুমনেই'—
সফলতার পূর্বাহ্নে।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নবনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

হিন্দু rational বটে, কিন্তু animality-কে সে ঘৃণা করিয়াছে। তাহারই প্রায়শ্চিত্ত সে আজ করিতেছে। Animality-র হাতে rationality-র এই লাঞ্ছনাই ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রের দেবাসুর সংগ্রামের গূঢ় তাৎপর্য, দেবতারা সব সময়েই 'লড়কে লেঙ্গে'-দের হাতে পরাজিত। আজও physical force আত্মিক শক্তিকে পরাজয় করিয়াছে। মীমাংসা ইহার নৃসিংহদেবের জীবন ও দর্শন আলোচনা-দ্বারা হিন্দুকে পুরুষোত্তম-মানুষে গড়িয়া তুলিবার জন্ত প্রেরণা দান ও প্রচার করা। যতদিন হিন্দু না নরসিংহ হইবে, ততদিন ভগবানের বিধানে কিছুতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না।···হিন্দুরই ইহাদের (প্রাণ-প্রধান ও প্রজ্ঞা-প্রধান দুইকে) সমন্বয় করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে। করিতেও হইবে তাহাকেই।···প্রত্যেকের অন্তরের নৃসিংহকে ফুটাইয়া তুলিবার বারতাই পেঁছাইতে হইবে, ইহাই হইবে আমাদের সাধনা।···হিন্দুকে একান্ত rationalaty-র উপর উঠিয়া animality সঙ্গে সমন্বয় করিয়া সহজ জীবন লাভ করিতে হইবে।···সহস্র সহস্র মানুষ পলাইল কেন? হিন্দুর সাধন-ভজন কোনও বিপদের সামনে, কোনও দৈহিক ধাক্কার সামনে দাঁড়াইবার মত বীর্য দান করে নাই। সে বড় অসহিষ্ণু, অবীর। রজোগুণ ইহাদের বিলুপ্ত; তাই এই দুর্দশা। দেহের বীর্য যে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'। বাহুর শক্তি যতদিন হিন্দুর না আসিবে, লক্ষ মণ গোলাপ জল ছিটাইলেও সমস্যার সমাধান হইবে না! বাহু বাহুই, ইহার অতিরিক্ত নয়।···হিন্দুদের কাছে animality ও rationality-র সমন্বয়ে জীবনধর্ম প্রকট করিতে হইবে।

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

একনিষ্ঠ শিল্পসাধনায়
কারিগরি দক্ষতায়
জাতীয় স্বয়ম্ভরতায়
সর্বাত্মক সেবাপরায়ণতায়
লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রয়োজনে
নিরন্তর যত্নবান
আপনার অনলস প্রতিবেশী
বাটার দোকান

Bata
Bata
Bata
Bata

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৮·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৬·০০
Soul of India Speaks	৬·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৪·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	১·৫০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	২·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·২০
বাংলার ঋষি	৪·০০
বাংলার বিপ্লবী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৭৫
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ** ১০·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ক্ষমাকে ক্ষমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবান্তর, ক্ষমিহীন ক্ষমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে। 'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches' Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১।	ব্রহ্মসূত্র [অখণ্ড ভাষ্য]	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২·০০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮·০০
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৭·০০
২।	ঈশোপনিষৎ	২·০০
৩।	কেনোপনিষৎ	৮·০০
৪।	কঠোপনিষৎ	৩·০৯
৫।	প্রশ্নোপনিষৎ	১·০৯
৬।	ঐতরেয়োপনিষৎ	·৭৫
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	২·৭৫
৮।	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৩·০০
	মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯।	শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৩·০০
১০।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	·৫০
১১।	গীতাজয়ন্তী	·০৬
১২।	উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	·৫০
১৩।	মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী-স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৩·০০
১৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
২। বঙ্গবৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি।

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

১	নারী-প্রগতির জন্মকথা	১·২৫
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিক্ষা সুধার কথা	·৩১
৩।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	স্মরণস্মৃতি শ্রীনিত্যগোপাল	·৬২
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২·০৯
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত	৩·০৫
৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৫·০০
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, (তারা—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্ম-অনাত্ম সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্বনাগরিক"

"এই বিশ্বই আমার মহামঠ"

শারদীয়া : ৩৮-১, ১৯৭৪ সম্পাদিকা : শ্বেতা মিত্র ২৭-তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিবাদন

গ্রহণ করুন।

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎকলভারত

শারদীয়া ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৪ ১৭-তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

শক্তি

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

মহেশ্বরী মহাশক্তি, পরেশী পরমাশক্তি,
হয়েছিলে রাসেশ্বরী—শ্রীকৃষ্ণের রসে।
ধ্যানে তব অধিষ্ঠান, সমাধিতে বিদ্যমান,
তত্ত্বমসি মহাবাক্য—তোমার উদ্দেশে।
তুমি তত্ত্বমসি তারা, চিন্ময়ী চিদাকারা,
সর্ব্ব অন্নের প্রকাশ—তোমার প্রকাশে।
যজ্ঞে তুমি-যজ্ঞেশ্বরী, যোগে তুমি যোগেশ্বরী
তপোময়ী হয়ে আছ—পরম তাপসে।
তুমি তপন তাপেতে, চারুচন্দ্র কিরণেতে,
মহেশের ললাটেতে—আছ মা মহেশে।
শম্ভুতে তুমি শাম্ভবী, মাধবে তুমি মাধবী,
দুরত্যয়া মহাদেবী—মায়ার বিকাশে।
নিত্যে তুমি নিত্যাশক্তি, নিত্যময়ী আদ্যাশক্তি,
প্রাণে প্রাণময়ী তুমি—প্রাণের উচ্ছ্বাসে।
তুমি পরম জ্ঞানেতে, আছ মা পরাভক্তিতে,
পরমা শান্তিতে আছ—পরম সন্তোষে।
তুমি পুরাতনী শক্তি, (কত) হও নবীনসী শক্তি,

তুমি বিশ্বেশ্বরী শক্তি—বিশ্বের (ঘরের) সকাশে।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শক্তি, শিবের শিবানী শক্তি,
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি—ব্যাপিতা বিশ্বে।
ব্যাপ্ত তুমি পৃথিবীতে, ব্যাপ্ত আছ সলিলেতে,
ব্যাপ্ত বিমল বায়ুতে—অনল আকাশে।
সর্ব্বভূতময়ী শক্তি, পার্থিবী বারুণী শক্তি,
অগ্নিতে আগ্নেয়ী শক্তি—হইয়াছ অংশে।
তুমি যে বায়বী শক্তি, আকাশেতে তুমি শক্তি,
তুমি মা মানসী শক্তি—সবার মানসে।
সত্যে সত্যবতী শক্তি, দিব্য প্রেমময়ী শক্তি,
মহাভাবময়ী শক্তি—(কৃষ্ণানন্দ) প্রেমানন্দ রসে।
পড়ি মায়ার বিপাকে, বিপন্ন জীব তোমাকে
রক্ষা কর বলি ডাকে—রক্ষাকালী ত্রাসে।
স্নেহময়ী স্নেহ গুণে, বিপন্ন জীব সন্তানে,
সান্ত্বনা কর আদরে—মধুর আশ্বাসে।
তুমি রাজরাজেশ্বরী, তুমি মা ভুবনেশ্বরী,
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে—(পুত) শুদ্ধ কর বাসে।

পূজোর কথা

। শ্রীরেণু মিত্র ।

পূজোর কথা মনে করতে আতঙ্ক হয়! মাইক আর বাতি, দাড়সজ্জা আর হৈচৈ—হয়ে গেল আমাদের আজকের দিনের পূজা! শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসা, আত্ম-জিজ্ঞাসা, আত্মনিবেদন, ব্যক্তি ও সমষ্টিভাবে পারস্পরিক প্রীতি মিলন, কল্যাণ বুদ্ধি, সুনীতি সভ্যতা সদাচার—একটা জাতির মজ্জা থেকে নিঃশেষে উবে যাওয়ার পর বাকি রয়েছে শুধু ঐগুলি। শারদীয়া পূজাকে কেন্দ্র করে ঐগুলি কত যে উৎকট আকারে প্রকাশিত হবে—সে চিত্র কল্পনা করতে আতঙ্ক হয়! অথচ এ যুগটা ছিল সব রকমে একটা মুক্ত যুগ—প্রতি মানুষের আত্মবিকাশের যুগ। সব মানুষের আত্মপ্রকাশের পথে মানুষেরই দ্বারা চাপানো যুগযুগান্তের অনেক বাধা অপসারিত হয়েছিল। অতীতের সঙ্গে তুলনায় অনেকখানি মুক্ত পরিবেশে মানুষ এসে আজ দাঁড়াতে পারত খোলা আকাশের নীচে, প্রাণ ভরে মুক্ত বায়ু গ্রহণ করে নিজেকে অভিষিক্ত করতে পারত। সকল মানুষের যার যার স্বাধ্যানুযায়ী, রুচি অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারার পথ খুলে গিয়েছিল অনেকখানি। কিন্তু এই খুলে যাওয়াটাকে, এই মুক্তিকে মানুষ কাজে লাগাতে পারল না—প্রতিক্রিয়া হিসাবে সে অবস্থাটা ঘটনা হয়ে রইল। মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার অপমান লাঞ্ছনা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে মানুষ তার হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে যতটা এগোতে পেরেছে তা যে বল এনে দিল আজ, আমাদের প্রয়োজন তারও থেকে বেশী। যারা ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যকে এনে দিল, তারা তাকে যে পথে যে ভাবে রূপ দিয়েছিল, তাতে ব্যক্তি নিজেকেই কেন্দ্র করল, সমষ্টি-কল্যাণ-বুদ্ধি তার জাগ্রত হল না। অধিক সংখ্যাকে সমগ্র ধরে নিতে মানুষের অত্যাচার বন্ধের পথ খুঁজল যারা, তাদের সে পথ দিয়ে সেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যই শুধু আবার তলিয়ে গেল না, সব কিছুর সঙ্গে মিশে অন্তর সেখানে জন্ম দিল চূড়ান্ত সুবিধাবাদকে। জন্মান না সামগ্রিকতা-বোধ, সামগ্রিক কল্যাণ-বোধ। উভয়েরই পরিণামে দেখা গেল সভ্য স্থায় নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রতি মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখবার বা তার ফুটে উঠবার সুযোগ যেদিন ছিল না, সেদিন সত্য স্থায় নীতির মানদণ্ডটা একপেশে হলেও—ছিল তবু—কিন্তু আজকের সুবিধাবাদের রাজত্বে তাদের বালাই একেবারে নাই বলা চলে।

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, আবার সমষ্টি কল্যাণ-বুদ্ধির প্রয়োজনও ততখানিই; আবার সেই সঙ্গে ততখানিই প্রয়োজন সত্য স্থায় নীতি সদাচারের। এগুলিই তো হবে মানুষী সভ্যতার ভিত্তি-ভূমি—এই ভিত্তিভূমিতে সমগ্রের কল্যাণকারী কাঠামোতে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশই হবে আজকের দিনের মানুষের সভ্যতার রূপ। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ পর্যন্ত যিনি যতখানি মানুষের মুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন—তাঁদের অবদানকে নত মস্তকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা আজ আমাদের ভাবতে হচ্ছে—ভাবতে হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার যাতে ব্যক্তিকে উদ্ধৃঙ্খল না করে, সমগ্রের মধ্যে যে সে বিধৃত এ কথা যেন সে না ভোলে, অংশেই—একটা দলই—যাতে সমগ্রের স্থান দখল না করে, সেই সমগ্রের নামে ব্যক্তির বিকাশের বা আত্মপ্রকাশের সুযোগ যাতে ব্যাহত না হয়, পারস্পরিক অভিভব বা অন্তহীন শ্রেণী-সংগ্রামই যাতে মানুষী মুক্তির রওয়ানা হওয়ার গোড়ায় না থাকে। ব্যক্তি তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ পাবে, অথচ সমষ্টি-কল্যাণকে সে আচ্ছন্ন করতে পারবে না—আর সত্য স্থায় নীতি সদাচার সভ্যতাকে ধূলাবলুণ্ঠিত করে এ যুগের কারোরই যে কোন শেষ রক্ষা নেই—কল্যাণ তো নেই, ই—এই এতখানি কথাকে প্রতি পদে স্মরণ রেখে তবে

আজকের দিনের সভ্যতাকে রূপ দিতে হবে। সে চেষ্টা —এই সামগ্রিক চিন্তাধারাকে সমাজের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টা—যতদিন না হচ্ছে, ততদিন সমাজের যে চিত্র চলছে তাকে বদলানো সাধ্যে কেমন করে? ব্যক্তি অধিকার পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হল না তার কর্তব্যবুদ্ধি, সেবা বুদ্ধি—সমাজের কল্যাণ-বুদ্ধি—তাই আজ তার অধিকারের দৌরাত্ম্যে সমাজ আচ্ছন্ন। তাই তো পূজোর নামে চলে এত শ্রদ্ধা-হীন আচার আচরণ দৃষ্টিকে ও চিত্তকে যা এত পীড়িত করে!

যাযাবরা সাধ্যতে যেমন যাযা কেটে ফেলে না— পূজো নিয়ে এত অনাচার বন্ধ করতে তো পূজোকে বেমালুম বাদ দিয়ে লাভ্যান হব না। মানুষ পুরণো অনেক কিছু ছেড়েছে, নূতন অনেক কিছু গ্রহণ করেছে —কিন্তু গোড়ায় সত্যিকারের ভালমন্দ বিচার-বোধ যদি জাগ্রত না হয়, সেটাকে বিপদী সদৃশ সজ্জিত করে সর্বত্র অপরকে আকর্ষণ করার প্রবৃত্তি যদি আমার শালীনতা-বোধকে লজ্জা না দেয়, তাহলেই আমরা তাবিজ মাদুলীতেও দেহ কণ্টকিত করি মঙ্গল পাওয়ার লোভে, আবার পিঠ আধ হাত আর নাভি পাঁচ আঙুল বের করে অশ্লীল পোষাকে আবৃত হয়ে আধুনিক হওয়ার ঘোষণা দেই। আমাদের আচার আচরণের আজ কি ছাই কোন মাথামুণ্ডু আছে, না একটার সাথে আর একটার মিল আছে? পূজা করি আমরা লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা কালীর, সত্যনারায়ণের পাঁচালীও ঘরে ঘরেই পাঠ হচ্ছে, অথচ কদর্য রুচি অশালীনতা অন্যায় অসত্য দুর্নীতি স্বার্থপরতা আমরাই চালিয়ে যাচ্ছি। তাই আজ সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বাঁচাতে আবার আমাদের ভাবতে হবে নূতন করে। সংস্কৃতি ও আবেষ্টনগত পার্থক্য কিছু আচার আচরণে থাকবে, কিন্তু তা এমন হবে না যা 'মানুষ'ত্বের মূল সত্যকে আঘাত করবে। সকলকে নিয়ে—কোন দলকে নয়—প্রত্যেক মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিবৃদ্ধির প্রচেষ্টার সত্য ন্যায় সততার ভিত্তিতে রচনা হতে হবে আজ যা-ই শুধু আজকের এই পাহাড়প্রমাণ সমস্যার সমাধান দিতে পারে। কোন ঐকদেশিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা আজ কোন সমস্যারই গভীর সমাধান দেবে না।

পূজো সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে এত কথাই ভাবনায় আসছে। ভাবনা আরও আছে। পূজো তো আজকাল আর পূজো নয়—এ হয়ে পড়েছে একটা দলগত 'ব্যাপার'। বিগত যুগে এর কারণে ছিল পুরোহিত-তন্ত্রের ব্যাপার, আজকে হয়েছে রাজনৈতিক দলের ব্যাপার। পুরোহিত-তন্ত্রও ব্যক্তির অজ্ঞানতাকে ভর করে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, আজকের রাজনৈতিক দলও ব্যক্তি স্বার্থের নামে শক্তিকে সাবড়ে রেখে তারই অর্থে সেই পুরোহিতকে দিয়েই আবার মন্ত্রোচ্চারণ করিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে সার্বজনীনতার নামে একটা প্রহসনে দাঁড় করিয়েছে। এমন পূজো এবং তার বিসর্জন-এর ব্যাপার আমরা যে চলতে দিচ্ছি—মাকে নিয়ে এই যে আমরা ছেলেখেলা করছি— তার মারাত্মক ফল পেয়েও আমরা বুঝতে পারছি না আজকের দুর্যোগ এল কোন্ পথে? বিশ্বমাতৃশক্তিকে কুপিত করেছি আমরা—তাঁকে মৃত মনে করে আমাদের খেয়াল-খুশীর উচ্ছৃঙ্খলতা চালিয়ে স্বৈরাচারের রূপে চলেছি আমরা। ধরতিত হওয়ার সময় এখনও কি আসে নি?

পূজো হোক বিশ্বমাতৃশক্তিকে ধ্যানের পথে—শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মনিবেদনের পথে—ব্যক্তি ও সমষ্টিভাবে পারস্পরিক প্রীতি-মিলন, কল্যাণবুদ্ধি সুনীতি সদাচার সততার পথে।

যেদিন আলোবাতাসের এই সুন্দর জগতে ভূমিষ্ঠ হয়ে কেঁদে উঠে নিজের অভাববোধকে ঘোষণা করেছিলাম— সেদিন থেকে দুটো আঁখি প্রতি মুহূর্তে আমাকে রক্ষা করে আসছিল, আমার অভাব পূরণ করে আসছিল। সে আঁখি দুটিতে মাতৃত্বের মায়া। মানুষ বড় হল—মাতৃত্বের দুটি একজন বিশেষের মধ্য থেকে সরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম দিনগুলিতে সেই দুটি আঁখির মধ্য দিয়ে যে মাতৃত্ব আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই মাতৃশক্তি আজও আমার রক্ষা করছেন, আজও আমার প্রয়োজন পূরণ করে আসছেন। পূজোর দিনে সেই বিশ্বমাতৃশক্তিকে, সেই চিরন্তনী আমার রক্ষা শক্তিকে ধ্যান করি, ধারণা করতে প্রয়াস পাই। তিনি আছেন, আমি তাঁর।

আমাকে কি আমিই রক্ষা করছি? সে কথা সত্যি বটে নিজেকে নিজে রক্ষা না করলে কোন ভগবানের সাধ্য নাই আমাকে রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতাতে এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। আবার তিনিই সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন আমাতে তোমার মন আধান কর, তুমি আধিমুক্ত হও, আমি তোমাকে রক্ষা করব। তাহলে দুটো কথাই সত্য—আমিও যেন আমাকে রক্ষা করি, আবার বিশ্ব মাতৃত্বও আমাকে প্রতি মুহূর্তে রক্ষা করছেন, সে কথাও সত্য। আমার দুয়ের কাছের পরিবেশের মধ্য দিয়ে সেই মাতৃশক্তিই স্ফূর্তি হয়, যেখানে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি নাগাল পায় না, সেই না-বোঝা অবোধ্যের মধ্য দিয়েও সেই মাতৃশক্তিই প্রতিনিয়ত আমাকে ঘিরে রয়েছেন, রক্ষা করে চলেছেন।

এই শক্তিকে ধারণা করতে চাইব কেন? বুদ্ধি বলে বলীয়ান মানুষ ভয় নামে যে একটা বস্তু নিয়ে জন্মেছে—সেই তার মহা বিপদ! এই ভয় ভাবতে চায় আমার কেউ আছেন—আমার জন্য যার ভাবনা আছে—তাই বাবা মা ধর্মা স্ত্রী সন্তান বন্ধু না হলে বুদ্ধিমান মানুষের শত ঐশ্বর্য যশ প্রতিষ্ঠা থাকলেও তৃপ্তি বা অভয় আসে না। বুদ্ধির বেসাতি মানুষ যতই করুক, রস-পিপাসাও তার অনন্ত এবং তা চিরন্তন সত্য। তাই এই বিরাট বিশ্বশক্তির কাছে আমি ক্ষুদ্রাদপি যতই ক্ষুদ্র হই—তবু সে শক্তি আমার কাছে একেবারে অজানা অচেনা নন, তিনি আমার পরম আপন—আমাকে রক্ষা করা, লালনপালন করা তাঁরই কাজ—আমার কল্যাণের জন্য তাঁর দুটি আঁখি সদা জাগ্রত—এ ভাবনা আমার হৃদয়কে সিক্ত করে, তৃপ্ত করে, আমাকে শান্ত করে, অভয় প্রদান করে। শিশু মানব বিপদে পড়লে প্রায় হলে মায়ের কাছে ছুটে যায়—প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ মানবের মধ্যেও শ্রান্তিতে এমনই একখানি স্নেহাঞ্চলের প্রয়োজনবোধ চিরন্তন সত্য। তবে দুর্ভাগা মানুষের যখন এই স্নেহাঞ্চলের প্রয়োজনবোধটুকু তার নষ্ট হয়ে যায়। পুজোর দিনে বিশ্ব মানুষের উপলব্ধির মধ্যে সেই স্নেহাঞ্চলের ছায়াটুকু পাই—আইতে প্রখর জীবনতাপে স্নিগ্ধতা আসে, জীবনের শূন্যতা ভরে।

আমাতেই আমার যেমন একটা স্বয়ংপূর্ণতা আছে, তেমনি আবার আমার বাইরের একটি বড় কিছুর মধ্যে নিজেকে স্থাপন করে আমি সম্পূর্ণতর হই। আমার শক্তি বুদ্ধি সেই বড়র সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও বাড়ে, আমি তৃপ্ত হই, শান্ত হই—ছড়িয়ে পড়ি। নিজেকে কেন্দ্র করেই যদি নিজেকে ছড়াতে চাই, কিংবা নিজের মধ্যেই যদি নিজেকে রাখি—দুটোতেই বিপদ আসে। এই দুই রকমের বিপদ সামলানো যাবে যখন আমি নিজেকে 'বড়'-র মধ্যে স্থাপনা করে বড় হওয়ার পথে রওনা হই। সে বড় হওয়ার অর্থ আবার প্রণিধানযোগ্য। আমরা ছোট হয়ে যাই কোথায় কেমন করে? নিজেকে যখন বিচ্ছিন্ন করে ফেলি—বিচ্ছিন্ন করি নিজেকে আমাদের আসক্তি বিদ্বেষ দিয়ে—তখনই আমরা ছোট হয়ে যাই। আমাদের ঐ আসক্তি বিদ্বেষ-জাত ভালমন্দ লাগার বাইরে যখন আমরা যেতে পারি না তখনই আমরা ছোট হয়ে যাই। এমনি করে নিজেকে ছোট করি বলেই বস্তুতঃ এ জগতে আমাদের বহু লাঞ্ছনা পেতে হয়। এমনি করে নিজেদের ছোট না করে যদি একটা বড়র মধ্যে নিজেদের প্রস্থাপন করতে পারি তাহলেই জীবন-স্রোত অব্যাহত হয়—অসহ্য পীড়নে আর পীড়িত হতে হয় না—বাধা বিপত্তি দুঃখ যতই আসুক না কেন। এই বড়র ধারণার মধ্যে নিজেকে পাওয়ার জন্য এই বিশ্ব মাতৃত্বকে স্মরণ করি।

মা কি রকম! আমাদের প্রাচীনেরা তাঁকে কি রকম ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন! একবার তাঁকে দেখছি তিনি সৌম্যাতিসৌম্যা, আবার দেখি তাঁর রুদ্র রূপ। তিনি বরাভয়, তিনি কমনীয়, আবার তিনি অসুর নিধন করার প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখেন।

তিন রকমের অসুর আমাদের ভেতর বাইরে দুদিকে প্রতিনিয়ত রয়েছে—সেই অসুরকে প্রতিনিয়ত নিধন করে প্রতিনিয়ত আমাদের এগোতে হয়। এই অসুর-নিধন তত্ত্ব মায়ের কাছে শিখতেও মায়ের ধ্যান করি। তিন দিনের পূজায় মানুষের জীবনের তিন রকমের অসুর নিধন করা হয়। সারা জীবন ধরে যা ঘটে, তাকে সচেতনভাবে তত্ত্বতঃ বুঝে নিতে, তার পথচলার ছন্দ শিখে নিতে মায়ের পূজা করি। তিন রকমের অসুর—মধু কৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ।

মধু কৈটভ হচ্ছে আমাদের ভেতরের বাইরের সু ও কু সংস্কার—যা আমাদের মনে শক্ত খোঁড় গেড়ে বসার জন্য নূতন পরিবেশ, নূতন জীবন-চেতনার আহ্বানে আমরা সাড়া দিতে পারি না। এক সময়ে যা এক দৃষ্টিকোণে সেটা সু সংস্কার, অপর দৃষ্টিকোণে বা অন্য সময়ে সেটা 'সু' নয়। অর্ধদাস ভীষ্ম রাজসভা মধ্যে শতসহস্র নর নারীর চোখের সামনে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিবাদটুকু পর্যন্ত করবার সামর্থ্য রাখেন নি—কেননা তিনি দুর্যোধন-অর্থে পুষ্ট। ভীষ্মের কাছে এ ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা উচিত বা সু বলে বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে বিপ্লবী শ্রীকৃষ্ণ এ হেন চিন্তাধারাকে মেনে নেন নি। দ্রৌপদীকেও সেদিন তিনিই রক্ষা করেছিলেন, এবং এ হেন ভীষ্মকে বধ করতে কাতর অর্জুনের যুক্তিতেও তিনিই তীব্রভাবে আঘাত হেনেছেন। অর্জুনের কাছে সু সংস্কার হল এ হেন পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করা—যুদ্ধ না করার পক্ষে বহু যুক্তির মধ্যে সে কথা তিনি বলেছেন। তাই রাজসভা মধ্যে লাঞ্ছিত অপমানিত দ্রৌপদীকে রক্ষা করার কথা সেদিনও মনে পড়ে নি, আজও তার অপমানকারীদের শাস্তি দেবার বিরোধীতাই তিনি করছেন। তাঁর সু সংস্কার-তো নারীর বেদনায় বেদনাতুর হয় না—তা পুরুষ কৌলীন্য, বর্ণ-কৌলীন্য কুল-কৌলীন্য বোধদ্বারা আচ্ছন্ন, আবৃত—তাই অর্জুনের যুক্তি বুদ্ধি রাজ রাজড়াদের দুঃখে বেদনাতুর। এই সু সংস্কারকে ভেঙ্গে পুরুষোত্তম জীবনের প্রতি পদে নূতন সংস্কার আনবার কথা বললেন। অর্জুনদের সংস্কারে স্ত্রী শূদ্র এতই পতিত যে তাদের জন্য কোন মাথাব্যথা সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের নেই। কিন্তু 'গো-গোপসংঘা-বৃত' শ্রীকৃষ্ণ সকলের—তাই সকলের জন্য সদা তৎপর তাঁর সু কু সংস্কার অন্য স্তরের।

এই রকম বহু সু কু সংস্কার ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়া জীবন্ত ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজন। সেই জন্য এই রকম সংস্কার ভাঙবার শক্তি-প্রার্থী হয়ে মায়ের পূজা করি।

মহিষাসুর বিচ্ছিন্নতার অসুর—নর নারী ধনী দরিদ্র পতিত কুলীন আমরা সব যে এক ব্রহ্ম-সূত্রে গাঁথা এ কথা ভুলিয়ে দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ-মানুষের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতারূপী অসুর মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে, একজনকে অন্য থেকে সরিয়ে আনে, মানুষে মানুষে মিলে থাকতে দেয় না, ব্যক্তিকে অহং সর্বস্ব করে তোলে। সেই অহং-সর্বস্ব মানসিকতা সমাজকে ভাঙে, অপরকে অপমান করে, অভিভব করে। এই মানসিকতা থেকে রক্ষা পেতে শক্তি চাই মায়ের কাছে। ব্যক্তির এই অহং-এর বিকৃতির রোগ থেকে ব্যক্তি নিজের জোরেই বাঁচবে—এই মহা বিশ্বে এ অহংকার থাকা রোগই। আমিও এই মহা বিশ্বেরই একটা শক্তি কণা—আমি সেই একই গোত্রের—কিন্তু বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আমির শক্তি মৃত। নূতন সুন্দর সমাজ সৃষ্টি করতে সংঘশক্তি আজ অপরিহার্য—সেই সংঘ ধ্বংসকারী মহিষাসুর নিধন করার তত্ত্ব শিখি মায়ের পূজায়। মা যে সর্বদেব শরীরজ সংঘমূর্তি—সকলের শক্তি দিয়ে মা সৃষ্টি হয়ে উঠেছেন। আমরা যদি সর্বভাবে একায় এক সংঘ তৈরী করতে পারি—তারই মধ্য দিয়ে মায়ের অসুর নিধন-শক্তি বেরিয়ে আসবে। একপ্রাণ, একবুদ্ধি, একমন সংঘই আজ প্রয়োজন—তাই মায়ের পূজা।

মানুষ যেমন সুন্দর তেমন কুৎসিৎ। মানুষের মধ্যে যত সৌন্দর্য আছে বলেই পৃথিবীটা মধুর, আবার মানুষেরই কুৎসিৎ বৃত্তির জন্য এই পৃথিবীই বীভৎস হয়ে ওঠে—আজকের সমাজে ব্যক্তিতে এই বীভৎস বৃত্তির নিদর্শন প্রকাশ। বীভৎস হয়ে উঠেছে এই জন্যই যে প্রতি মানুষই অপরকে না দিয়ে কেবল সবটুকুই নিজে নিতে চায়। সবাইকে বেটে দিয়ে এক ভাগ নিজে নেব—এ বুদ্ধি আজ নেই। সবাই চায় সব চেয়ে বেশী, সব চেয়ে ভালটুকু আমি কেন পাব না, আমার ভোগে কেন তা লাগবে না, যেমন শুম্ভ নিশুম্ভ মায়ের সরস্বতী মূর্তিকে দেখে বলেছিল এ রমণীরত্ন আমাদেরই ভোগ্য—একে নিয়ে এস। নিজের সব কিছু শুধু আমারই ভোগ্য—আমি ডাকলেই সে এসে আমার কাছে ধরা দেবে—আমার ইচ্ছাই সেখানে একমাত্র কথা—যাকে ভোগ করতে চাই, আমার চাওয়ার মধ্যে তার সম্মতি আছে কি না—অহং-সর্বস্ব ভোগী মন সে কথা ভেবে দেখবার প্রয়োজনবোধ করে না। তাই মহা সরস্বতীকে নিয়ে আসতে বলল অসুরদ্বয়। মা উত্তর দিলেন, কন্যা

যখন আমি, বিয়ে তো করবই—তবে বালো চপলতাবশত একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমাকে সংগ্রামে যে জয় করবে, আমি তাকেই পতিরূপে বরণ করব। অন্যের ইচ্ছাকে, অন্যের মতামতকে মর্যাদা দেবার মত মানসিকতা না থাকাই অস্বাভাবিক—তাই মহাশক্তিকে জোর করে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষাই তাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নিজস্ব মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদাটুকু না দিয়ে তার প্রতিবল না হয়ে তাকে গ্রহণ করা যায় না, গ্রহণ করা উচিতও নয় মায়ের উত্তরের মধ্যে সেই কথাটি—'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি'। আমার অহংকারের শক্তি দিয়েই যে বিশ্বকে ভোগ করতে পারব না—এ কথার প্রমাণ দিল অসুর শুম্ভনিশুম্ভ, মায়ের সাথে যুদ্ধে তারা পরাজিত ও নিহত হয়েছিল। তাই বিশ্বের ভোগ্য বস্তুকে তার মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করবার মানসিকতা আনতে, সব কিছুকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাকে জয় করতে মায়ের পূজা করি।

তিনদিনে মায়ের কাছে শিখলাম নূতন সৃষ্টি করার তিনটী কৌশল—পুরাতন সংস্কার ভুলে নূতনকে কাজে কাজে রূপ দিতে হয়; নূতনকে রূপ দিতে, রক্ষা করতে বিচ্ছিন্নতাদুষ্টি ত্যাগ করে সংঘবদ্ধ হতে হয়, সৃষ্ট বস্তুকে নিজের ভোগ্য করে তোলা থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়। ব্যক্তি অহংগুলি যদি এই তিন ভাবে বিশুদ্ধ হয়ে সংঘবদ্ধ হয় তাহলে আজকের দিনের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের দুর্যোগ কাটত। পূজাকে এই ভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারি যদি তাহলেই পূজা সার্থক। আমরা কবে এইভাবে পূজা করতে পারব সেই অপেক্ষায় থেকে আমরা আজ মায়ের কাছে আকুতি জানাই—তিনি আমাদের তাঁকে বুঝবার শক্তি দান করুন, পূজা ও বিসর্জনকে প্রহসন করা থেকে বিরত হওয়ার বীর্য আমরা যেন লাভ করি। আমরা যেন তাঁকে পূজা করে সৎ হই, সুন্দর হই, কল্যাণধর্মী যে শক্তি সেই শক্তির অধিকারী হই।

'তবে নারীত্বের ৪টী স্তর—নারী দাসী, কন্যা, স্ত্রী, মাতা, দেবী।... যে বাঁশ জন্মে থেকে পাইনালী না হয়, সে বাঁশে ঘুণ ধরে। তেমনি যে নারী কর্ম-জীবন (দাসী ও কন্যা) ভিত্তিক নয়, সে নারীর কামের ধাক্কায় সংসার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

বাংলার চিত্র শিল্পের আদি উৎস

। শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্তী ।

(বর্তমান প্রবন্ধ একটি শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার অংশ মাত্র। মন্তব্যাদি যুক্তিনিষ্ঠ হলেও কোথাও কল্পনার অতিরঞ্জন ঘটে থাকতে পারে। অধিকতর অনুসন্ধান পর্বে তার পরিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে।)

মানব জাতির ইতিহাসের মতই চিত্র শিল্পের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। পণ্ডিতেরা চিত্র শিল্পের ইতিহাস প্রায় চল্লিশ হাজার বছরেরো পিছন থেকে আরম্ভ করেন। মানুষের শিল্প সৃষ্টির নানা নিদর্শন আছে আদিম মানুষের বসতি গুলিতে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা তার নানা নিদর্শন খুঁজে প্রকাশ করেছেন। তার সংখ্যা যে সামান্য তা উল্লেখ না করলেও চলে।

বলেছি চিত্র শিল্পের ইতিহাস আরম্ভ প্রায় ৪০ হাজার বছরেরো পেছন থেকে। এ আর অনুমান-নির্ভর কোন খবর নয়। আবিষ্কার-সূত্র থেকে প্রতিষ্ঠিত সত্য। আদিম মানবের চিত্র-বিদ্যা ব্যবহারের নানা নিদর্শন আছে পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে। বস্তুত আদিম মানুষের চিত্র-বিদ্যা প্রয়োগের সঙ্গে গুহাগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। গুহার দেওয়ালগুলোকে তারা নির্বাচন করেছিল ছবি আঁকার জন্য। অসমান জমি, উপাদানের অভাব তাদের শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস সঙ্কুচিত করতে পারেনি। ভেবে অবাক হতে হয় এমন সামান্য উপাদান এবং উপকরণ অবলম্বনে কি করে আদিম যুগের শিল্পীরা এমন আশ্চর্য শিল্প কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। বস্তুতপক্ষে আধুনিক যুগের শিল্পীরা এই সব ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আত্মশ্লাঘা লাভ করার পরিবর্তে আপনাদের অক্ষমতায় লজ্জিত হতে পারেন মাত্র।

আদিম মানুষের ছবি আঁকার পিছনে যাদু বিশ্বাসের এক ইতিহাস আছে। যাদু বিশ্বাস আদিম মানুষের জীবন যাত্রায় অনিবার্য প্রয়োজন ছিল। যাদু বিশ্বাসের পথ ধরেই আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল ছবি আঁকার কৌশল। গুড়িন পাথর গুড়ো করে তার সঙ্গে পশুর চর্বি মিশিয়ে নিয়ে তৈরী হত তাদের রং। গাছের থেতো করে নেওয়া ডাল গ্রহণ করতো তুলির ভূমিকা। যাদু করার একান্ত আগ্রহই মানুষকে এই আবিষ্কারকের ভূমিকায় টেনে এনেছিল। এতো গেল সত্যি কথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে যাদু বিশ্বাস সুফল-দাত্রী মাতার ভূমিকা পালন করেছে। শিল্প, বিজ্ঞান এবং দর্শন যাদু বিশ্বাসের ফলশ্রুতি মাত্র।

আদিম সমাজ এবং আদিম মানুষ মাত্রেই যাদু বিশ্বাসে বিশ্বাসী। যাদু বিশ্বাস আদিম মানুষের জীবন সংগ্রামের মানসিক উপাদান বললেই কথাটা শেষ হয়ে যায় না। মানুষের চেতনায় সৃষ্টির তাগিদ যাদু বিশ্বাসের পথ ধরেই প্রকাশ পেয়েছে। আদিম সমাজে সৃষ্টির প্রবণতা যাদুর অপরিহার্যতা থেকেই এসেছে। পৃথিবীর কোন আদিম জাতিই এ বিশ্বাসের বাইরে পা বাড়াতে পারেনি। যাদু বিশ্বাস তার আত্ম প্রকাশের উৎস ভূমি। তাই চিত্রকলার ইতিহাসের উৎসে যাদু বিশ্বাসের উপস্থিতি থাকবেই। বাংলা দেশেও তার অন্যথা হবার কোন কারণ নেই।

বাংলা দেশ সমুদ্র থেকে উঠে আসা কৃষ্ণও একথা সত্য কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসের পাতায় তার প্রাচীনত্ব অবহেলার নয়। মানব জাতির বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরের ইতিকথার সঙ্গে বাংলা দেশের প্রাচীন স্তূপও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের সানুদেশে সেই

আদিমতম যুগে আদিম মানব গোষ্ঠীর জীবন-নাট্যের কয়েকটি অধ্যায় অভিনীত হয়েছিল। মানব সংস্কৃতির সেই অধ্যায়ের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আজ প্রত্নতত্ত্ববিদদের হাতে। প্লিস্টোসিন যুগ থেকে এবং তার প্রারম্ভে মানব গোষ্ঠী নির্বাচন করেছিল শুশুনিয়ার গিরি কন্দর তাদের আবাস ভূমি রূপে। পাথুরে অস্ত্র নিয়ে সেই মানব সম্প্রদায় পৃথিবীর আর পাঁচটি মানব সম্প্রদায়ের মতই জীবন অতিবাহিত করেছে। ধাপে ধাপে বিবর্তনের নিয়ম অনুসারে তাদের প্রগতি ঘটেছে, বৃদ্ধি হয়েছে পাথুরে অস্ত্রের নির্মাণ-কৌশল।

পাথুরে অস্ত্রকে যদি শিল্প কর্ম বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে তাদের আদিম বাঙালী শিল্পী বলা যায় কিনা বাস্তবিক তা ভাববার বিষয়। মানুষ কোন অবস্থার কি রকম মানসিক পরিবেশে সুন্দরের আরাধনার পথে পা দিয়েছিল তা নির্ণয় করা এক অসম্ভব কাজ। তবে মানুষ আদিমতম জীবন থেকেই নিজেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছে। কটির ভূষণ, পালকের শিরস্ত্রাণ, হাত পায়ের নখ কাটার চেষ্টা তারই ফলশ্রুতি মাত্র। হাতের অস্ত্রকে শুধু নিপুণ নয় তাকে সৌন্দর্যের মহিমা দেবারো প্রয়াস পেয়েছে।

শুশুনিয়ায় যে মানব গোষ্ঠীর পরিচয় আমরা পাই তারা কারা এবং কি তাদের পরিচয় বাস্তবিক তা অজ্ঞাত। এদের পরিচয় আরো স্পষ্ট করে তুলতে অধিকতর প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশনের প্রয়োজন আছে।

শুশুনিয়ার সানুদেশে বসবাসকারী মানুষের ছবি আঁকার চেষ্টার কোন স্বাক্ষর নেই। থাকার কথাও নয়। মানব বিবর্তন নাট্যে যে অধ্যায়ে বাহু বিকাশ থেকে চিত্র-বিদ্যার বিকাশ সে অধ্যায়ে শুশুনিয়া মানব পরিত্যক্ত। তাই প্রস্তর আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত এক শৈল ভূমি শুশুনিয়ার গুহার সংখ্যা সামান্য। অবশ্য কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে যে একাধিক পর্বত গুহা যেমন ধসে গুরে গেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তেমনি ডুবিয়ে গেছে মাটির অভ্যন্তরে। তাতে কিছুই আসে যায় না। যতদূর সম্ভব শিল্পী গুহা মানব শুশুনিয়ায় একেবারেই অনুপস্থিত।

যদিও শুশুনিয়ার একটি গুহায় চিত্রিত ছবির দৃষ্টান্ত আছে। বয়সের বিচারে তার অর্বাচীনতা প্রতিষ্ঠিত সত্য। বাংলাদেশ পাহাড় পর্বতহীন বলে এখানে গুহা চিত্রের সন্ধান পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে মানব সংসারে চিত্র শিল্পের জন্ম গুহার দেওয়াল অবলম্বন করে। অবশ্য কল্পনা করা যেতে পারে যে প্রয়োজনের তাগিদে আদিম মানব গোষ্ঠী গুহার বাইরের দেওয়াল ব্যবহার করতো। এমন কল্পনায় সুযোগ নিয়ে কোন লাভ নেই। যদিও প্রয়োজনের তাগিদে পাহাড়ের বাইরের দেওয়াল ব্যবহারের নিদর্শন একেবারে দুর্লভ নয়। আফ্রিকার তাসিলি পর্বত মালার সেই বিপুল চিত্রকলার বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে বাইরের দেওয়ালে। কিন্তু বাংলা দেশে বাইরের দেওয়ালে আঁকা ছবির আয়ু সীমিত হওয়াই স্বাভাবিক। তারপর বাংলা দেশে যে প্রচণ্ড বারায় বর্ষণ নামে তাতে তৈল চিত্রের আয়ুও কয়েকটি দশক পার হতে পারবে কিনা সন্দেহ।

শুশুনিয়ার পরের অধ্যায়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে পাণ্ডুরাজার ঢিপিতে। পাণ্ডুরাজার ঢিপি আপাতত বাংলা দেশের সর্বপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক সভ্যতার নিদর্শন। পণ্ডিত-দের মতে এর কাল খৃষ্ট পূর্ব ১৫ শত বৎসর আগে। অবশ্য অনেকে পাণ্ডুরাজার ঢিপির বয়স আরো পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে আগ্রহী।

পাণ্ডুরাজার ঢিপিতেই পাওয়া গেছে শুশুনিয়া মানুষের বিবর্তনের শেষ অধ্যায়। অবশ্য তাতে উল্লাস বোধ করার কিছু নেই। পাণ্ডুরাজার ঢিপি এ কথা প্রমাণ করে বাংলার মানুষ তখন কৃষি কর্ম আবিষ্কার করে নিয়েছে। ধানের উপস্থিতির সুস্পষ্ট পরিচয় বর্তমান। মানুষগুলি যতদূর সম্ভব হাতে গড়া ঘাস-পাতার ঘরেই বাস করতো। অবশ্য এসব খবরে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হবার কোন উপাদান নেই। কিন্তু পাণ্ডুরাজার ঢিপির মানুষ যে বহিঃ-বাণিজ্যে অভ্যস্ত তা প্রমাণিত। তাদের সঙ্গে সুদূর সমুদ্র উপকূলবাসীদের স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন। তেমনি পাওয়া গেছে একাধিক হাতীর দাঁতের ভগ্নাংশ, একাধিক মাটির পুতুল।

স্বভাবতই পাণ্ডুরাজার ঢিপি আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে তোলে।

পুরা মানবের ওহা শিল্পের পরের অধ্যায়ে যে সব উপাদান প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন তা কম কৌতূহল উদ্রেক করে না। বাস্তবিক পরবর্তী সময়ে চিত্র বিদ্যার যে স্বাক্ষর আবিষ্কৃত হয়েছে তা পাওয়া গেছে মাটির অভ্যন্তর থেকে। মাটির পাত্রের গায়ে মানুষ পরম মমতায় ছবির পর ছবি এঁকেছে। সে সব ছবিতে নকশার প্রাধান্য। কখনো বা মানুষ অথবা জীবজন্তুর আভাষ —যা আমরা মহেনজোদড়োর মৃৎ পাত্রে দেখতে পাই। এ হল নব প্রস্তর যুগের সভ্যতা যে সভ্যতা ইতিহাসের দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষকে অসংখ্য কৌতূহলের উপাদান দিয়ে বহুতর জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে দিয়েছে।

মহেনজোদড়োর সময় নির্দ্ধারিত হয়েছে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪ হাজার বছর আগে। এই নগর অবলম্বন করে যে নাগরিক সভ্যতা প্রবাহিত হয়েছিল তা নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। সব থেকে বড় কথা তাদের জীবন যাত্রা ছিল এমন সুকুমার শিল্প মণ্ডিত যা আমাদের ঈর্ষান্বিত করতে পারে। ভারতীয় চিত্র শিল্পে মহেনজোদড়োর শিল্পকলার প্রভাব এমন দৃঢ় ভাবে প্রোথিত যে আজো আমরা প্রতিনিয়ত তা অনুকরণ করে চলছি। বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মহেনজোদড়োর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংযোগ নিবিড়। পরবর্তী সময়ে এই আত্মীয়তা কতখানি নিবিড় এবং অন্তরঙ্গ তা উত্থাপিত হবে।

পাণ্ডুরাজার ঢিপির সভ্যতা মহেনজোদড়ো সভ্যতার পরের অধ্যায়। মহেনজোদড়োর সভ্যতা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল আর্যদের আকস্মিক আক্রমণে। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিতে এমনি করেই আবির্ভাব ঘটেছিল বৈদিক সংস্কৃতির। ঋটিকা আবর্তে এই সংস্কৃতি মারমুখী হয়ে ধাবিত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। অবশ্য পাণ্ডুরাজার ঢিপিতে বৈদিক সংস্কৃতির উপস্থিতির প্রমাণ নেই। ঐতিহাসিকদের মতে আর্যদের বঙ্গ বিজয় অর্বাচীন যুগের এক অধ্যায়। যদিও অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ বাংলার প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রান্ত সন্ধক্ষ তাম্র কুঠারখানিকে আর্য অভিযানের স্মারক বলে স্বীকৃতি দেবার প্রয়াস পেয়েছেন।

পাণ্ডুরাজার ঢিপিতে মহেনজোদড়ো সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও পরোক্ষ উপস্থিতির প্রমাণ আছে। এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠির সংস্কৃতিতে বৈদেশিক প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। যদিও কার কতটা প্রভাব আছে পাণ্ডুরাজার সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তা আজও নির্ণীত হয় নি। স্বভাবতই পাণ্ডুরাজার ঢিপির সংস্কৃতি আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে তোলে। অবশ্য পাণ্ডুরাজার ঢিপিতে ছবির বাস্তব প্রমাণ আমরা আশা করি না। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকরা এমন নিদর্শন আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন যা নানা দিক থেকে অর্থবহ এবং কৌতূহলজনক। বাস্তবিক প্রস্তর উপাদানের মৃৎ ফলকগুলি ছবির বাস্তব প্রমাণ না দিতে পারলেও ছবি আঁকার বাস্তব ইশারা দিতে পারে। পাণ্ডুরাজার ঢিপি হল মাটির পাত্র তৈরী এবং তামার অস্ত্র তৈরী করতে পারে এমন এক সভ্যতা। এমন এক পরিবেশে কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করে ছবি আঁকা যায় এ এক বাস্তব প্রশ্ন। বাস্তবিক মৃৎ পাত্রের শরীর ছাড়া অন্য কোন উপাদান ছিল না শিল্পীদের কাছে। তাই শিল্পীদের ছবি আঁকার জন্য মৃৎপাত্রের শরীর ছিল একমাত্র অবলম্বন একথা বললে ভুল না-ও হতে পারে। এর ফলেই তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতায় দেখা যায় চিত্রিত মৃৎপাত্র এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্যের বাহুল্য।

পাণ্ডুরাজার ঢিপির পর যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বাস্তবিক তা ঐতিহাসিক যুগের। মাঝখানে কয়েক শতাব্দী অজানা অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। বাস্তবিক বাঙলার ইতিহাস পুরোটাই আলোছায়ার জটিলতায় এখনো এক কুহক। এই কুহক যে কতদিনে অপসারিত হবে কে জানে।

এই অজ্ঞাত যুগে বাঙলার বুকে কত জাতি কত রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিল তার মোটামুটি একটা হিসাব পণ্ডিতজনেরা স্থির করে দিয়েছেন। বস্তুত পক্ষে মধ্যযুগেই বাঙালী জাতি তার নিজস্ব চরিত্র লাভ করে।

একটি জাতি যেমন বিশিষ্ট জাতীয় অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করে, তেমনি শিল্পও বহু জাতীয় শিল্পের অভিজ্ঞতার হাত ধরে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাই বাঙালীর চিত্র শিল্প অনুধাবনে বিভিন্ন জাতীয় অভিজ্ঞতার পরিচয়ের আলোকে বোঝা যাবে।

তাই চিত্র শিল্পের বিচারে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিশ্রণের ইতিহাস গুরুত্বের সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ দরকার। শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা সংমিশ্রিত হয়ে একটি বিশিষ্ট ধারা সৃষ্টি করে যা সেই জাতীয় সম্পত্তি বলে পরিচয় লাভ করে। আদিম মানব সমাজ এমনি করেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যরঞ্জিত সংস্কৃতির সূচনা ঘটায় যখন সে অন্য কোন সংস্কৃতি থেকে ধার নিতে সুরু করে। তাই দেখা যায় যে সব আদিম সমাজ অপরের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে পারেনি তারা হারিয়ে গেছে অথবা এক জায়গায় থিতিয়ে থেকে বংশ পরম্পরা একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। অন্য দিকে অপর আদিম সমাজ অপরের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে ধীরে ধীরে যেমন নিজেকে পুষ্ট করেছে তেমনি এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। যতই আদিম সমাজে এই গ্রহণের পালা চলে ততই সে আদিম অভিব্যক্তি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তার সমাজে বিকাশ লাভ করে বিশিষ্ট এক ধারা যা বিশেষ এক জাতীয় সম্পত্তি।

বাঙালীর জীবনে এমনি এক দীর্ঘ গ্রহণের পালা আছে। তার সূচনা কোন্ সময় থেকে বাস্তবিক তা নির্ণয় করা এক অসম্ভব কাজ। বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বপ্রাচীন নিদর্শনেই দেখি দূর দ্বীপ থেকে আগত মানুষের বাণিজ্য লেন দেনের প্রমাণ। বাস্তবিক এই মানুষগুলি কারা তা স্পষ্ট করে বলার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু তারা যে বাঙলার সংস্কৃতিতে নিজেদের ছাপ রেখে গেছে তা অস্বীকার করার নয়। নরনারী যুগলের যে মৃণ্ময়রূপ দুটি পাণ্ডুরাজার ঢিপিতে প্রত্নবিদরা খুঁজে পেয়েছেন তার উপস্থিতি অনেক কেই বিস্ময়াভিভূত করেছে। এ মূর্তির সঙ্গে সুদূর আফ্রিকা উপকূলের কোন দ্বীপের যোগাযোগ অনুমান করা হয়েছে। ভেবে দেখা দরকার এই মাথার উপর খোঁপার দীর্ঘ উন্নত রেখাই বিবর্তনের পথে আজকের বারা ঠাকুর কিনা।

বাংলার চিত্র শিল্প অনুধাবনে বাস্তবিক এই সব নরগোষ্ঠীর বিচার বিশেষ এক ভূমিকা পালন করে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে এই সব রক্ত ধারার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। স্বভাবতই তারা যে চিত্র-শিল্পকেও প্রভাবিত করেছিল এটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। তাই পাণ্ডুরাজার ঢিপির নিদর্শন থেকেই বাংলার চিত্র শিল্পের আরম্ভ আপাতত নির্দ্ধারণ করার সুযোগ আছে। কেননা পাণ্ডুরাজার ঢিপিতে ছবি আঁকার বাস্তব প্রমাণ না থাকলেও এবং থাকার কথাও নয়, তারা যে চিত্র বিদ্যায় অন্যান্য এক জাতি তার একাধিক ইঙ্গিত বর্তমান।

পাণ্ডুরাজার ঢিপির পরেই যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তা'হল ঐতিহাসিক যুগের, নয়তো একেবারেই ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করার মুহূর্তের। এর বেশি দূর পরিধিতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে টেনে নিয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই। বেড়াচাঁপায় মৌর্য যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির স্পষ্ট স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। সেখানকার মৃৎপাত্র এবং পোড়া মাটির ভাস্কর্যে যেমনি বৃহৎ ভারতের সঙ্গে তার সংস্কৃতি যোগাযোগ তেমনি যোগাযোগ ছিল গ্রীকদের। অবশ্য বেড়াচাঁপার আঁকা ছবির স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও তার ইঙ্গিত আরো স্পষ্টতর হয়ে ধরা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

ইতিহাস হ'ল সোপানের মত। ধাপে ধাপে সে এগিয়ে চলে আধুনিক যুগের দিকে। চিত্র শিল্পের কথা ঘুরে থাক, বাঙলার এবং বাঙলার ইতিহাসেরও প্রতিটি ধাপের পরিচয় আজো অনায়ত্ত। চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে তো এ ফাঁক এমন দুস্তর দুরান্তের যে কোন ক্রমেই অতিক্রম করার নয়। বাস্তবিক পাণ্ডুরাজার ঢিপি থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলার চিত্র-শিল্পের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস কোনদিন গড়ে তোলা যাবে না—একথা দুঃখের হ'লেও চরম সত্য।

পাণ্ডুরাজার ঢিপিতে মৃৎপাত্রের শরীরে ছবি আঁকার যে প্রয়াস শিল্পীরা নিয়েছে তাই যে বাঙালীর চিত্র শিল্পের আদিমতম নমুনা একথা বললে ভুল করা হয় না। বাঙালী চিত্রকলায় যে রীতি ব্যবহার করা হয়, যে ধারা আজো অব্যাহত আছে তার আরম্ভ এখানেই পাওয়া যাবে। স্বভাবগতভঙ্গিল এবং আঙ্গিকগত মিল এত নিকটের যে বলতে হয় পাণ্ডুরাজার ঢিপির শিল্পীই যেন আবহমান বাংলায় বার বার জন্ম নিচ্ছে।

কেমন আছেন ?

। শ্রীশান্তশীল দাশ ।

কেমন আছেন ?
এই প্রশ্ন শুনি প্রতিদিন
এর কাছে, ওর কাছে
সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলা।
উত্তর দেবার মতো কিছু নেই,
কী দেব উত্তর ?
খুঁজে পাইনাকো।

• •

উত্তর চায় কি কেউ ?
চায় না, চায় না।
শুধুই প্রশ্ন করা গতানুগতিক
অভ্যাসের বশে।
দেখা হলে কুশল জিজ্ঞাসা
এই রীতি : তাই মুখ থেকে
অজান্তেই যেন উচ্চারিত হয়
দুটি কথা : কেমন আছেন ?

• •

উত্তর চায় না কেউ, অথবা সবাই
জানে এর কী হবে উত্তর।
অপেক্ষা করে না তাই কেউ সেই
উত্তরের ; যার কোন উত্তর নেই।
প্রশ্নটি ছুঁড়েই যেন চলে যায়
যে যার আপন কাজে :
কেউ কোন উত্তরের প্রত্যাশী যে নয়।

• •

কেমন আছেন ?
প্রতিদিন শুনে শুনে শুনে
প্রশ্ন সব মূল্যহীন হয়ে গেছে।
পরিচিত শব্দ শুধু, বড় চেনা :
সারদিন ধরে
এর ওর কাছ থেকে শুনতেই হবে,
আর, শুনেও নিঃশব্দ হয়ে
জবাবটা তার প্রতিদিন
দিতে হবে—সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলা।

• •

হঠাৎ সেদিন রাত্রিবেলা
চারিধার নিঃশ্রাম নিস্তব্ধ নিশুতি :
ঘুম ভেঙে গেল সেই শব্দহীন রাতে—
বুঝি সেটা অমাবস্যা রাত ;
বিরাট আকাশখানা মাথার ওপর,
অসংখ্য তারার মালা ছড়ানো
সে আকাশের গায় :
কী সুন্দর, কী বিস্ময়কর !
সে বিরাট সীমাহীন আকাশের পানে চেয়ে
সারা মন প্রশস্ত দ্যুতিতে
ভরে গেল ; কী অব্যক্ত আনন্দ উল্লাসে
আমার সমস্ত সত্তা
সে নীরব নিঃশব্দ নিশীথে
অকস্মাৎ খুঁজে পেল
অর্থহীন সে প্রশ্নের উত্তর :
আমি আছি—এই কথা সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন
জানালো আমাকে।
অসংখ্য তারায় ভরা অসীম আকাশখানা
বাঁচালো আমায়।

স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ

॥ শ্রী সুনীতি সান্যাল ॥

অনীতা রোজকারের মতই সকালে উঠে মায়ের হাতের জোগাড় দিয়ে এক ডালা মুড়ি ও গুড় নিয়ে তার পড়ার টেবিলে পড়তে বসে গেল। অনীতার পড়বার ধরণ হল চীৎকার করে না পড়লে তার পড়ায় নাকি সুবিধে হয় না। ঘরের কাগজওয়ালা কাগজখানা হাতে দিতেই অনীতার দাদাও বাড়া মাৎ করে চীৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকে বলল, ভাগ্, খুব ত পড়া জানাচ্ছিস আর বাণীদি অর্থাৎ বাণী মজুমদার যার পড়া কাকপক্ষীও টের পেতনা এই যে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় তিনটে লেটার পেয়ে আই.এ.তে পাশ করে গেল। অনীতা টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাদার হাত থেকে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে দেখেই মায়ের কাছে ছুটে গেল, মা, দ্যাখো বাণীদি কেমন পাশ করেছেন। অনীতার মা হাসি মুখে বলে উঠলেন, তা তোরাই দ্যাখ, অমন মেয়ে কী হয়? যেন দেবীর মূর্ত্তি। কাজেকর্মে চলায় বলায় যেন মধু ঝরে পড়ছে। তেমনি বিদ্যেতেও। আর তোরা ত তার পায়ের নখের সমানও নস। মায়ের ঐ ঝাঁঝালো কথাকেও অনীতার খুব ভাল লাগল। সত্যিই ত বাণীদি কত ভাল। আর অনীতা বাণীদির যে খুব ভক্তও। মাঝে মাঝেই বাণীদির কাছে গিয়ে আই.এ. ক্লাশে পড়া অনীতা সংস্কৃত পড়ে আসত। দেখেছে বাণীদির যত কাজই থাক কেমন শান্ত স্নিগ্ধ সুরে পড়াটা বুঝিয়ে দিত। সব কিছু মিলিয়েই অনীতার কাছে বাণীদি বড় মধুর।

সবে মাত্র সমাজের ভেতরে নারীশিক্ষার প্রাবল্য ও ঝোঁক দেখা দিয়েছে। উদার সমাজপতিদের ভেতরে কেউ কেউ বিশেষ অগ্রণী হয়ে ঐ দয়াময়ী বালিকা বিদ্যালয়টীকে বাইনয় স্কুল থেকে প্রতি বছর একটী করে ক্লাশ বাড়িয়ে দশম ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়ে তুলেছেন। বাণীর গ্রুপের মেয়েরাই সর্বপ্রথম ম্যাট্রিকুলেশানের ছাত্রী। গ্রামের বিদ্বৎজনেরা সময় করে মাঝে মাঝেই ক্লাশ নিতেন। বিশ্বনাথ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছেলে ক্ষেত্রেন এম. এ. পাশ করেছে। তাকেও দেখা যেত মাঝে মাঝে নবম দশম শ্রেণীর ক্লাশ নিতে।

অনীতার বাণীদির পিতা নেই। দুটী বোন একটি ভাই। ভাইটী স্বদেশী আন্দোলনে বৃটিশের কারাগারে থেকে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে বাড়ী ফিরবার কিছুদিনের ভেতরেই রিউম্যাটিক হার্টরোগে বিছানা নিলেন। অতি কষ্টে সংসার চলে। বাণীদি আর তার ছোটবোন দুজনে মিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে যা পায় আর বিধবা মা ঠোঙা তৈরী করে দোকানে দোকানে দিয়ে যা রোজগার করেন তাই দিয়ে কায়ক্লেশে সংসার চালান।

পাড়ায় পাড়ায় সবার মুখেই এক কথা। এত ভাল পাশ করা মেয়ে কলেজে পড়তে পারলে না জানি কী বিদুষীই না হবে। কিন্তু বাণীর সংসারে ত তা স্বপ্ন মাত্র। সেদিন অনীতা তাড়াতাড়ি স্কুলে যায়—অনীতা ভেবেছে এই খবরটা সেই আগে সবার কাছে দেবে। স্কুলে গিয়ে দেখে বাণীদিকে নিয়ে মাষ্টারমশাইরা ছাত্রীরা কী আনন্দই না করছে। সবার মুখে এক কথা বাণীদি নাকি মেয়েদের পথ চলার আদর্শ। বিদ্যালয়ের সম্পাদক মশায়ও এলেন বাণীকে তার আনন্দ জানাতে। বিদ্যালয়ের প্রতি ক্লাশে মাষ্টার মশাইরা বাণীকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে মেয়েদের বলতে লাগলেন 'দারিদ্র্যের ভেতর বড় হয়েও কেমন করে লেখাপড়ায় আচার আচরণে সুন্দর হওয়া যায়—তোমাদের বাণীদি তার আদর্শ। তোমরাও বড় হবে, বাণীর জীবন-চলা অনুসরণ করবে'।

অনীতা মার কাছ থেকে বাণীদির কাছে নিয়মিত পড়বার অনুমতি আদায় করে নিল। মা ভাবলেন অস্থিরচিত্ত মেয়ে যদি বাণীর সংস্পর্শে কিছু ধীর সুস্থির হয়। অনীতার মা বিমলাদেবী যদিও অতদূর মেয়েকে পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন না, যদিও তিনি ঠিকই বুঝে রেখেছেন গায়ে একটু বড় হলেই তিনি অনীতার বিয়ে দিয়ে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হবেন, তবু গৌরীদানের সংস্কার থেকে তিনি প্রগতিগামী যুগে খানিকটা এগোতে পেরেছেন। অবশ্য রোজ রোজ পড়াবার জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে অনীতার মা মাসিক বরাদ্দও কিছু দিয়েছিলেন। এমনি করে ছাত্র-ছাত্রীরা বাণীর কাছে ভিড়তে লাগল। আর কিছুটা আয়ের পথও সুগম হল দেখে বাণী প্রাইভেটে আই. এ পড়বার সুযোগ করতে লাগল।

এরই কিছুদিনের ভেতরে বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় বাণী শিক্ষকতা করতে রাজী আছে কিনা এমন একটা সংবাদ পাঠাতে বাণী তার সাথে দেখা করল এবং জানিয়ে দিল—আপনি যদি দয়া করে আমায় কাজ দেন, তা হলে আমার ব্যক্তি জীবনের প্রয়োজন আর সমষ্টি জীবনের প্রয়োজন দুটোরই তৃষ্ণা মেটাতে পারব। সম্পাদক শ্রীহরিহরবাবু অবাক হয়ে বাণীর দিকে তাকিয়ে বলেন—সে কী কথা। তোমার সমষ্টি জীবনের কথা ত আমি বুঝতে পারছি না! বাণী সলজ্জভাবে উত্তর দেয়, দরিদ্র পরিবার আমাদের; এ কাজের মাধ্যমে তার খানিকটা সুরাহা হবে আর আমার অধিকতর জ্ঞানের পথের বিদ্যাসাধনা করবার একটু সুযোগ পাব। তারপর সমষ্টি জীবনের কথা বলছেন? দেখুন না আমার মা, আমার বাবা মারা যাবার পর আমাদের ঠিক ভাবে মানুষ করতে না পেরে কতই না বেদনা কষ্ট পাচ্ছেন; যদি তিনি লেখাপড়া করবার সুযোগ পেতেন তবে কিছুটা পথ নিশ্চয়ই পেতেন। এমনি করে আমার মায়ের মত শত শত বিধবা মা, শত শত স্বামীপরিত্যক্তা মেয়েরা আজ যে সমাজের কাছে কোণঠেসা হয়ে আছে—তাদের মত হয়ে আগামী যুগের মেয়েদের যাতে থাকতে না হয় আমি তারই ক্ষেত্র রচনার চেষ্টা করতে পারব। হরিহরবাবু স্তব্ধ হয়ে যান বাণীর কথায়। মনে মনে ভাবেন রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন কয়টী—'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবারে কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা?' তাই বুঝি এদের মত নারী সৃষ্ট হতে চলেছে।

বাণী স্কুলে কাজ পেয়েছে, স্কুলের ছাত্রীরা—তার মধ্যে বিশেষ করে অনীতা—যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছে। অনীতার দাদা অন্তরধানি ছুড়ে যেন তার বাণীদি বসে আছেন। বাণীর পরিবারের ভেতরে আর বাণীর অন্তরেও যেন একটা স্বস্তির ভাব এসেছে। রুগ্ন ভাইটিকে একটু ওষুধ-পথ্য দেবারও সুযোগ পেল, আর মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমও খানিকটা লাঘব হবে ভাবছে বাণী। তারপর নিজের জীবনে বইপত্র কিনে আই এ পরীক্ষাটা দিতে পারে তার স্বপ্নও দেখছে।

স্কুলের চাকুরী পাওয়ার পর একদিন ব্রজেন এল বাণীর সঙ্গে দেখা করতে, তার জীবনের সাফল্যও কামনা করল আর পড়বার প্রেরণাটাও দিল। যাবার সময় বলে গেল, বাণীদেবী, আপনার পড়বার জন্য যতটুকু পারি আমার সাহায্য দিতে কার্পণ্য নিশ্চয়ই করব না। ব্রজেন কলেজে প্রফেসারী করছে, বই পত্র যোগাড় করে দিতেও তার অসুবিধা হবে না জানিয়ে গেল।

মানুষের সমাজে সব রকম চিত্তবৃত্তির লোকই ত থাকে! বাণীদের পরিবারটা দুঃখ দারিদ্র্যে ঘরে গেলনা দেখে পাড়ার কারু কারুর যেন সেই দুঃখটাই বড় হয়ে উঠল। অন্যের দুঃখে দুঃখ বোধ করাটা যত সহজ—অন্যের সুখে সুখ বা আনন্দ বোধ করা কী ততটাই সহজ? না। তাই বাণী সেদিন পাড়ায় অনেকের কাছেই ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠল। বাণীর বন্ধু বহুলেও এই ঈর্ষা বস্তুটীর হাত থেকে অনেকেই রেহাই পেল না।

ব্রজেন সেদিন ওর পড়বার দুখানা বই হাতে করে যখন বাণীদের বাড়ী ঢুকল বাণীর মা মাথায় ঘোমটা টেনে সলজ্জ ভাবায় তাকে ডেকে ভিতরে বসালেন, বললেন, বাণী ত বাড়ী নেই, মেয়েদের কোন্ মহিলা

সমিতিতে রোজই প্রায় দু'এক ঘণ্টা করে গিয়ে থাকে। তার মায়ের বয়সী কতিপয় মহিলাকে অক্ষর জ্ঞান শিখিয়ে আসে আর গান্ধীজির চরকা আন্দোলনে চরকায় সুতো কাটার উদ্যম যখন ঘরে ঘরে সমিতিতে সমিতিতে খুব জোরদার চলছে—বাণীও চরকা কাটা শিখতে চেষ্টা করে। বাণী মনে মনে ভাবে—মেয়েরা এটা ও অনায়াসেই সকল কাজের ফাঁকে শিখে নিতে পারে—লেখাপড়া শেখায় বঞ্চিতা মেয়েদের ও এটা স্বাবলম্বনের পথে বিরাট যোগ্যতা, তাছাড়া ভবিষ্যৎ কালের কথাও বুঝি বাণীর মনে জেগেছে—ভাবছে যদি এমন একদিন আসে কাপড়ের মিল বন্ধ হয়ে গেল—কাপড়ের দাম আকাশ ছোঁয়া হল তখন তাদের মত মেয়েরা বুক ফুলিয়েই বলতে পারবে চাই না তোমাদের মূল্যবান শাড়ী আমরা নিজেরাই আমাদের পরিধেয় তৈরী করে নিয়েছি।

ইংরেজের কী একটা অত্যাচারের প্রতিবাদে সেদিন বস্ত্রাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের সামনে পিকেটিং করছে। ছেলেরাও কেউ কেউ এসে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে—বাণী ফুলের স্টেটের সামনে এসে আটকে গেল—ভেতরে ঢোকবার কোন সঙ্কোচ তার ভেতরে দেখা গেল না। কালপাড় একখানা শাড়ী পরা, আঁচলটা পিন দিয়ে আটকানো—ব্লাউজে হাত কনুই পর্য্যন্ত ঢাকা, সব মিলিয়ে বাণীর সুষমা মণ্ডিত অচঞ্চল মূর্তিখানি ঐ উত্তেজনার মধ্যে পড়া ছেলেমেয়েদের সামনে ভারত-নারীত্বের ছবিটী যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উকীল শশাঙ্কবাবু বিদ্যালয়ের মেয়াদ, হঠাৎ এসে সেখানে উপস্থিত হলেন, তিনি এভাবে মেয়েদের পিকেটিং-এর জোর বিরোধিতা করতে লাগলেন—অবশেষে কারুর বাকা ছাড়লেন—ছেলেরা ঘিরি ঘিরি মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে! মেয়েদের ত এই জন্যই গায়ে শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ করেছে। শান্ত বাণী সহসাই গর্জ্জে উঠেছিল, বলেছিল—আপনি যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন—আমি কী আপনার বড়ই পুরুষ মানুষ! আপনার পূর্ব্বপুরুষরা যে নীতিবাকা মেয়েদের অন্ত চলা করে গেছেন আপনি যে তার বাহক হয়ে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে বলছেন—খুব চেতনায় আপনার বোধহয় সব গোলমাল হয়ে গেছে শশাঙ্কবাবু!

ইংরেজ পুরুষোত্তম শশাঙ্ক ভট্টাচার্য সেদিন ব্রাহ্মণ তপ রোষাগ্নিতে বাণীকে ওখানেই ভস্ম করে ফেলতে পারতেন কিন্তু তা করলেন না—চোখের আড়ালকে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন—একটু একটু করে ছাকা দিয়ে দিয়ে তবে পুড়িয়ে ছাড়বেন বলে। ব্রজেন বাণীর জন্য আনা বই দুখানা টেবিলে রেখে দিয়ে বাণীর মা বিমলাদেবীর সঙ্গে নানান গল্প করতে থাকলেন একেবারে আপনজনের মত। নিজের ছেলের মত তাকে দেখতে অনুরোধও জানালেন কতবার। বাণীর কয় ভাইটীর কাছে বসে তার চিকিৎসার জন্য তার জানা বড় ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থার কথা মায়ের কাছে পাড়লেন। বাণীর মায়ের অন্তর থেকে যেন আশীর্বাণী বেরিয়ে আসে। মনে মনে বল্লেন—মানুষ না ত দেবতা! পুরুষ মানুষও যে দেবতা হতে পারে এ দৃষ্টান্ত বিমলাদেবীর চোখে এই প্রথম।

রাত ঘনিয়ে উঠা হয়ে গেল বলে ব্রজেন আর বসতে চাইলেন না কিন্তু কিসের প্রতীক্ষায় যেন মনটা নড়তেও ঠিক চাইছে না। অবশ্য ব্রজেনের এই বাণীদেবীর বাড়ীতে ঘাতায়াতের সংবাদটা ব্রজেন তার বাবার কাছে বলতে যেন কেমন একটা সংকোচ বোধ করছিল। কিন্তু কেন তার এই সংকোচ! নারী শিক্ষার অগ্রগতির যুগে একটী মেয়েকে শিক্ষার পথে সাহায্য দেবে এতে সংকোচের কী হল। না, এর মধ্যে আরও কোন কথা আছে যা নাকি ফুটে বার হতে পারছে না? শুধু অঙ্কের অনুষঙ্গের মত শরীরে মনে কেমন একটা আলোড়ন এনে দিচ্ছে?

অনীতা বাণীর কাছে পড়ে এবার নবম শ্রেণীতে বেশ ভালভাবেই পাশ করে উঠেছে। তা ছাড়া একটু বড়ও ত হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতার আবেগের ঢেউ তাকেও যেন নাড়া দিচ্ছে—আর তার ইন্ধনও পাচ্ছে ঐ বাণীদির কাছ থেকেই। ভারতবর্ষ কি বস্তু—সমগ্র বিশ্ব কি বস্তু, এই বিশ্বে এই ভারতবর্ষে মেয়েদের কি করণীয়—কোনোও শোষণ যে মানুষের জীবনে 'বেশ আছি' বলে মেনে নেওয়া কত বড় অপরাধ তা যেন বাণীদির কথায় অনীতার মনে

দাগ কাটছে। তাই সে আজকাল ইংরেজ-নিষিদ্ধ বইপত্র লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে—শরৎচন্দ্রের পথের বাণীর ভারতীয় জীবন তাকে প্রলুব্ধ করে। অনীতার মা মেয়ের এই ভাবান্তর বেশ লক্ষ্য করলেন। যে বাণীর সম্বন্ধে অনীতার মা একদিন বলেছিলেন—তোরা তো তার পায়ের নখের সমানও নস—সেই মা আজকে বাণীর কাছে মেয়ের যাতায়াত নানা ছুতোয় বন্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তা ছাড়া তিনি ত তাঁর মেয়েকে বিদুষী করবেন না। মেয়ে তার লেখাপড়ায় সুখী নয়—যদি একটু লেখাপড়া শিখলে আর টাকার জোরে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারেন তা হলেই তিনি দায়মুক্ত হতে পারেন। হিন্দুর মেয়েকে তিনি ম্লেচ্ছ ব্রাহ্ম হতে দিতে নারাজ।

রাত একটু হয়ে গেল বাণীর সেদিন ফিরতে। চরকায় সুতো কাটা ভাল রপ্ত ছিল না—তাই সময় একটু বেশী লেগেছিল সেদিন। ফেরবার পথে বাণীর দূর সম্পর্কীয়া এক কাকীমার সাথে রাস্তায় দেখা। তিনি কালীমন্দিরে বসে জপ তপ সেরে ফিরছেন—এতটা রাতে কাঁচা বয়সের সোমত্ত মেয়েকে একা দেখে তিনি আঁৎকে উঠে বললেন—একি, তুই একা এত রাত্তিরে কোথা থেকে? বাণী হেসে উত্তর দেয়, কেন? জানো না কাকীমা, মহিলা সমিতি হয়েছে তোমাদের মত কতজন এসেছেন—লেখাপড়া শিখতে, কত কিছু হয় ওখানে। আমি চরকায় সুতো কাটতে শিখেছি তোমায় একখানা কাপড় বানিয়ে দেবো, কেমন? মোক্ষদা দেবীর দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসে কালী বল মন। তার পরেই ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠেন—তোর মাকে সঙ্গে আনতে পারিস না? দু পাতা ইংরেজী পড়ে একেবারে মেম সাহেব হয়ে গেলি যে! বাণী তেমনি হেসে উত্তর দেয়, কেন কাকীমা, মা কি করে আসবেন—ভাইটী যে ঘরে বিছানায় পড়ে তা ছাড়া ছোট বোনটাও ত আছে ওকে খা-ই সন্ধ্যের পর পড়াতে বসাম—সারাদিন ওর কত কাজ থাকে—বাজার যাওয়া, দোকান যাওয়া বাইরের কাজ ত শান্তিকেই করতে হয়। আর কাকীমা, জানো, একটু লেখাপড়া শিখেছি বলেই ত একটু একটু করে বুঝতে পারছি—তোমার ঐ কালীঘাটের মত এক হাতে ঝাড়া আরেক হাতে বরাভয় এই নিয়ে রাস্তায় বেরুলে সব অসুরেরা ভয়ে পালিয়ে যাবে। কাকীমা ঠিকই বুঝলেন—অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী—যাদে কি তার বাপ ঠাকুর্দারা বলতেন পথে নারী বিবর্জিতা। আর শুনে মরে যাইগো—মেয়ে নাকি কালী হতে চায়। কী সর্বনেশে কথা গো। নিজেও ম্লেচ্ছ হতে চলেছে আর পাঁচটা মেয়েকেও তারা ছুপি করবে! তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে হনহন্ করে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলেন।

বাণী ঢুকেই দেখল তার টেবিলে দুখানা বই আর একটা ছোট চিঠি। কৌতূহলে ব্রজেনবাবুর চিঠিখানা পড়তে লাগল—লিখেছে—বাণীদেবী, আপনার প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ বসেছিলাম—বই দুখানা রইল। সময় সুযোগ মত আবার ২।১ খানা জোগাড় করে রেখ। ইতি—ব্রজেন রায়। বাণী চিঠিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে পড়ে টেবিলে রেখে দিল। মা ঘরে ঢুকে বলতে লাগল—এত রাত করে এলে পড়াশুনা কী করে হবে। ভদ্রলোকের ছেলে, তাতে বিদ্যের মর্ম বুঝেছে, তিন চারটে পাশ করেছে বলেই ত এত আগ্রহ নিয়ে তোকে পড়বার সুযোগ করে দিচ্ছে। বাণীরও যে খারাপ লাগছিল না তা ত নয়—তা শুধু কি পড়তে পেল না বলে, না আরও কিছু? কেমন যেন মনটায় ভেতরে নাড়া দিতে লাগল। বাণীর ভেতরে আরেকটী সত্তা কী জেগে উঠতে চাইছে?

বাণীর দূরসম্পর্কীয়া কাকীমা মোক্ষদা দেবীর বাড়ী শশাঙ্কবাবুর বাড়ীর পাড়াতেই। সকালবেলায় সন্ধ্যা আহ্নিকটী সেরেই তিনি বেরিয়ে পড়েন পাড়ায় সকলের খবর নিতে আর সঞ্চিত খবর পরিবেশন করতে। পাড়ায় ঢুকতেই উকীল শশাঙ্কবাবুর সাথে রাস্তায় মোড়েই দেখা। দেখেই বলে উঠলেন—কী রে শশাঙ্ক, তোদের মেয়েদের ইস্কুল কেমন চলছে। তা ছাড়া তোদের নতুন মাষ্টারনী কেমন পড়াচ্ছে! তারও আজকাল অনেক উন্নতি। মহিলা সমিতিতে গিয়ে যাদের গন্ধা প্রাপ্তির সময় হয়েছে তাদের বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছে—চরকায় সুতো কেটে দেশ উদ্ধারের কাজ করছে রাত করে বাড়ী ফিরছে—আরে বাপু

তোমরাই ত দেখছি মেয়ে জামাইটাকে রসাতলে দিতে বসেছ আর যার যা-ই হোক শত হলেও ত ও আমার শ্বশুর কুলের আত্মীয়ের সন্তান—ওর বেচাল চাল চলন ত আমায় ভাবিয়ে তুলেছে শশাঙ্ক!

প্রগতির যুগেও অনেক মানুষ আছেন যাদের বাইরের খোলসটায় প্রগতির আতরের গন্ধে ভুর ভুর করে আর ভেতরের খোলটায় ঠিক তার বিপরীত—বীটকেলে ঘামের গন্ধে ভরপুর। শশাঙ্কবাবুরও সেই অবস্থা। বাইরের জগতে তিনি প্রগতিবাদের অগ্রগামী দূত—আর ভেতরে তাঁর ঘরের মেয়েদের তিনি কঠিন হিন্দুশাস্ত্রের বাইরে এক পা-ও এগোতে দিতে নারাজ। আর বাণীদেবীর কথা মনে পড়ে গেল—সেই দিনের সেই পিকেটিং-এর কথা। মনের আগুন ত নেভেনি—আজ মোক্ষদা দেবীর কাছে থেকে কিছুটা খড়কুটো জোগাড় করে আগুনটাকে আরেকটু তাজা করে নিলেন। কিন্তু বাইরে মোক্ষদা দেবীর কাছে তা প্রকাশ করতে যাবেন কেন? বললেন—তা মাসিমা, আপনাদের যুগ ত আর নেই—বলে তার কাজে চলে গেলেন। বিদ্যালয়ের মেয়ার হিসাবে শশাঙ্কবাবুর বিদ্যালয়ের মঙ্গলামঙ্গলের একটা দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে—তদুপরি সেদিনের সেই অপমানের জ্বালা একটা সামান্য মেয়ের কাছে যে নাকি তারই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী তাকে ভাসিয়ে তুলেছে। তাই বাণীদেবীর বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ, তার চলাফেরার গতিবিধি যে শশাঙ্কবাবুর বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মেয়ে সবে পনেরোয় পড়তেই অনীতার মা মেয়ের বিয়ের জন্য মেয়ের বাবাকে ভাবিয়ে তুলতে লাগলেন। বিয়ের যোগ্য হটো একটা যে না আসছে এমনও নয়। কিন্তু অনীতার রূপের কোন জৌলুস ত ছিল না কাজেই অসুবিধা ঘটতে লাগল। পাড়ায় একটু গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে বাড়ী মজুমদারের সঙ্গ দোষে অনেক মেয়েরই চোখ খুলে যাচ্ছে—আর তার মেয়েই নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে বাণীর বাড়ী যাবেই, তা ছাড়া ফুল ত আছেই। কিছুদিন বাদে একটী পাত্র অনীতাকে পছন্দ করল বটে কিন্তু পছন্দের শর্ত হল পাঁচ হাজার নগদে, অন্যান্য যৌতুক ত আছেই, তা ছাড়া পাত্রটীকে কলকাতায় রেখে পড়ার খরচ শ্বশুর-মহাশয়ের চালাতে হবে। অনীতার বাবার অবশ্য এ সামর্থ্যটা ছিলও। আর ত কোন দায় দৈন্য নেই। অনীতার দাদা তিনটে পাশ করে কলকাতার কাছে কী একটা জায়গায় ভাল চাকুরী পেয়ে গেছে। আর এ কালো মেয়েটিকে অর্থের জোরে ত পাত্রস্থ করতেই হবে। অনীতার মা কালবিলম্ব না করে একবার যখন পাত্রপক্ষ রাজী তখন 'শুভস্য শীঘ্রম্' করার বিবাহের দিন ঠিক করে ফেললেন। সুদূর পিয়াসী অনীতার খাপছাড়া মন খাপে আটকে গেল। খবরটা অতি গোপনে সে তার বাণীদির কাছে পৌঁছতে পেরেছিল। শুভদিনে শুভক্ষণে অনীতা বধূ হয়ে শ্বশুরঘরে চলে গেল। আর তার বাবার মাসিক বরাদ্দও জামাই-এর জন্য যথাসময়ে পৌঁছাতে লাগল।

বাণীর বাড়ীতে ব্রজেনের যাতায়াত যেন আগের চেয়ে একটু একটু বাড়তে থাকে—বাণীকে 'লেসন' দেওয়ার সময়টাও যেন একটু করে দীর্ঘ হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বলেও ফেলে 'বাণীদেবী, আপনার এখানে যেন আমি আটকে যাচ্ছি, একদিন না এলে দিনটা যেন ফাঁকা মনে হয়—কিন্তু এ আটকানোটা কোথায় তা ঠিক পরিষ্কার করে ফোটাতে পারছি না। বাণী মুচকি হেসেই যেন তার সবখানি কথার জবাব দেয়। বাণীরও কি মনে হয় না ব্রজেনবাবু একদিন না এলে দিনটা ফাঁকা যায়?

দেওয়ালেরও ত কান আছে। ব্রজেনের বাণীর বাড়ীতে যাতায়াতের খবরটা ব্রজেনের বাবার কানে পৌঁছল। ব্রজেনের বাবা বেশ ব্যবসাদারি লোক—তা বিদ্যেতেও আর অর্থেতেও। বাড়ীর সকলেই তাঁকে বেশ ভয় করেই চলে। হরিহরবাবু পুত্রকে ডেকে পাঠালেন—কেননা ঐ ধরনের কথা হরিহরবাবুর কানে অনেকদিন ধরে আসছিল—বাণী মেয়ে হিসেবে যদিও অপছন্দের নয় তবুও ছেলের এভাবে ঘনিষ্ঠতার ভেতর দিয়ে কোন গোলমাল বেঁধে যায় যা নাকি আজকাল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তবে ত হরিহরবাবুর বংশের মুখে চুনকালি পড়বে যে। ব্রজেন আজ কিছুদিন হলই যথা সময়ে বাড়ীও ফেরে না, হরিহর বাবুর তাকে ডাকবার প্রয়োজনও পড়ে না। কিন্তু আজকে

হঠাৎ ডাক শুনে হরিহরবাবুর গিন্নী রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কর্তাকে বললেন—ব্রজেন ত বাড়ী এ সময় থাকে না—তাকে আবার কী দরকার পড়ল? হরিহরবাবু ছেলের ভাবান্তরের খবর মানুষের কানে কানে পৌঁছানর খবরটা খুব রাগত স্বরেই স্ত্রীকে জানালেন, বললেন, শুধু রান্নাঘর নিয়েই থেকো—সংসারের ভালমন্দের দায় ও তোমাদের নেই। তোমার ছেলের গতিবিধি লক্ষ্য করেছ?

অনীতা দীর্ঘদিন শ্বশুর বাড়ীতেই আছে। স্বামী ও কলকাতায় পড়াশুনা করছে—ছুটিতেও নাকি তার দেশে আসার সময় আজকাল হয় না। সুরেশের মামীমা আছেন—সুরেশের মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বিধবা মামীমা সুরেশকে মানুষ করে তুলেছেন। সেই সুরেশের এই কালো কুচ্ছিৎ বউ—এ যে মামীমার বড়ই অসহ্য। তিনিই নাকি সুরেশকে বলে দিয়েছেন—শ্বশুরের টাকায় কলকাতায় থেকে ফুর্তি করবি। ঐ ছিরির মেয়েকে উদ্ধার করেছিস এই না কত। তাই বলে কী ওকে নিয়ে তোর সারাটা জীবন নষ্ট করবি! অনীতা আঁৎকে ওঠে—আমাকে নিয়ে নষ্ট জীবন? অনীতার জীবনে কি এতটুকুও সৌন্দর্য্য নেই! রূপের জৌলুস দিয়ে জীবনের মাপকাঠি! অনীতা তার সারাজীবনের চলার পথের ভাবনায় অস্থির হয়ে যায়। লেখাপড়া শেখা তার ঘটেনি—জীবনে কোন বিপর্য্যয় এলে চলার ছন্দের খবর তার বাপীদির কাছ থেকে যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছিল, তাতেই আজকে তার জীবনটাকে সুন্দর করে চালাতে পারবে না ভেবে সে অস্থির হয়ে উঠল। বছর তিনেক বাদে শোনা গেল অনীতার স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করে কলকাতার কোন একটা জায়গায় বাসা ঠিক করে সেখানেই আছে। অনীতার শ্বাশুড়ী অনীতাকে মনের সাধে গালাগালি দিয়েও সাধ মেটাতে পারেন না—বলেই সবেন অমন রূপ নিয়ে জন্মেছ তা গলায় দড়ি জোটেনি? অনীতা উত্তরে বলে—দড়ি জুটলে ত আপনার ছেলের কলকাতায় থেকে পড়াটিও হত না হয়ত, যা—বলেই খেমে যায়। পাড়ার লোকে সুরেশের মামীমার দুঃখের কারণ এতদিনে বুঝতে পারল—কেননা মামীমা—স্বর্ণময়ী দেবী—বলে বেড়াতে লাগলেন—সাধে কী ছেলে আমার প্রবাসী হল? ঐ অপয়া মেয়ের কি স্বামীর দিকে কোনও ভক্তি আছে? রবি ঠাকুর, শরচ্চন্দ্রের নাটক নভেল পড়ে পড়ে মেয়ে মানুষও যে মানুষ এ নিয়ে আমার সাথে তার বড়তা চলে। এখন বোঝ মানুষগিরি কোথায় থাকে!

হঠাৎ একদিন শোনা গেল অনীতা রাতের অন্ধকারে পালিয়েছে। একজন যুবতীর পক্ষে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালান যে কী দুঃসাহস—তা অনীতার বিধাতা পুরুষই সেদিন শুনেছিলেন।

ব্রজেনের প্রতি কাজের ভেতরে আজকাল কেমন একটা অন্যমনস্কতা—যে কোন কাজের ভেতরে বাণীর মূর্তিখানি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বাণী যেন তার সকল সত্তায় টান ধরিয়ে ফেলেছে। ব্রজেন একদিন বাণীর কাছে তার মনের কথা পাড়ে। বাণীদেবী, আপনি কি আপনার জীবনের নতুন ছন্দের কথা ভাবেন? বাণী ঠিক ধরতে পারে না—আপনি কোন্ ছন্দের কথা বলছেন ব্রজেনবাবু? ব্রজেন জড়তা মাখানো ভাষায় উত্তর দেয় অর্থাৎ আপনার বিয়ের কথা? আমার বিয়ে? আমার বিয়ে করবে কে? তার ভার যদি আমিই নিই—ব্রজেন আবেগের কণ্ঠে বলে ফেলে। বাণী উত্তর দেয়—ধনী আর শিক্ষিত পরিবারের ছেলে আপনি, তাছাড়া আপনিও উচ্চ শিক্ষিত। আমার মত পরিবারের মেয়ে আপনাদের ঘরে স্বমর্য্যাদায় প্রবেশ করবার মত মনোবল আপনার হবে? ব্রজেন দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দেয় সে তার তাই।

শশাঙ্কবাবু বিদ্যালয়ের কী একটা প্রয়োজনের ছুঁতোয় বাণীর বাড়ীতে ঢুকতেই দেখেন ব্রজেন বাণীর বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। ব্রজেন শশাঙ্কবাবুর মুখোমুখী পড়ে যায়। শশাঙ্কবাবু ত এইটাই চাইছিলেন। আসল প্রয়োজন মিটিয়ে বাণীর সাথে দু চারটা কথা বলে সোজা হরিহর-বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

অনীতা শ্বশুরঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী স্থান নিয়েছে বটে কিন্তু বাপের স্নেহ বাণী আর প্রতিবেশীর কটাক্ষ দৃষ্টি তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যে কোনও অবস্থায়ই যে

বিবাহিতা নারীর স্বামীর ঘর 'স্বর্গ' সমান—এ হিতোপদেশ তার উপরে বর্ষিত হওয়ার বিরাম নেই। অনীতার দাদা তার ছেলের অন্নপ্রাশনে বাড়ী এসে দেখে অনীতার এ পাপের প্রায়শ্চিত্তে প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন তার মা বাবার জীবনও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। অনীতার দাদা অনীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রপুরে তার চাকুরীস্থলে চলে যায়। অনীতার দাদা অনীতাকে আর ছোট করে দেখতে রাজী নয়। তাই একটু একটু করে অনীতাকে অন্তত ম্যাট্রিকুলেশনটা পাশ করাবার প্রচেষ্টায় লেগে যায়।

হরিহরবাবু ছেলের মুখের থেকেই জানতে পারলেন ব্রজেন বাণীকে বিবাহ করতে চায়। ছেলের এই ঘৃণিত রুচির জন্য যেন আকাশ থেকে পড়লেন—তারই বংশে প্রেম করে বিয়ে করা! এ হরিহরবাবু প্রাণ থাকতে রাজী নন। তা ছাড়া সমাজ আছে ত! যার যা ঠোঙা তৈরী করে সংসার চালাত এতদিন—তারই মেয়ে আসবে হরিহর-বাবুর ঘরে? আর বাণী! একটু বিদ্যেতেই এত সাহস? হরিহরবাবু স্থির করে ফেললেন—পুত্রের বিবাহ তিনি দেবেনই কিন্তু বাণী হতে পারবেনা তার পুত্রবধু। প্রগতির হাওয়া বাইরেই থাকা ভাল—অন্দরে ঢুকলেই অন্দর মহলের ভিৎ যে ধসে যাবে।

বাণীর বাড়ীতে যে সব ছাত্রীরা পড়তে আসত আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে সবারই পড়া বন্ধ হয়ে গেল বাণীর কাছে—বিদ্যালয়েও বাণী আগের মত কারো কাছ থেকে সম্ভ্রম ব্যবহার ত পায়ই না—বরং সবাই যেন একটু ঘুরে ঘুরে থাকে। মাঝে মাঝে শোনা যায় দয়াময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে কে বা কারা খুব ঢিল ছুঁড়ছে। কথাটা শশাঙ্ক-বাবু প্রমুখ মেম্বারদের কানে পৌঁছায়। মোক্ষদা দেবীর কানে কি আর গেল না? তিনি বিদ্রূপ করে ত বলেই ফেলেন, কালী-হওয়া বাণীর ডাকিনী যোগিনীরা কি ঢিল ছুঁড়ছে? এটা পরিষ্কার বোঝা যেতে লাগল যেদিন বাণী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে সেদিন কোন ঢিল পড়ে না—বাণী স্কুলে গেলেই অদৃশ্য হাতের ঢিল আসতে থাকে। এতে কর্তৃপক্ষ থেকেও কোন প্রতিকারের বাস্তবতা দেখা যায়নি।

ব্রজেনের বন্ধুরা যাদের কাছে বাণীদেবী ছিল ঈর্ষার বস্তু তারাও ব্রজেনকে পরম বান্ধবের মত উপদেশ দিতে লাগলো। আরে ব্রজেন, যে মেয়ে বিয়ের আগেই তোমার সাথে প্রেম করে বসল সে যে বিয়ের পরেও অন্য কারু সাথে আবার প্রেমে পড়বে না—এর কোন গ্যারান্টী আছে? জানো না শাস্ত্রে বলেছে—নারী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়? তা ছাড়া তোমাদের বংশে ঐ ঠোঙা বিক্রেতার মেয়ে বধূরূপে আদবে? ব্রজেন কি তার সংকল্পকে তার পরিবার সমাজের কাছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে শেষ পর্যন্ত স্থির রাখতে পেরেছিলো? পারে নি ব্রজেন—তাই রাতের অন্ধকারে একদিন বাণীর বাড়ীতে ঢুকে তার কর্তব্যের কথা বাণীকে না জানিয়ে পারল না। বাণী ত আর তার কাছে ভিখিরীর মতো প্রেম নিবেদন করতে আগে পা বাড়ায়নি—ব্রজেনই ত আগে অগ্রণী হয়েছিল। এখন পেছোবার বেলাতেও ব্রজেনই অগ্রণী হল। বাণী একটি মাত্র কথা শুধু বলেছিল—তাহলে আপনি দেখছি মাটীর পুতুল! লেখাপড়া শিখে-ছেন বটে—কাজে ভালই করেছেন আপনি—আমাকে ভালবেসে আমার চাকুরীক্ষেত্রে বেড়া দিয়ে দিয়েছেন—আপনার ভালবাসায় সমাজের আর দশজনের সহানুভূতির পরিবর্তে নিন্দের ধলি বোঝাই করিয়েছেন। কিন্তু তবু জানবেন ব্রজেন বাবু, এ বিয়ে বাণীর সকল পথ রুদ্ধ করে এমন সাধ্য কারো নেই। আমি বিশ্বাস করি এ বিশ্বটা closed circle নয়। যার পথ আপনার পিতা, শশাঙ্ক-বাবু প্রমুখদের দ্বারাই শুধু বন্ধ নয়। আপনি আপনার উপযুক্ত, আপনার বংশের উপযুক্ত ঘরেই বিয়ে করুন। এই বলে বাণী ব্রজেনের সামনের থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিলো।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর কেটে গেছে—রামচন্দ্রপুরে অনীতার দাদার সহায়তায় বাণী যে স্থানিক জমি স্কুল বাবদ পেয়েছিল—ছোট সেই স্কুলটার আজ আর দশটা স্কুল থেকে পার্থক্য আছে বৈকি! কল্যাণী সংঘ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা বাণী মজুমদারের শিক্ষা দেবার পদ্ধতি স্থানীয় ও আশে পাশের চিন্তাশীল মানুষদেরও মুগ্ধ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃত হাওয়া বাণী-মজুমদারের বিদ্যালয়ের

চক্রে এখনও ঢুকতে পারেনি। বিদ্যালয়ের চক্করের একাংশে ছোট চালাঘরে সম্পাদিকা তার থাকবার স্থানটুকু ঠিক করে নিয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের চরকার সুতো দিয়ে বাণী পরিধেয় আর ছাত্রীদের তৈরী সাবানের শাক-সব্জীর বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে সামান্যতম প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নেয়। বাণীর ছোট বোনটীর মেদিনীপুরের বেতিয়া-গ্রামে পাড়ার নিতাই সাহার সহায়তায় বহুদিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। বাণীর মা আর কয় ভাই আর বেঁচে নেই। বাণী, সেই বাণী, কল্যাণীসংঘ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা বাণী মজুমদার নিজের পিতার ভিটেতে সরকারের সাহায্য নিয়ে তার ভাই এর নামে "অশোক মেমোরিয়াল" হাসপাতাল গড়ে তুললেন। হাসপাতালের ভার তাদের পাড়ার নিতাই সাহার ছেলে সুবল সাহার উপর ভার পড়ল।

অনীতার জীবনের লালসা বাণী তার শত কাজের ভেতরেও একদিনের জন্যও ভুলতে পারে নি। এ যে তার জীবনের গোড়াতেই স্বপ্ন ছিল—তার মা মানুষের মর্যাদায় বাঁচার সুযোগ পাননি—তাই মায়ের এই প্রতিটাকে মানুষের মর্যাদায় বেঁচে থাকার উপায় ও মন্ত্র তাকে যে শোনাতেই হবে। তাই অনীতার ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাশের পরেই সেদিন যেমন করে ছোট অনীতা তাকে আনন্দ জানাতে গিয়েছিল বাণীও তেমনি করে অনীতার সামনে উপস্থিত হল তাকে আনন্দ জানাতে। অনীতা তার হারিয়ে যাওয়া বাণীদির কাছে জীবনে চলবার বাণী আবার নতুন করে শুনতে পেল। অনীতা নার্সিং পাশ করে—"অশোক মেমোরিয়াল"-এ বাণীর চেষ্টাতেই নার্সিং-এর কাজ পেয়ে আর্তের সেবা করে তার পরমুখাপেক্ষিতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরে নিজেকে সার্থক মনে করতে লাগল। কিন্তু তার বাণীদির সেদিনের কথাও সে এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেনি—কাজ পাবার পর বাণী অনীতাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল—অনীতা, তুমি কিন্তু শুধু চাকুরীই করো না—ভুলে যেও না জীবনে একদিনের জন্যও যে, তুমি সেবাব্রতী হয়েছ, শুধু চাকুরে নও। এটা জেনে রেখো, যদি শুধু নিজের সুখের জন্য সেবাব্রত তোমার হয়—তবে সেবা কথাটির অর্থ বদলে যাবে। তোমার জীবনে আমি সেবিকা রূপটাই দেখতে চাই—বাণীর এই কথাকে অনীতা সত্যিই রূপ দিতে পেরেছিল। স্থানীয় জনসাধারণের কত কত রোগী যে তার স্নেহস্পর্শে প্রাণ পেয়েছিল তার সংখ্যা নেই। আর অনীতা ত শুধু নিজেই সার্থক সেবিকা হয়েই তৃপ্ত ছিল না—আর যারা ঐ হাসপাতালের তাদেরও সে এমনি করেই সেবার পথে টেনে এনেছিল।

গ্রামের অতি বৃদ্ধা-বৃদ্ধের দল, বাণীর সমবয়সীর দল গ্রামের ভেতরে আদর্শ হাসপাতাল পেয়ে বলাবলি করতে থাকে—বাণীর মা গর্ভগতা না হলে কি আর এমন মেয়ে হয়—পিতৃ-মাতৃকুলের মুখ উজ্জ্বল করা মেয়ে—অনীতা শোনে আর মনে মনে ভাবে অতীত আবার বর্তমান হয়! এই বাণীদি একদিন তাদের গ্রামের বিদ্যালয়ের স্ত্রী শিক্ষার অগ্রণী বলে পরিচিতা হয়েছিলেন, আবার তাদেরই বার্থত্বে বাণীদি গ্রাম-ছাড়া হয়েছিলেন—আবার সেই বাণীদির মহিমা সকলের মুখেই ধ্বনিত হল। অনীতা ভাবে আর আনন্দে গরবে তার বুকখানা ভরে ওঠে।

এ দিকে প্রফেসর ব্রজেন রায়ের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ বছর কেটে গেছে। একটি মাত্র মেয়ে ললিতা কলেজে পড়তে পড়তেই তারই মামাতো ভাইকে বিয়ে করে মা-বাবা আর অতি বৃদ্ধ দাদু হরিহরবাবুদের ছেড়ে চলে গেলে জ্ঞানবৃদ্ধ হরিহরবাবু "কালস্য কুটিলা গতি" বলে নিজেকে খানিকটা আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু ব্রজেন রায় তারপর থেকেই ধীরে ধীরে রোগশয্যায় গেলেন পড়ে। ব্রজেন রায় রোগশয্যায় শুয়ে পড়ে ভাবেন সেই অতীত দিনের কথা—সেদিন যে শক্ত বেড়া আমি ডিঙাতে পারিনি আজ সেই বেড়া আমারই মেয়ে শুধু ডাঙলই না, তাকে গুড়িয়ে চূর্ণ করে দিয়ে গেল।

ব্রজেন রায়ের অবস্থা ক্রমশই জটিল হতে লাগল। অবশেষে তারই ইচ্ছায় তার শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল বাণীর হাতে গড়া "অশোক মেমোরিয়ালে"। অনীতার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়ে বাণী এসেছিল—নিজ হাতে সেবাও করেছে সে ব্রজেনবাবুর। মরণের দ্বারে এসে

শিক্ষিত ব্রজেন এটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে, যে আকর্ষণের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাণীকে একদিন রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল— সেই আকর্ষণেরই কি মহান মূর্তি নিয়ে বাণী তাকে শেষ সেবার সুযোগটুকু দিয়ে গেল? হরিহর-বাবু কী দেখতে লাগলেন? দেখতে লাগলেন তাঁর বংশ-কৌলীন্যের শক্ত বেড়া তাঁরই নাভিনি ললিতা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল আর সেই ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ব্রজেন চলে গেল অনন্ত সুমহীন রাজ্যে। আর আজকের সেই বাণী বন্ধুবান্ধবের ভেতরে কিসের ছবির আভাস তিনি পেলেন! আভাস পেলেন আর শোকাতুর বুক থেকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এই কথাই বেরিয়ে এল—গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ বাণী জন্ম নিক পুরাতন ব্যবস্থা থেকে যারা স্বতন্ত্র অথচ সমাজের উচ্চতর কল্যাণই যাদের কাম্য, ভেঙে যাক সব পুরাতন গণ্ডী—সৃষ্টি হোক নতুন জীবনবোধ যার ভেতর দিয়ে কোন ব্রজেন যেন আর অসময়ে চলে যেতে না পারে।

অপূর্ব অতিথিসেবা

॥ শ্রীশুভজিৎ চক্রবর্তী ॥

বয়স—৯ চতুর্থ শ্রেণী

পুত্র, পুত্রবধূ, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী
ছোট্ট সংসার আর ছোট্ট তাঁদের বাসাখানি।
কত দিনই খাবার পান, কতই দিনই উপবাস;
এমনভাবে কাটিয়ে যেন কত বছর কত মাস।
একদিন ব্রাহ্মণ করতে গেছেন ভিক্ষা,
পেলেন একমুঠো ছাতু এই যা রক্ষা।
এক ভাগ ব্রাহ্মণ, এক ভাগ ব্রাহ্মণী,
আর দুই ভাগ পুত্র আর পুত্রের কামিনী।
এমন সময় অতিথি এক প্রবেশ করল ঘরে,
নানাভাবে ব্রাহ্মণ তাঁকে আপ্যায়িত করে।
নিজের ভাগের ছাতু দিল খেতে দেবার তরে,
ঐটুকু খেয়ে অতিথির পেট নাহি ভরে।
অতিথির কথা শুনে তখন ব্রাহ্মণী,
অতিথিকে খেতে দেন নিজের ভাগখানি।
তাহাতেও যখন পেট নাহি ভরে।
পুত্র এবার এগিয়ে আসে খেতে দেবার তরে।
অতিথি নয় তো—ব্রাহ্মণ এক যেন,
তিন ভাগ খেয়েও কিন্তু ভরে না তার মন।
তাই দেখে পুত্রবধূ এগোয় নিয়ে খাবার
ব্রাহ্মণ ভাবে এ ছাড়া আছে কে দেবার।
চার ভাগ খেয়ে অবশেষে পেট ভরল তার
কারো কাছে খাবার তখন চাইল না সে আর
মুখের খাবার অতিথিকে ক'রল তারা দান,
সস্ত্রীরে সবাই গিলে স্বর্গে তখন যান।
অতিথি সেবার মহত্ত্ব রইল অমর
বড় খুশী হইলেন দেব পুরন্দর।
শুন, শুন, ওরে ভাই, অতিথি সেবার কথা,
যে জন অতিথি সেবে পুরস্কার পায় হেথা।

রবার্ট ফ্রস্ট

। শ্রীঅনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য ।

এদেশের বিদগ্ধ সমাজে রবার্ট ফ্রস্ট অনেক আগেই পঠিত ও আলোচিত হলেও সম্ভবতঃ স্বর্গত জওহরলাল নেহরুই তাঁকে সাধারণ পাঠক সমাজে পরিচিত করে তোলেন। নেহরুর মৃত্যুর পর তাঁর টেবিলে এক টুকরো কাগজে ফ্রস্টের একটি অতি বিখ্যাত কবিতার (মধ্য শিক্ষা পর্ষদের কল্যাণে স্কুল বালকদেরও ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় যেটি পড়তে হচ্ছে) শেষ পংক্তি কয়টি পাওয়া যায় এবং নেহরুর স্বীয় হস্তাক্ষরের সেই উদ্ধৃতি কিংবা (অন্যমনস্কতা প্রসূত বা স্মৃতি-বিভ্রমবশতঃ) ভুল উদ্ধৃতিই পাঠক সাধারণকে ফ্রস্ট সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহী বা কৌতূহলী করে তোলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঐ পংক্তি কয়টি ১৯৬৩ সনে নিহত প্রেসিডেন্ট কেনেডিরও খুব প্রিয় ছিল। প্রেসিডেন্ট ও তাঁর প্রিয় কবি একই বছরে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

বর্তমান শতকের আমেরিকার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি রবার্ট ফ্রস্টের জন্মের একশ বছর পূর্ণ হল এ বছর। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ তাঁর জন্ম। দীর্ঘ ৮৯ বছরের আয়ুষ্কালে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর জীবন ও কাব্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্বল্প পরিসরের একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। শুধু সমকালের একজন স্মরণীয় কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁর সম্পর্কে পাঠকদের সামান্য কৌতূহল উদ্রিক্ত করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ফ্রস্টের জীবনে নানা অদ্ভুত বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর জন্মের প্রায় আড়াইশ বছর আগে থেকে তাঁদের পরিবারের নিউ ইংল্যাণ্ডে বাস, অথচ ফ্রস্টের নিজের জন্ম ক্যালিফোর্নিয়াতে। পরবর্তীকালে যিনি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবিরূপে খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেছেন, যাঁর মধ্যে আমেরিকার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী প্রকট, তিনি তাঁর নিজের দেশে প্রথম স্বীকৃতি পান নি, পেয়েছেন অন্য দেশে ; তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ২টি প্রকাশিত হয় ইংল্যাণ্ডে। তিনি কখনও কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি এবং পুরস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর কোন আস্থাও ছিল না, অথচ বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থের জন্য সম্মান আজ পর্যন্ত আর কোন কবির ভাগ্যে জোটেনি। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নাটোক্তি বা একক সংলাপ (dramatic monologue) গুলি যথাযথ কথ্য ভাষার সুরে লেখা বলে ধরা হয়, তবু তাঁর কাব্য এক সূক্ষ্ম সাংগীতিক মাধুর্যে মণ্ডিত। তিনি দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলকে বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন —যার ছাপ তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। এমন কি তাঁর কাব্য-গ্রন্থগুলির নাম পর্যন্ত এই আঞ্চলিকতার ইঙ্গিত দেয়, যেমন —North of Boston, Mountain Interval, New Hampshire প্রভৃতিতে, তবু খুব কম আঞ্চলিক কবিতাই এরকম বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে।

ফ্রস্টের বাবার রক্তে ছিল অস্থিরতা ও বিদ্রোহ। পরিবারের আশা ছিল তিনি আইনজীবী হবেন। কিন্তু তিনি হয়েছিলেন প্রথমে একজন শিক্ষক, তারপর সম্পাদক এবং তারপর রাজনীতিবিদ। নিউ ইংল্যাণ্ড ছিল রিপাব্লিকান সমর্থক। রিপাব্লিকানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিনি নিউ ইংল্যাণ্ডের আটপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যান পশ্চিম উপকূলে এবং সেখানে ডেমোক্র্যাটদের সংবাদপত্র 'সান ফ্রানসিস্কো বুলেটিন'-এ কাজ করেন। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন দক্ষিণীদের সমর্থক। সান্‌ফ্রানসিস্‌কোতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। চল্লিশ পেরোবার অনেক আগেই তিনি যক্ষ্মার দ্বারা যান। রবার্ট ফ্রস্টের বয়স তখন মাত্র দশ বছর। পিতার মৃত্যুর পর ফ্রস্টকে নিয়ে তাঁর মা চলে

আসেন তাঁদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান নিউ ইংল্যাণ্ডে। পিতৃহীন বালক সেখানে অবাধ স্বাধীনতায় বড় হতে থাকেন। তাঁর মা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন আর ছেলেকে বই পড়ে শোনাতেন। ফ্রস্ট অনেক দেরীতে নিজে বই পড়তে আরম্ভ করেছেন, তখন তাঁর বয়স চোদ্দ। প্রথম যে বই তিনি নিজে নিজে পড়েন সেটি স্কটিশ সর্দারদের কাহিনী, দ্বিতীয় বই 'টম ব্রাউনের স্কুলজীবন'। কবিতার যাদুও এ সময় তাঁর চোখে ধরা দেয়। এমার্সনের কবিতার গভীর অর্থপূর্ণতা এবং এডগার অ্যালান পো'র কবিতার সুতীব্র সঙ্গীত দুই-ই তিনি সমানভাবে উপভোগ করতেন। কবিতার এই যাদু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও কবিতা লিখতে শুরু করেন। পনের বছর বয়সে স্থল ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম কবিতা তিনি ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত দেখেন। এটি ছিল একটি দীর্ঘ গাথা (Ballod) জাতীয় কবিতা। উনিশ বছর বয়সে প্রথম তাঁর কবিতা একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা The Independent-এ প্রকাশিত হয়, এ জন্য তিনি দক্ষিণা পান পনের ডলারের একটি চেক। তাঁর মা এজন্য খুবই গর্ববোধ করেন, কিন্তু পরিবারের অন্য সকলে শঙ্কিত হন। তাঁর ঠাকুর্দা বলেন, 'কবিতা লিখে কারও পেট চলেনা'। তারপর তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে ফ্রস্টকে বলেন, 'আমরা তোমাকে এভাবে চলতে একটি বছর সময় দেব, এবং তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে এক বছরের মধ্যে যদি তুমি এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে না পার তবে তুমি লেখা ছেড়ে দেবে। কি বল তুমি ?'

"কুড়ি, আমাকে কুড়ি দাও"—হেঁকে ওঠেন নীলাম-দারদের মত উনিশ বছরের তরুণ ফ্রস্ট। অর্থাৎ এক নয়, কুড়ি বছর সময় তিনি চান। ঠাকুর্দার সঙ্গে রসিকতার সুরে হাল্কা চালে বলা এই কথা সম্ভবতঃ তাঁর বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে শুনেছিলেন। তাই তাঁকে পুরো কুড়ি বছরই অপেক্ষা করতে হয় কবি হিসাবে সাফল্য অর্জনের জন্য। কুড়ি বছর পরে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ A Boy's Will প্রকাশিত হয়—যা প্রমাণ করে যে তিনি শুধু একজন সত্যিকারের কবিই নন, একজন নির্ভুল ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও।

ইতোমধ্যে লরেন্স হাইস্কুলের পাঠ তিনি শেষ করেন। বিদায়ী ছাত্রদের অভিনন্দন সভায় তিনি বিদায়-ভাষণ দেন। এতে তাঁর সহযোগী ছিল একটি অসামান্য সুন্দরী মেয়ে ইলিনর মিরিয়াম্ হোয়াইট—যার সঙ্গে তিন বছর পর ফ্রস্টের বিয়ে হয়।

ফ্রস্টের কৈশোর খুবই কর্ম ব্যস্ত। ছেলেবেলা থেকেই স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে নানা ছুটিতে শুরু করেন তিনি নানা জীবিকার অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন কারখানায় সুতোর কারখানা সুতোর কল ও কৃষিখামারে কাজ করেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেছে অনেক আগেই। তিনি জানতেন কবিতাই হবে তাঁর অবলম্বন ; তাই কাব্য চর্চা থেকে বিরত হন নি কখনও। হাইস্কুল থেকে বেরিয়ে পিতামহের প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত প্রথাসুগ পাঠানুশীলনে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন নিজেকে ; ভর্তি হয়েছিলেন ডার্ট মাউথ কলেজে। কিন্তু সুবাস না পেয়েতোই ফিরে এলেন বাড়ীতে। পরবর্তীকালে ফ্রস্ট নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন, "আমি ওখানে বেশীর ভাগ সময় হৈ হুল্লোড় করে কাটাতাম। আমার মাকে একটি বাজে স্কুলে পড়াতে হত। এক পাল বওা মার্কা ছেলেকে তাঁর সামলাতে হত, পড়ানোটা ছিল তাঁর কাজের মধ্যে সব চেয়ে গৌণ। সম্ভবতঃ একটা অদ্ভুহাত হিসাবেই আমি ভাবলাম আমাকে যদি কোথাও গিয়ে হল্লা বা হৈচৈ করতে হয় তবে কলেজের চেয়ে বরং ঐ স্কুলে গিয়ে করাই ভাল।' অতএব, আঠার বছর বয়সে ফ্রস্ট কলেজ থেকে ফিরে এলেন এবং ম্যাসাচুসেটস-এর সেথুয়েন এ স্কুলে গিয়ে মার ক্লাসগুলো নিতে লাগলেন। ফ্রস্টের পিতামহ তাঁকে সাহায্য করতে রাজী ছিলেন, তাঁরও সে সাহায্য গ্রহণে বোধহয় ততটা আপত্তি ছিল না যতটা আপত্তি ছিল সাহায্যের আনুষঙ্গিক উপদেশগুলি গ্রহণে। কি করতে হবে—ততটুকু পর্যন্ত যদি বা তিনি শুনতে রাজী, কি ভাবে করতে হবে তা শুনতে কখনই নয়। তাই কখনও এ স্কুল কখনও ও স্কুলে পড়িয়ে, খবরের কাগজে কাজ করে নানাভাবে তিনি অর্থোপার্জন করতে লাগলেন।

বিয়ের দু'বছর পর ফ্রস্ট আরও একবার তাঁর পরিবার

পরিজনদের খুশী করতে চাইলেন লেখা-পড়ায় মনোনিবেশ করে। বাইশ বছর বয়সে তিনি হার্ভার্ডে ভর্তি হলেন। বছর দুই সেখানে পড়াশোনা করেন। এ সময়ে তিনি দর্শন শাস্ত্রের অনুরাগী হন, গ্রুপদী সাহিত্যের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করেন এবং লাতিন ও গ্রীকের রসাস্বাদন করেন। কিন্তু তিনি বলেন, "আমি যা চেয়েছিলাম এ তা নয়"। তাই হার্ভার্ডও তাঁর ধাতে সইল না। তাঁর পিতামহ খুবই নিরাশ হলেন, কিন্তু তিনি তাঁর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন পৌত্রটিকে অবলম্বন হিসাবে একটি খামার বাড়ী দিলেন নিউহ্যাম্পশায়ারে। অবশ্য একটি শর্ত ছিল ; অন্ততঃ দশবছর তাঁকে সেখানে চাষবাস করতে হবে। দশবছরের মধ্যে ঐ খামার বিক্রয়ের কোন অধিকার ফ্রস্টের থাকবেনা। এই নতুন আশ্রয় তাঁর কাছে এক চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিল। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি কৃষি-কর্ম শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর দ্বারা এ কর্ম হওয়ার নয়। যাই হ'ক, বছর পাঁচ ছয় শুধু এর দ্বারাই তিনি কোন রকমে জীবিকার সংস্থান করলেন। শেষের দিকে স্থানীয় স্কুলে তাঁকে শিক্ষকতাও করতে হল। কিন্তু তাঁর মাথার ভিতর গিজ গিজ করছে কবিতা। আর তার স্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা যে তিনি আবার লেখেন। প্রত্যেকে অসন্তুষ্ট, শুধু তাঁরা দুজন নির্বিকার, কোন উপেক্ষাই যেন তাঁদের গায়ে লাগে না।

এই ভাবে দশ বছর পূর্ণ হল, শর্তের সময়-সীমাও তাঁর অতিক্রান্ত। পঁয়ত্রিশ বছরের ফ্রস্ট এখন বিক্রী করে দিতে পারেন তাঁর খামার বাড়ী। নিউ হ্যাম্পশায়ারের সম্পত্তি বিক্রী করে এবং তার সঙ্গে গ্রামের স্কুলে পড়িয়ে যে টাকা জমিয়েছিলেন তা একত্র করে ফ্রস্ট খদেশের ব্যাস গুটালেন, পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ডে। নিউহ্যাম্পশায়ার থেকে বাকিংহামশায়ার। ১৯১২ সনের কথা সেটা। বিদেশে থাকার খরচ তখন কম। বাকিংহামশায়ারের অন্তর্গত একটি ছোট শহর বিকনফিল্ড, সেখানেই ফ্রস্ট সম্পত্তি নীড় বাঁধলেন। ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য-জগতে তখন তোলপাড় চলছে, জঙ্গিয়ান কবিতা তখন একটা আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে। কিন্তু ফ্রস্ট সম্পত্তিকে এসব ঝড়ঝাপ্টা স্পর্শ করেনি। মাঝে মধ্যে লণ্ডনে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া তাঁরা আর কোথাও যেতেন না। বছর খানেকের মধ্যে কারো সঙ্গে তেমন দেখা সাক্ষাৎও করেননি। এরপর গ্লষ্টারশায়ারে আবার কৃষিকাজ শুরু করেন। এখানে তাঁদের নিকট প্রতিবেশী ছিলেন কবি-নাট্যকার অ্যাডারক্রম্বি ও কবি উইলফ্রিড উইলসন গিবসন।

১৯১৩ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। ঐ বছর রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রথম ভারতীয় নন, প্রথম এশীয় যিনি তাঁর সাহিত্য-কর্মের জন্য 'নোবেল' পুরস্কার পান। ফ্রস্টের জীবনেও এটি একটি স্মরণীয় বছর। ঐ বছরই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এক রাতে ধোলা চুল্লীর সামনে বসে ফ্রস্ট তাঁর নিজের লেখা কবিতা-গুলি নাড়াচাড়া করছিলেন। তাঁর হাতে ছিল কুড়ি বছরের অঙ্কের যার মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মনে হল হয়ত কেউ এর কিছু কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করতে রাজী হতেও পারেন। এটা যে সম্ভব এ চিন্তা তাঁর মাথায় এর আগে কখনও আসে নি। ডেভিড নাট্ নামক একজন প্রকাশকের তিনি নাম জানতেন। ডেভিড নাট্ যারা গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী প্রকাশনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অধ্যাত কবির রচনা পড়ে তাঁর বই প্রকাশ করতে রাজী হলেন। এইভাবে এত সহজেই ব্যাপারটা ঘটল। কোন প্রভাবশালী বন্ধু নেই, প্রচার নেই, কবিতা ছাড়া আর কিছুই নেই যার দ্বারা কারও অনুগ্রহ বা সমর্থন লাভ করা যায়। এই ভাবেই তাঁর প্রথম বই বেরোল। বই যখন ছাপা হয়ে বেরোল তিনি তখন আটত্রিশ বছরে পা দিয়েছেন।

২

A Boy's Will রবার্ট ফ্রস্টের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সমালোচকরা ফ্রস্টের সম্বন্ধে ভুলে যাওয়া চিন্তাকে অবিস্মরণীয় শব্দ-বন্ধে ধরে রাখার ক্ষমতায়, ভাষার সারল্যে, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে, তাঁর সব রকম কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত একরাশ তাজা কবিতাতে অভ্যস্ত আকৃষ্ট হলেন। প্রায় একবছর পরে প্রকাশিত তাঁর পরবর্তী কাব্য গ্রন্থ North of Boston-এর সমালোচকরা

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে করলেন। শিবসন লিখলেন যে, ফ্রস্ট মানুষের প্রচলিত মুখের ভাষাকে কবিতায় পরিণত করেছেন। অন্য কোন কবির হাতে যে কাহিনী হয়ত নিছক ঘটনার বিবরণে পরিণত হতে পারত, তাঁর হাতে তা সহজ ছন্দে মণ্ডিত হয়ে এবং আঞ্চলিক চরিত্রের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেও এক শিল্পজনীন তাৎপর্য লাভ করেছে। The Nation পত্রিকায় একজন অজ্ঞাতনামা সমালোচক কবিতাগুলিতে প্রশংসা করলেন তাদের ভিতর নিহিত সহজ জ্ঞান, খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সব রকমের বাস্তব জীবনের উপভোগ্যতার জন্য। তাঁর ভাষার সরলতা ও অহঙ্কারহীনতার প্রতিও দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

মুখের ভাষাকে ছন্দে গেঁথে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ফ্রস্টের। সমালোচকের ভাষায় A Boy's Will-এ কবিতা গান গায়; আর North of Boston-এ কবিতা কথা বলে। সমালোচক Mark Van Doren 'রবার্ট ফ্রস্টের স্থায়িত্ব' নামক প্রবন্ধে এই গুণটির উপর জোর দেন। তাঁর কবিতায় যে সংলাপধর্মিতা, কথ্যসুর সৃষ্টির যে অদ্ভুত ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়—এটাই তাঁর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবার্ট ফ্রস্ট—এই নামের আড়ালে যে লোকটী কথা বলেন তিনি জানেন অল্প পরিসরে কি ভাবে অনেক কথা বলতে হয়, যেমন নিউ ইংল্যাণ্ড বা অন্যত্র তিনি যেসব মানুষের কথা শুনেছেন তারা জানে কি করে অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় অনেক গভীর সত্যকে—যা প্রচলিত আলঙ্কারিক ভাষার আতিশয্যে সম্ভব নয়।

১৯১৪ সনের গোড়ার দিকে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাতমাস পর ফ্রস্ট দেশে ফিরলেন আর সহসা তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে দেশে তিনি একজন বিখ্যাত লোক। অনেকটা রাত্রিনের সেই একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে বিখ্যাত হয়ে যেতে দেখার মত। নিউ ইয়র্কের এক প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে তাঁর বই দুখানা আমেরিকার সর্বত্র বিক্রী হচ্ছিল। যিনি একদিন অজ্ঞাত লেখক হিসাবে আমেরিকা ত্যাগ করেছিলেন, তিনিই আজ ফিরে এলেন মার্কিন কবিতার নতুন যুগের পুরোধা হিসাবে। একজন লিখেছেন যে সত্যিই কড়া নাড়ার আগেই আমেরিকার সাহিত্য জগতের সব দরজা তাঁর কাছে খুলে গিয়েছিল। এর পরের ইতিহাস জনপ্রিয় উত্থানের ইতিহাস, নিরবচ্ছিন্ন খ্যাতি, অর্থ, পুরস্কার ও প্রতিপত্তি লাভের ইতিহাস। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁকে উপাধি ও সম্মানিত পদ দান করেছে, আহ্বান করেছে কবিতা সম্পর্কে বক্তৃতা দানের জন্য। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে কবিতার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষাদানের চেয়ে বরং তাঁর কাজ ছিল উদ্বুদ্ধ করা, অনুপ্রাণিত করা, কাব্যের উৎকৃষ্টতা সঞ্চারিত করে দেওয়া ছাত্রদের হৃদয়ে। এ কাজ তিনি খুবই সার্থকতার সঙ্গে করেছেন। সৃষ্টিশীল রচনায় বিরতি না ঘটিয়েও সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি একটি শক্তিরূপে স্বীকৃত হন, কখনও কাউকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা না করেও তিনি পরিগণিত হন এক প্রবল প্রভাবরূপে।

পূর্বোল্লিখিত নানা সম্মান ছাড়াও ফ্রস্ট আরও অনেক দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন। National Institute of Arts and Letters প্রদত্ত স্বর্ণ পদক তাদের একটি। খুব কম লোক এই পদক পেয়েছেন। ১৯৬২ সনে তাঁর ৮৮ তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁকে দান করেন Congressional Medal যা কচিৎ কাউকে দেওয়া হয়। এই সময় আরও যেসব সম্মান তিনি লাভ করেন তাতে তাঁকে অঘোষিত রাজকবি বলা যায়। অঘোষিত এই জন্য যে ইংল্যাণ্ডের মত আমেরিকার রাজতন্ত্র নেই ও রাজকবি বরণের প্রথাও নেই। যদি থাকত তবে ফ্রস্টই যে সে সম্মান লাভ করতেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁকেই যে সর্বপ্রধান মনে করা হত তা প্রমাণিত হয় ১৯৬১ সনের জানুয়ারী মাসে যখন কেনেডির প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম কোন কবিকে এভাবে সম্মানিত করা হল। একটি ছোট দেশাত্মবোধক কবিতা এই অনুষ্ঠানে তিনি পাঠ করেন। ভূমিকা হিসাবে আর একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতাও তিনি লিখে এনেছিলেন, প্রথমে সেটি পড়তেও আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু রোদ এসে লাগছিল তাঁর চোখে,

ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ায় উড়ে যেতে চাইছিল সাতাশী বছরের বৃদ্ধ ফ্রস্টের হাতে ধরা কবিতা। কয়েক লাইন পড়ে তিনি সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে পড়লেন The Gift Outright নামক দেশাত্মবোধক কবিতাটি।

৩

একটি শান্ত সুর ছাপিয়ে ওঠে ফ্রস্টের অনেক কবিতায়। The Gift Outright-এর মত দেশাত্মবোধক কবিতাতে দেশপ্রেম উচ্চারিত হয় নি চীৎকার বা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, যা এ ধরণের কবিতায় সাধারণতঃ হয়ে থাকে। অনেক সমালোচকই ফ্রস্টকে বর্তমান শতকের আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবিরূপে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে তাঁর কতগুলি বিষয়ে পার্থক্য সহজেই মনে পড়ে। রবিনসন, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, লিণ্ডসে, উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস—সকলেই আমেরিকার যে নতুন কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার সঙ্গে ফ্রস্টের কোন যোগ ছিল না। তাঁর সমসাময়িক কবিরা সকলে নগরবাসী, তাঁদের সবার কবিতার বিষয়বস্তু শহরকেন্দ্রিক কিন্তু ফ্রস্টের কবিতায় শহরের কোন স্থান নেই। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সমসাময়িকদের কারও থেকে কম আধুনিক নন। তিনি গ্রামের মানুষ। তাঁর কবিতা জুড়ে রয়েছে গ্রামের প্রকৃতি, নানা জীবিকার মানুষ, পশু-পাখী এমন কি কীট-পতঙ্গ। যে সব খামার বাড়ীতে তিনি থেকেছেন সেখান থেকেই আহরণ করেছেন কবিতার বিষয়বস্তু। কোন কিছুই তাঁর কাছে উপেক্ষণীয় নয়। মাকড়সা কিংবা জোনাকি, এমন কি বোলতাও তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে। ফ্রস্টের বৈশিষ্ট্য এই যে সাধারণ লোকের মুখের ভাষাকে কবিতায় স্থান দিলেও এবং তাঁর কবিতায় আঞ্চলিক পরিমণ্ডল সত্ত্বেও তা কখনই পাঠককে বিমূঢ় করে দেবার মত আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট নয়। তাঁর অনেক কবিতাতেই রয়েছে এক নতুন ধরণের রাখালী (Pastoral) সুর। নীতিধর্মিতা ও নাট্য ধর্মিতা দুয়ারও তাঁর কবিতায় সমান ভাবে রয়েছে। কিন্তু যে সব চরিত্র তাঁর কবিতায় কথা বলে তারা সবাই খুব সংযত বাক্। কত অল্প পরিসরে ফ্রস্ট তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে পারেন তার নিদর্শন হিসাবে একটি সম্পূর্ণ কবিতা উদ্ধৃত করা হচ্ছে। কবিতার নাম Dust of Snow :—The way a crow/Shook down on me/The dust of snow/From a hemlock tree/Has given my heart/A change of mood/And saved some part/Of a day I had rued. কিংবা আর একটী সম্পূর্ণ কবিতা Fire and Ice সেখানে পৃথিবীর শেষ সম্পর্কে বলা হয়েছে Some say the world will end in fire /Some say in ice./From what I have tasted of desire/I hold with those who favor fire./But if it had to perish twice /I think I know enough of hate/To say that for destruction ice/Is also great And would suffice. কবিতায় এই মিতভাষিতা ও অর্থের গভীরতা মনে পড়িয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে লেখা 'প্রথম দিনের সূর্য' ইত্যাদি ঔপনিষদিক মন্ত্রের মত অমোঘ কবিতাগুলি। প্রবন্ধের শুরুতে যে কবিতাগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। গোটা কবিতাটিতে একটি সংহত সনেটের রূপ ফুটে উঠেছে। আর "The woods are lovely, dark and deep./But I have promises to keep./And miles to go before I sleep /And miles to go before I sleep."—এই শেষ স্তবকটি প্রমাণ করে কত অল্প ও সহজ কথায় কত বেশী ও গভীর কথা বলা যায়। প্রতিটি মানুষকে তার জীবনে বহু প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে হয়, অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়, বহু পথ পার হয়ে তবেই সে পেতে পারে ঘুম ও বিশ্রাম। তাই অবকাশহীন জীবনে অনেক সুন্দর মুহূর্তের প্রলোভন তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এড়িয়ে যেতে হয়। একটি অমুচ্চ বিষাদ ও চাপা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে আছে কবিতাটিতে। কবি হিসাবে ফ্রস্ট জীবনের সব দাবী পালন করেছেন, রক্ষা করেছেন সব প্রতিশ্রুতি। তারপর উননব্বই বছরে, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত কবি লাভ করেছেন চিরনিদ্রার অনন্ত বিশ্রাম।

একটি আদর্শ দর্শন ঃ
সাধারণ মানুষের চোখে

॥ শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

স্বীকার করুন আর নাই করুন আপনারও একটি দর্শন আছে, সে আপনি যতই বাস্তববাদী, বিজ্ঞানধর্মী বা পার্থিবপন্থী হন না কেন! আপনার এমন একটি দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে যা দিয়ে আপনি পার্থিব, অপার্থিব বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করেন, বৈতিক মানদণ্ড স্থির করেন, সুন্দর অসুন্দর বিচার করেন এবং জীবনের প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য কতখানি—তা আপনার কাছে বা পৃথিবীর কাছে—ঠিক করেন। যদি বলেন আপনি এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন না বা করার সময় পান না বা যারা চিন্তা করে তাদের অনুকরণ করেন, তাহলেও আপনি রেহাই পেলেন না। আপনার দর্শন রইল। অবশ্য আপনি দার্শনিক হলেন কিনা কতখানি বলা গেল না—কেন না কতখানি জোর দিয়ে সে কথা স্থাপন করলেন তার ওপর সেটা নির্ভর করবে।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। চিন্তা করতে গিয়ে এমন এক জায়গায় গিয়ে হয়ত থেকে যাবেন সেখান থেকে বেরোন সহজ হবে না। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে আপনার চিন্তা কর্ম ও অনুভূতি হয়ত আলাদা আলাদা; সত্য, শিব, সুন্দরের ধারণাগুলি একসঙ্গে এলে পরস্পর-বিরোধী, অন্ততঃ তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই! অথবা সেগুলি মূল চিন্তা-প্রণোদিত এবং আধুনিক বা উন্নত চিন্তার সঙ্গে তাদের মিল নেই। ব্যক্তিগত জীবনে এটা প্রায়ই দেখা যায় এবং চলেও যায় কোন রকমে, মুস্কিল হয় সমষ্টিগত জীবনে। আবার একজন যদি বা টেনেটুনে নিজের চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করল, কিন্তু অন্য মানুষ বা বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল রইল না। যে দু'চারজন তা গ্রহণ করল তাদের মধ্যে রইল মতবিরোধ আর বিজ্ঞান বা দর্শনের নোতুন চিন্তায় তা হয়ে পড়ল অপ্রতুল। কেউ কেউ এর রাজাঘষা করল কিন্তু ঘুনেই গলদ বলে গলদটা রয়েই গেল। যখন সম্মানের জন্য বা প্রতাপের যন্ত্রে একে জোর করে চালাতে যাওয়া হল তখন এল সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার ও বিবাদ। যেমন বিহাদ। যেমন অনেক ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ঘটে। এটা ঠিক যে সত্যকে সম্মুখে চালিত করতে গেলে চাই আত্মবিশ্বাসের জোর, কিন্তু তা শুধু গায়ের জোর হলে সেখানে আর যাই-ই থাক মানবতা থাকে না—যে পূর্ণ মানবতা বিশ্বকে পূর্ণ রূপে দেখার চেষ্টা করে আসছে। যুগে যুগে কত মানুষ কত নিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের অনেকেরই সে নিষ্ঠা সত্য হলেও তার মধ্যে বিশ্ব ধরা পড়েনি—কিছু ফাঁক রয়ে গেছে। এ যেন পদ্মাবৃত্তের দুটি বাহু যা অসীম পর্যন্ত বাড়ান যেতে পারে, আরও সত্য ঢোকানোর জন্য ছেদকটিকে শুধু সরিয়ে নিলেই হল।

জিনিষটা তাই-ই হোত। কিন্তু আমাদের কারবার শুধু সত্য দিয়ে নয়, সত্য শিব সুন্দরকে নিয়ে, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে, বিশ্বকে নিয়ে, সমগ্রকে নিয়ে। আগের ধারার চিন্তায় ফাঁক রয়ে যাচ্ছে চিন্তায় চিন্তায়, মূল্য বোধে, বিশ্বের প্রতিটি কণায়—যাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। হয়ত তাদের সহাবস্থান আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে বিবাদ বিশৃঙ্খলা। তবে কি অদ্বৈতের রোলার চালিয়ে সব এক করে দেব? না। অসুবিধা আছে। সমগ্র বিশ্ব যে বিভিন্ন রূপে ফুটে উঠছে তা কি করে অস্বীকার করি? প্রত্যেক বস্তু, চিন্তা বা নীতির আসল নকল ক'টা স্তরে রূপ নিরূপণ করব? আর বিশ্ব হচ্ছে একটা পাঁচ-ফুলের সাজি তাদের নির্মম একত্ব এবং বৈচিত্র্যহীনতা কি সহ্য করতে পারব?

সুতরাং বিশ্বের প্রতিটি কণা তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে

থাকবে। থাকবে ঈশ্বর আর মানুষ, শুভের অশুভের ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা—অথচ এদের মিলন একটা অন্তর্বিরোধ হয়ে উঠবে না। শ্রীনিত্যগোপাল তাই করেছেন, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ তাই-ই বুঝিয়েছেন। এটা কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কথা নয়। জৈন দর্শনে স্যাৎবাদ (theory of 'may be') বলে একটি তত্ত্ব আছে। এতে সাতটি পদের দ্বারা সত্যের বহুমুখী রূপটি প্রকাশিত বিনম্রভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই গল্প: কতকগুলি অন্ধ একটি হাতির বিভিন্ন অঙ্গ অনুভব করে সেটাকেই হাতি বলে ঘোষণা করল; যতক্ষণ না একজন প্রাজ্ঞ এলেন ততক্ষণ সত্য তাদের কাছে অগম্য রইল, রইল নিজের ধারণা নিয়ে বিতণ্ডা। এটা জৈনদের গল্প। শ্রীনিত্যগোপাল জৈন ধর্মেরই একজন প্রবক্তা; কিন্তু তাঁর মধ্যে শৈব ধর্মের বিশালতা, শাক্ত ধর্মের গভীরতা, বৈষ্ণবের প্রেম, বেদান্তের মহত্ত্ব ও সূক্ষ্মতা, বৌদ্ধের তৃপ্তি, এমন কি লোকায়ত দর্শনের বাস্তবমুখীনতা এসে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। অথবা আর্য ধর্মের মনন ও বীর্য, অনার্য ও অভারতীয় ধর্মের হৃদয় ও বিশ্বাস, প্রাচ্যের স্থিতি ও শান্তি, পাশ্চাত্যের গতি, কৌতূহল ও যুক্তিপরায়ণতা সুসংবদ্ধ হয়েছে।

এই মিলনের চেষ্টার একটি মূর্ত রূপ দেখলাম শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে—যিনি সব ধর্ম ও দর্শন যে একই কথা বলতে চাইছে তা দেখালেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম কর্মপ্রধান আধ্যাত্মিক বা পার্থিব উভয়েরই। কিন্তু অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি বাদ দিলে সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য দর্শন শুধুই তাত্ত্বিক। এ দুয়েরও মিল দরকার। জার্মান দার্শনিক হেগেল দেখালেন একটি তত্ত্ব তার প্রতিতত্ত্বের (antethesis) সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে একটি নূতন তত্ত্বের সৃষ্টি করে। শ্রীনিত্যগোপাল আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখালেন যে, যেগুলিকে পরস্পর বিরোধী মনে করা হত, সেগুলি সেরূপ তো নয়ই, পরন্তু শুধু তাদের সহাবস্থানই সম্ভব নয়, তাদের সংযোগ তাদের স্থিতির পক্ষে অপরিহার্য। এইভাবে সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর, আলোক-অন্ধকার সন্ন্যাস-কামিনীকাঞ্চন, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির বিবাদ বন্ধ হল। দুয়ের মধ্যে শ্রীতিস্থাপন হয়ে গেল। একত্ব স্থির রহস্য সবই রইল। শুধু মানুষ ঈশ্বরের জন্য কাঁদবে তাই নয়, ঈশ্বরও মানুষের ভালবাসার জন্য ব্যাকুল হবে—এ-ও প্রতিপন্ন হল। নরনারীর প্রেম এইভাবে স্বর্গীয় প্রেমের সংশোভাক হল। কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজতে গিয়ে আর গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হল না। গাছের কারণ বীজ কি বীজের কারণ গাছ সে সমস্যার সমাধান হল। গাছ ও বীজ দুই সমমর্যাদা পেল। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সম্বন্ধ বোঝা গেল। জ্ঞান কর্ম ভক্তি এবং ভোগ ও ত্যাগ কোনটারই বাড়াবাড়ি রইল না।

একটা কথা অবশ্য প্রায়ই শুনি। নোতুন ব্যাখ্যার এই যে সর্ব সমন্বয় (integrated organic whole): এর মধ্যে কি বৈচিত্র্য বা বিরোধ রইল না? রইল। কিন্তু বিষাদ রইল না। তারা একই সুতোর দুটি পিঠের মত কিংবা একই শরীরের বিভিন্ন অংশের মত অপরিহার্য রূপে যুক্ত রইল। অথচ নতুন সত্যের আলোয় পুরাতনের সংস্কারের অবকাশ রইল। কোন কিছুকে অসত্য, অসুন্দর বা অশিব বলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধিত, তবে এই সম্বন্ধ যার ক্ষেত্রে যত বেশী সংহত বলে প্রতীয়মান তার ক্ষেত্রে তত বেশী গ্রাহ্য। নিত্যগোপাল করলেন, পুরুষোত্তমানন্দ দেখালেন! দেখালেন বিজ্ঞানের দিকে। আমরা স্থান ও কালের মধ্যে কোন যোগ দেখতে পাই না। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটার কথা চিন্তা করি। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব এদের নিগূঢ় সম্বন্ধ দেখিয়ে প্রমাণ করল এরা একই তত্ত্বের দুটি দিক। তেমনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা জড় ও শক্তির মত দুটি পৃথক তত্ত্বের মধ্যে একই ধর্মের অস্তিত্ব ধরল। একই পরমাণুর মধ্যে বিষম বিদ্যুৎবিশিষ্ট কণা পরমাণুটির স্থিতির কারণ বলে ধরা পড়ল। পদার্থের একটি প্রতিপদার্থ (antimatter) ও থাকতে পারে দেখা গেল। জৈন দর্শনের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়: বিশ্বের প্রতিটি কণা সম্ভাবনাপূর্ণ—তা যেন ফিরে দেখায়। গতি ও স্থিতিও পৃথক নয় দেখলাম: আবার প্রাণ ও মনের জগতে এরাই হল বিবর্তন। এই যেখানে বিশ্বের প্রতি

দৃষ্টি ভঙ্গী সেখানে কি মানুষে মানুষে ভেদ থাকতে পারে? কর্ম বিভাগ থাকলেও জাতি, বর্ণ, বর্ণ (রঙও বলতে পারেন) নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যে স্থান রইল। শোষণ পালাল। প্রত্যেক মানুষ হল শ্রীনিত্যগোপালের মত cosmopolitan।

কিন্তু তবু একটা খটকা রয়ে গেল। ভাব নয় শুধু ভাষার জন্য ভুল বোঝাবুঝি, বিবাদ প্রায়ই হয়। ভুল বুঝবার নেশা। বা ভুল বোঝবার অপচেষ্টা। যাকে বলে কথার মার প্যাঁচ। Blackness is blinding বাক্যে কর্তা ব্যাকরণগত, কিন্তু বাস্তবে অস্তিত্ব নেই (অবশ্য black বস্তুটি আছে)। অথচ কত ক্ষেত্রে এ রকম বাক্যকে বাস্তব বলে মেনে নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। আর এই সিদ্ধান্ত অবশ্য বাস্তবানুগ হবে না। পাশ্চাত্যে তাই কিছুদিন যাবৎ এ বিষয়ে আন্দোলন চলছে। দাবী: দর্শনের ভাষা সরল, স্বার্থবোধহীন এবং প্রকৃত ভাব প্রকাশক হবে। শ্রীনিত্যগোপাল পুরুষোত্তমানন্দ সেই কথাই তুলে ধরলেন।

যে ধর্ম ও দর্শনের সার হল 'সমন্বয়', তার ভাষাকেও তো সেরূপ হতে হবে। তবে এর সাধনা কি হবে? পথ আমাদের যাই-ই হোক না কেন, সাধনা হবে 'প্রাণ'-সাধনা বা প্রাণ দিয়ে সাধনা। তুমা একাধারে স্থিতি ও গতি সম্পন্ন, বাহিরে ও ভিতরে। তাই একে ধরবার জন্য চাই সমগ্র চিন্তা, হৃদয় এবং ইচ্ছা বা কর্ম দিয়ে সাধনা, সমগ্র মানবতা দিয়ে সাধনা, সমগ্রকে দিয়ে সমগ্রের সাধনা। এই সাধনার যতটুকু হয় তাতেই তৃপ্তি। কারণ এখানে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবার তাগিদ নেই। আছে আরও গভীরে প্রবেশ করা—নিজেকে আরও বিস্তৃত করা। এই সাধনা সবার মধ্যেই কম বেশী চলছে। তবে যে সচেষ্ট হবে সে উপলব্ধির ভাবে বিভোর হয়ে তৃপ্ত হবে। কিন্তু কোথায় এই সাধনা হবে?—মন্দিরে, মসজিদে, না গীর্জায়? শ্রীনিত্য গোপালের ভাষায় বলি, 'এই বিশ্বই আমার মহামঠ'। এখানে আপনার আমার সবারই প্রবেশাধিকার আছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫৫—

[দিনপঞ্জীর ১৯৫৫ সন আরম্ভ হয় ১৩৭৯-বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা (১৯৭২) হইতে। সেখানে উল্লেখ করাও হইয়াছিল। কিন্তু অনবধানতাবশতঃ পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আরম্ভ পৃষ্ঠায় ১৯৫৫ স্থলে ১৯৫৪-ই লেখা হইতেছিল। এই ত্রুটীর জন্য পুনরায় অনুতাপসহ সকলের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি সঃ—উঃ ভাঃ।]

যারা জীবন 'মানুষ' 'মানুষ' করিয়া মরিলাম। মানুষ পাইয়াছিলাম, আজও মানুষ কাছে আসিলে তাহাকে কাছে রাখিতে ইচ্ছা করে। নবদ্বীপের অমরেশ আসে ৬টায়, রাত্রিতে এখানে থাকে। সে শতবার্ষিকীতে ৫১ টাকা দিবে। ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় চেতলা পাঠ করিতে যাইবার পথে আসেন, ৪৭টাকা দিয়া যান। ফাল্গুনীবাবুর 'পরিত্রাতা বিজয়কৃষ্ণ' প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। কি লড়াইয়ে বিজয়কৃষ্ণ। যানা না-যানার দিবা মূরতি বিজয়কৃষ্ণ। বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান বিজয়কৃষ্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। চুলচেরা বিচার কেমন করিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া বিশ্বাসে পরিণত হইতে পারে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিজয়কৃষ্ণ। শ্যামসুন্দর আশ্রিতে, মধ্যে ও পরে। ২০শে মে

নিত্যগোপাল তোমাকেই জীবনের একতারা

করিয়াছি। 'দিশশ্চ অনবলোকয়ন্'—অন্য দিকে অবলোকন না করিয়া সর্বসময়মূর্তি একমাত্র তোমার দিকে চাহিয়াই চলিব। যেখানেই আমি যাই, সেখানেই তুমি প্রকাশিত। তুমি ঘরে বাহিরে, তুমি দেবালয়ে তুমি বেশ্যালয়ে, তুমি যীশুর মন্দিরে, তুমি শবরীর কুটীরে, তুমি গুহ্যকালয়ে, তুমি শুচিতে তুমি অশুচিতে, তুমি স্বর্গে তুমি নরকে। ঐকদেশিক দৃষ্টি দিয়া তোমাকে দেখিব না, জীবনের প্রতি দৃষ্টিকোণ হইতে তোমায় পাইব। তোমার মুখখানি, তোমার অপার স্নেহ, কাছে বসিয়া খাওয়ানো সবই হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে। তাহাই তো আমার সম্বল। তুমি ভালবাস ইহাই আমার সবটুকু। তুমি তো আছ, কেউ না রহিল। ধন নাই, জন নাই, তুমি আছ—ইহাই আমার শান্তি। তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যই ধন জন চাই। নইলে আমার কি প্রয়োজন? আমার তুমি। অমরেশ আফিসের প্রার্থনা সভায় যোগদান করে। চা রুটি খায়, প্রণামী ৫ টাকা দিয়া চলিয়া যায়। রেণু প্রিয়দারঞ্জনবাবুর বাসায় গিয়া আইনষ্টীন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ নিয়া আসে। ৪॥ টার বদি বাগচী অনিলবাবুর গাড়ী সহ আসে। আমি উদ্বাস্তিনী কুমার রেণু গোপা যাই। ঘোষিত সভাপতি পান্নালাল বসু না আসায় আমাকে সভাপতি করা হয়। যতীন্দ্রবিমলবাবু প্রস্তাব করেন, যোগেশ ব্রহ্মচারী সমর্থন করেন। যোগেশ ব্রহ্মচারী বলেন, একই সময়ে রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ নিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমানন্দ (বরিশালের শরৎ ঘোষ) নিত্যগোপালেরই প্রাণধন। আমি তাঁহার সভাপতি হইবার প্রস্তাব সমর্থন করি। প্রথমে চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, পরে রমা চৌধুরী, কালিদাস নাগ, যোগেশ গুপ্ত, পরে প্রধান অতিথি পি. বি. মুখার্জী, পরে সিদ্ধি প্রফেসার মালকানি বলেন। তার পর আমি। শ্রীকৃষ্ণ ৫ হাজার বৎসর পূর্বে যে প্রাণদর্শন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই বাঙ্গলার শ্রীগৌরসুন্দর-জীবনে মূর্ত, তাহাই আবার বর্তমান যুগে ঐ তিন পুরুষের ভিতর দিয়া কার্যকরী হইতে চলিয়াছে। নিত্যগোপাল সবচেয়ে কম পরিচিত। সেদিন আসিতেছে যেদিন বাঙ্গলা তাঁহাকে ভাল করিয়াই চিনিবে। তাঁহার বাণী নিত্যানিত্য সমন্বয়, আত্মানাত্ম সমন্বয়, জড়াজড় সমন্বয়। আজ বিশ্ব মনের স্তর ছাড়িয়া প্রাণের উপকূলে উঠিবার জন্য ব্যগ্র। প্রাণ সর্বাত্ম, সর্বস্থবি। এই প্রাণের আনাই বিজয়কৃষ্ণের সারা জীবনের ইতিহাস। শ্যামসুন্দরকে 'স্বোপার্জিত' করিবার জন্য তাঁহার জীবনভর ছুটাছুটি—সকল মতবাদ, সকল সম্প্রদায় দিয়া, সকল বিচার দিয়া পাইবার জন্য তিনি শ্যামসুন্দরকে মানেন নাই। তাঁহাতে self life cosmic life এর সমন্বয় ছিল। ট্যাকসীতে আসি, সঙ্গে সেবানন্দ ও যোগেশ ব্রহ্মচারী আসে, আমার সময় বহুলোকে প্রণাম করে। ২১শে মে

নিত্যগোপাল, আমার বরেণ্য, বরণীয় স্বামী, 'সবিতুর্বরেণ্যং' তোমাকে দেহপ্রাণ দিয়া বরণ করি। আমি বরতনু হইব, আমার কর্তৃত্বহন্তার নির্বাণ হউক। তুমিই আমার বর, আমি অবর ছায়া। তোমার নয়ন দিয়া তোমাকে, তোমার বিশ্বকে দেখিব। তোমাকে পাইয়া তোমার বিশ্বকে পাইব। আমি তোমার ঘর করিব। তোমার বিশ্বের প্রতি বস্তুকে আমি তুমি বলিয়া আদর করিব—সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। তুমি সব হইয়াছ। তোমায় আমার মরণে নবীন বিশ্ব গড়িয়া উঠুক। তোমার সংসারকে ভালবাসিব। সেবা করিব। ২৮. টায় এখান হইতে আমি রিক্সায় রওয়ানা হইয়া ট্রাম ধরিবার জন্য যাই। রেণু কুমার গোপা হাঁটিয়া যায়। সেবানন্দের সঙ্গে মোড়ে সাক্ষাৎকার। সে-ও সঙ্গে যায়। ট্রামে হাওড়া—৩।২৭—এ ব্যাণ্ডেল লোকালে উত্তরপাড়া। সুবোধ বাবু ষ্টেশনে ছিলেন। .. সুবোধবাবুর বাড়ী···সরবত খাইয়া ···অমরদাদার বাড়ী যাই। নীলু সুব্রত মধু রমা একটু আগেই গিয়াছিল। ৬টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। 'The philosophy of any period is always largely interwoven with the sciences of that period, so that any fundamental change in science must produce reaction in philophy, 'Complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system, The old

physics showed us a universe' etc Law of Relativity, $E=Mc^2$, Quantum theory কেমন করিয়া সমাজ-জীবন পর্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করি। আজিকার আলোচনা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। বিষয় ছিল, 'ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে বিজ্ঞান ও দর্শন সমন্বয়'। দ্রষ্টা বলে যে একটী single systemএর দুই অংশ, ধনিক প্রধিক, নর নারী ইত্যাদি তাহা আলোচিত হয়। কিন্তু বিলের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়, সীতার পরে রাধা চরিত্রের স্থান, দেহ দেহী অভেদ। আলোচনা ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট হয়। অমর দাদার ওখানে খাই···, অমরদাদা প্রাহক হন, টাকা দেন। প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। যুবকরাই বেশী উপস্থিত ছিল, তাহাদের সঙ্গে কথা হয়। নিলে আবার যাইব বলি। সম্পূর্ণ নূতন শুনিয়াছে তাহারা এ সব কথা। ভাবিয়া ছিল 'accademical' হইবে। ভাল তো লাগে অনেকেরই, আসে না তো কেউ।···১০.৩৫ এ আশ্রমে পৌঁছি। নীলুরা বক্তৃতার পরেই দক্ষিণেশ্বর চলিয়া যায়। অমরদাদার বড় ছেলে সত্যব্রতকে দেখা করিতে বলি।

২২শে মে

নিত্যগোপাল, তুমি জটিল কুটিল বক্র সংসার-পথে (curved space) সহজ সরল ধারায় (straight) চলিবার কৌশল লইয়া সর্বপ্রথম আসিলে। এতদিন যাহারা আসিয়াছেন তাঁহারা straight space এ curved (বক্র) লাইনে চলার গুরু ছিলেন। রাধারাণীও এমনই পথে পুরুষোত্তমের পথে অভিসারিণী হইয়াছিলেন। তাই তিনিই 'সরলা'। নিতান্ত সরল না হইলে curvedএর মধ্যে কেহ চলিতে পারে না। যাহারা চলিবার জন্য 'পথ' সোজা করিয়া লয়, তাহারাই কুটিল। সত্যিকার 'সরল' যে, আত্মনিবেদিত যে, সে-ই বক্র কুটিল পথে চলিতে পারে। আমার এই 'পথে' চলিবার মত 'যোগ' দেও। আমায় এমন প্রাণ দাও যাহা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারি। বক্তৃতায় ছুটাছুটিতে তো কুলায় না। প্রাণ সঞ্চার করিবার মত যথেষ্ট প্রাণ আমায় দাও। অতীন চক্রবর্তী একটি মেয়ে সহ সকালে আসেন। অনেক বলিয়াছি যে একটি দার্শনিক বিপ্লব ছাড়া কিছুতেই এই সমাজ সুস্থ হইবে না। অস্পৃশ্যতা বর্জনের বাহিরের কতগুলি ঘটনা বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত ঘটিয়াছে, কিন্তু যে কাঠামোর উপর এই অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি তাহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। নারী প্রগতির অবস্থাও তাই। মূল রহিয়াছে গুহাবরে, সে স্থান বাহিরের কোনও ঘটনাদ্বারা স্পর্শ করা যায় না। এর কাজ দর্শনশাস্ত্রের ও প্রাণ প্রচারের। বেণু সুবোধবাবু, এম বি সরকার, আশুবাবু ও প্রিমিয়ারে যাব। ৪ মাসের একটি কাগজ চতুর্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে। কুথার বাহির হয়। ডাঃ সুবোধ চ্যাটার্জী বৌ ঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য আসে।···অমরেন্দ্রবাবু কাল বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। আর বলিয়াছিলেন কোনও আয়গা না করিয়া কি কাজ করা যাইত না? জড়াইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। যতিবাবু জড়াইয়া পড়িয়াছেন। আমি বলিলাম যে কারণে মানুষ জড়াইয়া পড়ে সেই কারণ থাকিলে আমার বহু শিষ্য হইত। তাহা হয় নাই। বিশেষতঃ মরিবারও তো একটু আয়গা দরকার। এই দর্শনটি কোন স্থান হইতে প্রচারিত হয় এমন একটী ব্যবস্থা তো দরকার। আমার মত নিরবীর দল হয় না। ছোট একটি প্রতিষ্ঠান ঠাকুরের আলোটি জ্বালাইয়া রাখিবে—এই পর্যন্ত। যদি কেহ আসে সে যেন খোঁজ পায়। কুসুমের কোন চিঠি নাই। ২৩শে মে

নিত্যগোপাল, সমপ্রাণ সখা আমার, যে প্রাণ বর্তমান বিশ্বের সব সাধনা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সেই প্রাণ লইয়াই তো আমার জীবনের সব কিছু ব্যাপার। প্রাণ দিতে চাহিয়াছি. প্রাণ পাইতে চাহিয়াছি। প্রতিটী মানুষ, প্রতিটী ঘটনা, প্রতিটী কর্মের সঙ্গে organically বা প্রাণ দিয়া যুক্ত হইতে চাহিয়াছি। মানুষের দায়িত্বকে নিজ দায়িত্ব মনে করিয়া বহিতে চাহিয়াছি। মাথার বোঝা ফেলিয়া মুক্ত হইয়া পথ চলিতে চাহি নাই। তুমি রক্ষা করিয়াছ। ধর্মদাসকে বাহিরের গন্ধা তুমি ঘরে করাইয়াছ, আমি বিশ্বের মানস গন্ধায় ঝাঁপ দিয়াছি,

তুমি সেখানে আগুলিয়া রাখিয়াছ। প্রভুর প্রাণ দেও, সেই প্রাণ বয়া সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার মত কৌশলও দেও। ৪টার পর আমি ও কুমার ১৬নং লাসডাউন টেরেসে সুরেন সেনের বাসায় অশ্বিনী-কুমার দত্ত ব্যারিষ্টার সভায় যাই। সভারম্ভের কিছু পরে প্রায় ৭৷৷০ টায় যাই কানাই সাহার ঠাকুর বাড়ীতে বক্তৃতার জন্য। ৮টার পর সম্ভবামি যুগে যুগে এই বিষয়ে আলোচনা করি। সনক সনাতনের বৈকুণ্ঠ গমন, জয় বিজয়কে অভিশাপ প্রদান, জড়াজড় সমন্বয়-মূর্তি নরসিংহ, প্রহ্লাদের বিশ্বনাগরিকতা, পরে রাম, পরে শ্রীকৃষ্ণ, মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরার্ধ, ধরার ভার ভার হয় না, ধরার যান প্রতিষ্ঠা, নামরূপের ব্রহ্মরূপ দান, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার, পরে সম্ভবামির মূর্ত বিগ্রহ নিত্যগোপাল। বর্তমান জটিল কুটিল যুগ-সমস্যায় সর্বতোভাবে উপস্থিত মানুষের সমাধানমূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল। দ্বিপ্রহরে কুমারের সঙ্গে আসি প্রায় ১০টায়। আমার সকল দুর্যোগ কি দুর্যোগ থাকিয়াই সুযোগে গড়িয়া উঠিবে না? তোমার আশ্বাস পাইলাম, তোমার দর্শন আমায় দিয়াছ, তাহার প্রতিষ্ঠার কি সুযোগ তুমি গড়িয়া তুলিবে না? আমার জীবনের সকল বাধা কি রাধারূপে গড়িয়া উঠিবে না? অন্ধকার কি অন্ধকার থাকিয়াই আলোরূপে পথ খুলিয়া দিবে না? সারা জীবন তো 'knock' করিলাম, 'শেরে অস্য সর্বে পাম্পানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম। 'চরৈবেতি চরৈবেতি'—ঠাকুর, চলিতে দাও। যতটুকু পারিয়াছি সারা জীবন মানুষের সেবা করিয়াছি, সম্বন্ধের মর্যাদা আমি প্রাণপণ করিয়া রাখিয়াছি, সম্পর্কের অপমান আমি করি নাই। সে হিসাবে আমি মুক্ত। বাড়াবাড়ি করি নাই। প্রয়োজন যখন হইয়াছে, ছাড়িয়াও চলিয়া আসিয়াছি। ২৪শে মে

ঠাকুর, তুমি যদি বিশ্বের বুক মথিত হইয়া প্রকাশিত না হও আমি কেমন করিয়া তোমায় প্রকাশ করিব? বাহির হইতে চাপাইয়া দিলে তো তুমি বিশ্বের হইবে না। আমার জীবন ও বিশ্ব জীবন পারস্পরিক মন্থনের ভিতর দিয়া চলিব। সেই মন্থনের ভিতর দিয়া তুমি প্রকট হইবে। যাহা বাধা, প্রাণ তাহারই সঙ্গে মৈথুন করে। বিশ্বে যাহারা প্রচারিত হইয়াছেন, বাধা মন্থন করিয়াই হইয়াছেন। তোমাকে তো আমি প্রকাশিত দেখিতে চাই। তুমি বিশ্ব সমস্যার সমাধান। সকল ঘটনার চরম ও পরম পরিণতি ও বিবর্তিত রূপ তুমি। সনাতন তুমি সনাতন থাকিয়াই হইবে নবীন। সকল দুর্যোগকে দুর্যোগ রাখিয়া তুমি সুযোগে গড়িয়া তোল, প্রকাশিত হও। বেলা ১টার পরে ব্যাঙ্ক পোষ্টাফিস রাইটার্স বিল্ডিং প্রভৃতিতে যায়। ৪টায় নীরোদ সে আসে। আগামী রবিবার ৪টায় অশ্বিনীনগর কলোনী ও চিত্তরঞ্জন কলোনীর অধিবাসীবৃন্দ আমার নরনারায়ণ আশ্রম সহ সেখানে যাওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্য এক অভিনন্দন পত্র দিতে চান। ভূপতিবাবুর সঙ্গে নীরোদ-বাবুর কথাবার্তা হইয়াছে, সুরেনবাবুও রাজী। আমি সকালেই যাইব, ওখানে যাইব। প্রাণ হাতে লইয়া কাজ করিস। ভক্তদের সাথে লড়ি দিতে হবে পাড়ি ধাঁচি কিংবা মরি! ইহারা যদি প্রাণপণ খাটিতে পারিত, আমার খাটুনি কম হইত। খাটুনি অর্থই সর্বসূত্রের সঙ্গে মন্থন। সর্ব সূত্রের সঙ্গে জীবনের মন্থন না হইলে নিত্যগোপাল স্পষ্ট হইবেন কোন্ পথে? মানুষের ঘাড়ে তো নিত্যগোপালকে চাপাইয়া দেওয়া চলিবে না—ইহাই হইল 'আমাকে ফেরি করিও না' এই বাণীর অর্থ। ফেরি করিব না, বুকের তাজা রক্ত দিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিব। বুকের রক্ত দিয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা গড়িয়াছে। সেই ছুটাছুটি সেই আধি আবার আসুক আমার জীবনে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই হইবে। 'শেরে অস্য সর্বে পাম্পানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ'। আমি 'শ্রম' করিব। বিশ্রাম করিতে আমি আসি নাই। 'শ্রম'-ই আমার জন্য ব্যবস্থা। শ্রমই বুঝি উপ-জীব্য। যোগেন সরকারের এক এনভেলাপ বেণুর কাছে আসিয়াছে। পরিকল্পনা সম্বন্ধে যেন লিখিয়াছে: পরিকল্পনার অর্থ ছুটাছুটি, অনাহার, অনিদ্রা আর অর্থ-সংগ্রহ। স্বামীজীর অদম্য উৎসাহ, dynamic personality আর তোমার মত একটী মা আছে, তাই ভরসা আছে। ২৫শে মে

ঠাকুর, আমার সকল দুর্যোগ তুমিই। যাহা আমার

কল্যাণকর, তুমি তাহাই ব্যবস্থা করিতেছ। সকলের তো সব হয় না। আমার জন্য শুধু অসহায়তা, একাকিত্ব ও দুর্যোগই আমার জীবনের সুযোগ। 'সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই'। বিশ্বের মূলে এতদিন ব্রহ্ম যে অনাদর প্রকৃতিকে করিয়াছেন, তাহারই ফলে প্রকৃতি আজ কিন্তা, একান্ত দুর্যোগরূপে পরিণতা। ব্রহ্ম আজ পুরুষোত্তমরূপে প্রকৃতির চরণতলে মান ভিক্ষা করিতেছেন—'দেহিপদপল্লবমুদারম্'। আজও কি মান ভাঙিল না? এই 'মান' দান করার দর্শনই তো নিত্যগোপাল নিয়া আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মান দান করিলেন, কিন্তু দর্শনে তো সেই মান দান করা হয় নাই। তাই ঠাকুর, তুমি এলে সেই মানদানের শাস্ত্র লইয়া। তোমার জয় হউক। সকালের খাস্ত গত কল্য হইতে 'লপ্‌সি'। কুমারের জন্য এক পোয়া ঘৃত আনে সে নিজে। রেণু ও কুমার বাহির হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ও ঠাকুরের বই বিক্রয়ার্থ বিল করিয়া সুবোধবাবুর কাছে দিয়া আসে। অমরবাবু আবেদনটায় সই করিয়াছেন। রেণু প্রিমিয়ার হইতে ব্লক আনিয়া প্রেসে দিয়া আসে। কুমার তাহার শরীর লইয়া বিব্রত। ভিখারীর মত কাহারও কাছে কিছু চাহিতে নাই। চাহিতে হয় দাতার বুকের মধ্যে আসিয়া তাহার সঙ্গে এক হইয়া। ভিখারীপণায় কতটুকু মিলিবে? তাহাও তো অনাদরে পূর্ণ। বাহিরে দাঁড়াইয়া, পৃথকস্বার্থ লইয়া আমার কাছে কেহ কিছু চাহিলে আমার প্রাণ নারাজ হয়। দিবার জন্য যে উন্মুখ, তাহার কাছে বাহির হইতে চাওয়া কেন? দেওয়া পাওয়ার টানাটানিতে খুদকণা ছাড়া আর কি মিলিবে! প্রবিক জোর জুলুম করিয়া কি পাইবে? যাহা পাওয়া যায় তাহা প্রাণহীন বলিয়া ভবিষ্যতে তাহা লইয়া বিপন্ন হইতেই হইবে। স্বার্থের টানাটানিতে স্বার্থের হানিই হয়। স্বার্থে স্বার্থে এক হওয়াই পাওয়ার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ২৬শে মে

মনমোহন নিত্যগোপাল, তুমি পোষণের দর্শন নিয়া আসিলে, রাধিয়া গেলে ধরার বুকে। ব্রহ্মের শোষণ হইতে মায়াকে মুক্ত করিয়া মায়ার স্বাধীনভর্তৃকা মূর্তি তুমি প্রকট করিলে। আমার জন্যই কি এই দর্শন রাখিয়া গেলে? আমি কি এই ভার বহিতে পারিব? বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিব? তোমার পতাকা মারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি। তোমার সঙ্গে একান্ত হইয়া আমি চলিতেছি। ভার বহিবার মত শক্তি দেও। দিন তো গেল। প্রথমে তুমি আনিলে দর্শন-শাস্ত্রের ভিতর বিপ্লব, সব শোষণের বাধাকে গড়িয়া তুলিলে পোষণের ভাষ্যে। কি অদ্ভুত তুমি! তোমার দর্শন তাহার নিজের যোগ্যতায় ও বিশ্বের প্রয়োজনে প্রকাশিত হইবেই; আমি শুধু তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিব। আমি যেন তাই পারি—এই ভিক্ষা। আমার প্রাণ তুমি, সকল সংঘর্ষের মাঝে তুমি পৌরুষ মূর্তি। রেণু সকালে বাহির হইয়া যায়। গ্রামোফোন কোম্পানীতে যায়, ফেরে এখানে ১২টা মত। বিজ্ঞাপন অর্ধ পৃষ্ঠা পায়। ২টার পর প্রেস ও ব্যাঙ্কে যায়। সাধারণ নিয়ম আছে ৫০০৲ টাকার কম টাকা দিয়া এ্যাকাউন্ট খোলা যায় না—এজেন্ট বলিয়াছেন, এ নিয়ম আপনার সম্বন্ধে নয়। আপনি যে কোনও টাকা দিয়া খুলিতে পারেন—মনোগ্রামে আশ্রমের একটি প্রস্তাব চাই। General Bo.ly-র তরফ হইতে একটী প্রস্তাব ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলিবার জন্য করা হইল। সকালের দিকে পাবনার বিমলানন্দ রায় আসে। তাহার সঙ্গে ঠাকুরের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বোঝে কিছু।···চিন্ময় এক ইনভেলাপ আনে—তাহার ব্যর্থতার কাহিনী। ইহারা কেন্দ্রচ্যুত। ইহাদের হাত পা বাঁধিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধির মধ্যেই ইহাদের বিপদ ঢুকিয়া আছে। আমার পরিকল্পনা লইয়া থাকিলেই তো সব দিক রক্ষা পাইত। গড়িবার আনন্দ, স্থিতির আনন্দ, পুরাতন ভাঙিবার আনন্দও আছে, অর্থসংস্থানও আছে। এমন 'ডিভস' হইবার পরিকল্পনা কয়টা আছে? ২৭শে মে

নিত্যগোপাল, ব্রহ্মে স্বাধীনভর্তৃকা রাধারাণী যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, তুমি সেই বিপ্লবকেই সর্বক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া গেলে, বিপ্লবের বীজ তুমি দর্শনের ক্ষেত্রে, পরে মনন্তরে, ব্যক্তিতে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে বুনিয়া

গেলে। আজ তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তোমার নাম রূপ রসের সিঞ্চন ব্যতীত তাহা কি করিয়া পুষ্ট হইবে? এই abstract বিশ্বস তোমার জীবনের concrete রসে পুষ্ট হইবে, জাগিয়া উঠিবে, মূর্ত হইবে। আমাকে বিশ্বধী কর, সর্বসংস্কারমুক্ত কর, সহজ মানুষ কর। আমাকে জাতি-কুল শীল-সংসার-সন্ন্যাস ছাড়া কর। এমনই এক টানে শ্রীগৌরাঙ্গের 'খাইতে সোয়াস্তি নাই নিদ নাই চোখে'। তুমি আমার মন আকর্ষণ কর। কুমার বিশ্বভারতী, এ মুখার্জী হইতে চেক দুইটী আনে।···সন্ধ্যার পর শৈলেন্দ্র ঘোষ দস্তিদার আসে। তাহাকে পত্রিকা ও পরিকল্পনার কথা বলি।···বাকইপুরের বরেন্দ্র বসু আসে।···নীলু কাল বাগুইআটীতে যাইতে পারিবে না। পাবনা হইতে লক্ষ্মীর চিঠি আসিয়াছে।···ধীরেনকে একখানা রসিদ বই দেওয়া হয়।···পূর্ণ বাগচী, নিকুঞ্জ মাইতি ও বসন্ত দাস কেহ পরিকল্পনার প্রাপ্তি স্বীকারও করিল না। সহি চাওয়া হইয়াছিল। ২৮শে মে

নিত্যগোপাল, তুমি 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ। সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ। সাক্ষী চেতাঃ কেবলঃ নির্গুণশ্চ।—তুমি সর্বভূতগুহাশয় থাকিয়া, সকল ভূতের বুদ্ধি-গুহায় থাকিয়া তোমার প্রাণ-দর্শন শোন। জাগ, সারা জীবন তোমায় জাগাইতে পথে পথে কাঁদিলাম, পারিলাম কই? তোমাকে এখন শুনাইব। তুমি না জাগিলে সর্বভূত জাগিবে না, সর্বভূত না জাগিলে তোমার দর্শন তোমার জীবন যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমি কত কাল dull-ear-এর কাছে তোমার দর্শন শুনাইব? ওগো শোন, সর্বভূতের অন্তরে থাকিয়া কান পাতিয়া শোন। সর্বভূত উন্মাদ হইয়া তোমার জীবনের গান শুনুক। ৭টার পূর্বেই আমি কুমার রেণু গোপা ট্রামে এসপ্লানেড শ্যামবাজার হইয়া সেখান হইতে বেবী ট্যাক্সীতে বাগুইআটী যাই। নীরোদবাবুর বাসায় যাই···। ৪টায় সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি প্রথমে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পরে ডাঃ সুরেন সেন গেলে তিনি হন। সুরেন সেনেরই সভাপতি হওয়ার কথা ছিল। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম কি, তাহা বলিতে গিয়া 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ' শ্লোক বলি। পরে গিরিধারী প্রসঙ্গ। আজিকার আলোচ্য বিষয় ছিল 'যুগ-সমস্যায় শ্রীকৃষ্ণ'। প্রথমে ভূপতি সেন, পরে হেড মাষ্টার মহাশয় আমার নরনারায়ণ আশ্রম লইয়া যাইবার সঙ্কল্পের জন্য অভিনন্দন জানান। গিরিধারীতে জড়-অজড় সমন্বয়ের সাধনার দিকটাই শ্রীনিত্যগোপাল স্পষ্ট করিয়া ধরাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ পাইয়াছে, এইবার শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীকৃষ্ণ পাইবে। জড়ের ব্রহ্ম-মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই কম্যুনিজম পরিপাক হইয়া যাইবে। প্রাণ-দর্শন আমি প্রচার করিব ঝড়ের মত। রেণু পরিকল্পনাটি পড়ে। সকলেই প্রাণ খুলিয়া সহযোগিতা করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন।···ভূপতি সেন ৫০৲ টাকা দিবেন, প্রথম কিস্তিতে ১৫৲ টাকার চেক দিয়া দিলেন।··· ৭-৫৫-র গাড়ী আসে ৯-১০-এ, ছাড়ে ৯-২০-তে। পৌঁছাই ১১টার একটু পূর্বে। ···বরিশাল সেবা সমিতি হইতে বিমলানন্দ রায়···নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়া যায়···। চিত্তরঞ্জন কলোনীতে হিন্দুবিদ্যাপীঠের আজিকার সভার বিজ্ঞাপন যুগান্তরে বাহির হইয়াছে। ২৯শে মে

নিত্যগোপাল, 'শিবঃ ভূত্বা শিবং যজেৎ' এই শাস্ত্র কথামত আমিও তোমাময়, তোমার 'আমি'-র ভিতর আমার আমি বিসর্জন দিয়া তোমার পূজা করিব, এই সংসার গতি-পথে চলিব। এই সংসার তোমারই পূজা মণ্ডপ। তুমি আর আমি আর পথ—এই তিনটিই আমার জীবনে সত্য। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় পথে, প্রাণ-পথে যেখানে সকল জাতির অহঙ্কার, কুলের গর্ব, শীলের অত্যাচার বন্ধ। আমি জাতি কুল-শীল ছাড়া প্রাণপথ ধরিয়া তুমি আমি একাত্ম হইয়া এই সংসারকে পথের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া গড়িয়া তুলিব। তোমার আমার ও সংসার-পথের অন্তোন্যমৈথুনে নিত্য বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে। তোমার ধর্ম-গ্লানি দূর করা রূপ প্রয়োজন পূর্ণ হউক। তোমার প্রয়োজনেই আমার প্রয়োজন। তোমার প্রয়োজনেই আমি বাঁচিব, মরিব। তোমার জয় হউক বিশ্ব-জীবনে। সকালে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ছোট জামাতা নরোত্তমপুরের নগেন্দ্র রায় (আমার মামাতো ভাই জিতেনের শ্যালক) আসেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

স্মৃতি-সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য। সভা কাল সন্ধ্যায় চারুচন্দ্র কলেজে সন্ধ্যা ৬॥। সন্ধ্যায় 'মনোরঞ্জন জীবন-চরিত' দিয়া যান। আজ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অই ইণ্ডিয়াতে বঙ্গনারায়ণ আশ্রমের একাউণ্ট খোলা হয় ২০০৲ টাকা দিয়া। রেমু প্রেস প্রিন্সিয়ারে যায়। কুমার প্রাবোকোন কোং-তে প্রুফ দেখাইয়া আনে। হরিদাসী এটা ওটা পাঠাইয়া দেয়।··· ৩০শে যে।

রাধারাণী আমার, পরাণ পুতলী আমার, তুমি বিশ্ব প্রকৃতির পুরুষোত্তম ভাবে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত পরিণত রূপ। তোমাকে অযাচিত করুণায় হৃদয়ের দুয়ারে পাইয়াছি। কিন্তু এ কি সাজে এসে হৃদয়পুর মাঝে? রাজরাজেশ্বরী হইয়াও এ কি ভিখারিণী যোগিনী রূপ! তুমি অভিসারিণী। সারা জীবন সর্বভূতের মাঝে কৃষ্ণ অন্বেষণ করিয়া 'কৃষ্ণেমু কৃষ্ণেমু বিচিত্য' চলিয়াছ। আজও সে অন্বেষণের শেষ হয় নাই। অভিসারিণী রূপেই যে তুমি অনন্ত। এই প্রকৃতি কোনও দিনই একান্তভাবে পুরুষোত্তম-ভোগ্য হইবে না, তাঁহার কাম লালসাও কোন দিন নির্বাপিত হইবে না, সৃষ্টিও কোনওদিন বন্ধ হইবে না। কৃষ্ণ তোমাকে ধরিতে হার মানিয়াছেন, তুমিও কৃষ্ণকে ধরিতে হার মানিয়াছ। পারস্পরিক এই পরাজয়ের মধ্যেই বিশ্ব সৃষ্টি অনন্ত। তোমার জয় হউক। কাঁথির কয়ন্ত দাসের চিঠি ও সই আসিয়াছে। ঠিক ৬টায় আমি ও নগেন বাবু চারুচন্দ্র কলেজে পৌঁছি। ৬৷ টার পর সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রথমে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত। পরে একটি কবিতা, পরে আমার বক্তৃতা। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার জীবনের সকল কার্য যে সূত্রটি ধরিয়া বোঝা যায় তাহা হইতেছে—'বালা কাল হইতে আমি কোন বিপদকেই বিপদ জ্ঞান করি নাই, এমন কি আমি বিপদে ও অসুবিধায় পড়িতে ভালবাসিতাম। যে কর্ম অতি সহজে সম্পন্ন হইত সে কর্ম করিতে আমার উৎসাহ হইত না, যে পথে চলিতে কষ্ট নাই সে পথ আমার ভাল লাগিত না'। আরামের জীবন তাঁহার ছিল না। একটা বেদনায়, একটা আলায় তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। বেদনা ছাড়া কেহ কিছু গড়িতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পরে এই বেদনার জীবনের আরও প্রয়োজন: বেদনার ভিতর দিয়া মানুষের সঙ্গে যুক্ততা ও মিলন আসে, তখন তাহার বুক ধ্বনিত করিয়া স্বরাজ গড়িয়া উঠে। অতীত গভীর শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া বর্তমান হয়। এইসব জীবনের প্রসঙ্গ আজ ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে। প্রতিভা বিষ্ণু হাটিয়া গিয়াছিল, আসিবার সময় হেমেন্দ্রবাবুর ট্যাক্সীতে আমরা আসি। কুমার তবু হাঁটিয়া আসে। বিমলানন্দ রায় আজিও আসিয়া ফেরত গিয়াছেন। উত্তরভারত আজও আসিল না।

৩১শে মে

নিত্যগোপাল, আমাদের সকল জড়তা অবসাদ কাটাইয়া আমাদিগকে নবীন জীবন প্রদান কর। সকল অঙ্গের রস নিংড়াইয়া তোমাকে ব্যষ্টি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব-জীবনে গড়িয়া তুলিব। আমার জীবন ধন্য হউক, তুমি প্রকাশিত না হইলে কাহাকে ধরিয়া বর্তমান সমস্যা-পীড়িত বিশ্ব উদ্ধার পাইবে?

ক্রমশঃ

"The Governor of Assam Sree Sukthankar said·····If philosophy is to be of any use to him at all, it must comeout of its ivory tower and relate itself to the scientific, educational, moral, religious, social, even political issues of our times, with a view to provide an answer to these complex questions in each of these fields'.—Amrita Bazar, 29th Dec.'59

আদ্যাশক্তির আরাধনা

। শ্রীহরপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ ।

কল্প কল্পান্ত কাল হতে জগজ্জননী অপর্ণার অর্চনা আরাধনা। শ্রুতি দেবী দুর্গার বন্দনা গানে মুখরা। ঋক্ বেদের দেবী সূক্তে মহামায়ার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে···

'অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাম্
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥"

আমি রাষ্ট্রীসম্পদদায়িনী, চিতিশক্তি, যজ্ঞ অধিকারিণী প্রথমা, অধিতীয়া। দেবগণ আমাকে বহুরূপে অবস্থান করতে দেখেন। আমিই এ নিখিল বিশ্ব ধারণ করে রয়েছি।

উপনিষদের মন্ত্রমূর্তির ছন্দে তিনি আবার অতুলনীয় লাবণ্যময়ী উমা মূর্তিতে দর্শন দিয়েছেন। কিন্তু এ মেয়ে সাধারণ মেয়ে নয়। তাঁর কটাক্ষ বিক্ষেপে, ভ্রূভঙ্গ লীলায় সৃষ্টি স্থিতি লয় সংঘটিত হয়। তিনি অঘট ঘটন যাত্রা পটীয়সী মহামায়া। দুর্দম দৈত্য মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ, চণ্ড মুণ্ড, ধূম্রলোচন, রক্তবীজকে বধ করে তিনি দনুজ দলনী। তিনিই আবার মানুষের মুক্তি বিধানের জন্য প্রসন্না হয়ে ধারণ করেছেন বরদার মূর্তি—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'।

দেবী ভাগবতের পূত আখ্যানে এ মায়ের সত্য স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। প্রলয় পয়োধিজলে শ্রীবিষ্ণু বট পত্রে শয়ান। ভগবানের নাভিপদ্ম হতে আবির্ভূত হলেন ব্রহ্মা। এমন সময় বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উদ্ভূত মধু ও কৈটভ দৈত্যযুগল বিধিকে গ্রাস করতে হল ধাবমান। বিপদ দেখে ব্রহ্মা যোগমায়ার স্তব করলেন। তবে তুষ্টা হয়ে দেবী দুর্গা শ্রীহরির দেহত্যাগ করলেন। বিষ্ণু শয্যা ত্যাগ করে অমিত বিক্রমে প্রবৃত্ত দৈত্য দ্বয়কে চেপে ধরলেন। বহুবর্ষ সংগ্রামের পর দানব দু'জন নিহত। তখন শ্রীবিষ্ণু একমনে জপ করতে লাগলেন। এই দৃশ্যে বিধি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আপনি ত্রিভুবনেশ্বর হয়ে কার আরাধনায় এ মন্ত্র জপ করছেন'? কিং বং জপসি দেবেশ! / স্বতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি বৈ'? বিষ্ণু প্রসন্ন আননে উত্তর দিলেন, 'বিধি, তুমি স্বয়ং পরম বিজ্ঞ। একবার ঐকান্তিক চিত্তে চিন্তা করে দেখনা! সত্য ঘটনা এই যার আরাধনায় আমি তন্ময় তিনি ব্রহ্মময়ী আদ্যা শক্তি —যেখানে যত তেজ যত শক্তির উদ্ভব সবই ঐ লীলাময়ীর লীলা'।

বস্তুতঃ এ জগৎ মহামায়ার বিভূতি—কেমন করে স্থাবর জঙ্গম সর্বত্র তাঁর নিত্য লীলা চলছে—এ নিয়ে আলোচনার অন্ত নাই। ঋষি অরবিন্দ তাঁর 'The Mother' গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষে ঘোষণা করেছেন, 'The Mother as the Mahashakti of this triple world of ignorance stands in an intermediate plane between the Supramental Light, the Truth life, the Truth creation which has to be brought down here,' অজ্ঞানের এই ত্রিধা জগতের মহাশক্তি রূপে যা দাঁড়িয়ে আছেন একটি মধ্যবর্তী লোকে ঊর্দ্ধে রয়েছে অতিমানস জ্যোতি, সত্যাত্মক জীবন, সত্যাত্মক সৃষ্টি—যা এখানে নামিয়ে আনতে হবে।

প্রাচীন ঋষি যাঁরা সাধনের তা এ তত্ত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন—বৈজ্ঞানিকগণ অন্তভাবে আদ্যাশক্তিকে অনুভব করেছেন—এই বাইরের স্থূল জগৎ আলোকের স্পন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। ইথরে নানারূপ স্পন্দন হচ্ছে—আমরা তাকে রূপ, রস, গন্ধ, মানুষ, কীট, পতঙ্গ রূপে দেখতে পাচ্ছি। আমরা মন দিয়ে এ সমস্ত উপলব্ধি করছি। আমাদের মনের পশ্চাতে বোধস্বরূপ চৈতন্য

রয়েছে বলে আমরা ঐ সমস্ত জ্ঞাত হচ্ছি। সেই মহাশক্তি একরূপে জড় মন ও আকাশ হয়ে রয়েছেন আর একরূপে চেতন হয়ে রয়েছেন আর দুয়ের সংযোগে জগৎ বলে একটা পদার্থের জ্ঞান হচ্ছে। মায়ের দুটি শক্তি—আবরণ শক্তি, অন্যটি বিক্ষেপ শক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "শক্তিই জগতের মূলাধার। তিনিই মহামায়া জগৎকে সৃষ্টি করে স্থিতি প্রলয় সাধন করছেন। তিনি পথ না ছাড়লে সচ্চিদানন্দকে লাভ করা সম্ভব নয়। সেই আদ্যাশক্তির ভিতর বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে; অবিদ্যা মুগ্ধ করে এবং বিদ্যা যা ঈশ্বর পথে নিয়ে যায়। অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি"।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দও জানিয়েছেন—'শক্তিকে কাহারও অস্বীকার করবার যো নাই, 'পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ'।···শক্তির আলিঙ্গন ব্যতীত ব্রহ্মের কোন সৃষ্টির কথাই উঠতে পারে না···শক্তির চরণ-তলে লুটিয়ে শিব শক্তিময়, শক্তিময়ী। গোপীগণ এই মহাশক্তির পূজা করে পরাশক্তিময়ী হয়ে কৃষ্ণসহ রাসলীলা আস্বাদনে ধন্য হয়েছিলেন'। তিনি আরও বলেছেন "সত্যই কাত্যায়নী পূজায় সব বিকল্প দূর হয়। বিকল্প বসন বর্তমান জগৎকে একেবারে আবৃত করে ফেলেছে। বিকল্প বসন হরণের জন্যই আবার যুগের বুকে যমুনার তীরে অন্ধকারের রাজ্যে শক্তি পূজার মঙ্গলঘট স্থাপন করতে হবে নচেৎ এ জাতির কল্যাণ নাই"।

স্বামীজির এই সতর্ক বাণীকে আমাদের আজ স্মরণ করতে হবে। পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তির প্রকৃত আরাধনা আজ নাই। দেশে দেশে স্বার্থ দম্ভে পূর্ণ মায়ের পূজা। তাই শুভঙ্করী শঙ্করী ভীষণা ভয়ঙ্করী। অনাচার ব্যভিচারে ভুবন পরিব্যাপ্ত। হিংসায় মত্তা মেদিনী। নাই আমাদের আজ নিবেদন—নাই অন্তরের আর্তি। তাইতো আমাদের সমাজ জীবনে জমাট বাঁধা গ্লানি। মহামায়ার বিশ্বময়ী মাতৃমূর্তিকে হৃদয়ের মৌন গেহে সেবাহুতির পক্ষ প্রদীপে আরতি করতে হবে। আমাদের এই দুর্দিনে মা কি নীরব থাকতে পারেন? সন্তানের শত অপরাধেও জননী তো অবশ্য বিলিয়ে থাকেন। আসুন আমরা আকুল কান্নায় উতরোল হয়ে মায়ের রাঙা পায়ে আমাদের প্রাণ-পদ্মটি অর্পণ করি। তাঁকে জানাই—

"অর্ঘ্য তোমায় আনিনি ভরিয়া বাহির হতে
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে।"

সোচ্চার

। শ্রীগণেশ চক্রবর্তী ।

সেদিন আমার বুকে তোমার প্রথম পরশ
কবির চোখে শরতের রূপালী চাঁদ
নিজের পক্ষ মেখে নিষ্কলুষ নীলিমায়।
আজ তোমার বুকে আমার উষ্ণ নিঃশ্বাসের ছায়া
চাঁদের অধরে কবির অধর উচ্ছল।

সেদিন তোমায় আমায় নিয়ে ওরা লেখে—
লেখে ক বিতা—
লেখে প্রেমের রূপক ছন্দ—
তুমি তখন গ্রাম ছেড়ে শহরের ফুটপাথে
মুছে যাওয়া হাজারো সম্ভাবনার
সংখ্যা বাড়িয়ে হাজার এক।
আর আমি—?
আমি তখন পথে পথে
ঘর-ছাড়াদের ঘরের কথায় সোচ্চার।

যে বই আজও পড়া হবে, কালও পড়া হবে

গ্রন্থ তালিকা

রামায়ণীর বই

আমরা সবাই একসঙ্গে
—রমাপদ চৌধুরি — দশ টাকা

বিমূর্ত পাপ
—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ — নয় টাকা

নয়নচ্ছায়া
—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় — আট টাকা

ডাকবাংলো
—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় — সাত টাকা

সোনার মলাট
—তারাশঙ্কর — আট টাকা

নক্সাকাটা ঘর
—আশাপূর্ণা দেবী — সাত টাকা

অন্নপূর্ণা অভিযান
—গৌরকিশোর ঘোষ — তিন টাকা

লেখকের লেখক দস্তয়েফস্‌কি
—যজ্ঞেশ্বর রায় — কুড়ি টাকা

নিরুপায় মনের আকাশ
—গৌরি শঙ্কর ভট্টাচার্য — ছয় টাকা

সেই জলছবি
—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় — সাত টাকা

ভিয়েতনামে কিছুদিন
—সুভাষ মুখোপাধ্যায় — দশ টাকা

সূর্যমুখী
—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী — নয় টাকা

ঋষির বন্ধু
—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় — ছয় টাকা

আমার আয়নার মুখ
—সমরেশ বসু — সাত টাকা

ভালো আছো
—গোপাল সামন্ত — দশ টাকা

তেলের দারোগা তেলআবিভ
—কমল চৌধুরী — ষোল টাকা

রক্তকেনিল সমুদ্র
—রবীন মুখোপাধ্যায় — ছয় টাকা

ইতিহাসের বালুবেলায়
—তরুণ কুমার মজুমদার — আট টাকা

আকর্ষণ
—বিমল কর — আট টাকা

মর্তের আড়ালে
—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — এগার টাকা

জটিল জলস্রোত
—সমীর রক্ষিত — নয় টাকা

আমার কর্ণ আমার দুর্যোধন
—শৈলেন রায় — নয় টাকা

এই কড়ি খেয়া পারানির
—কৃষ্ণ ধরাধি — নয় টাকা

হৃদয়পুর
—শক্তি চট্টোপাধ্যায় — ছয় টাকা

এই আমার বিষ, আমার জীবন
মণীন্দ্র রায় — চার টাকা

শিক্ষা ও সাহিত্য
—প্রবোধরঞ্জন চক্রবর্তী — ছয় টাকা

প্রাথমিক শিক্ষক-দর্পণ
—মুখার্জী ও ঘোষাল — কুড়ি টাকা

প্রাথমিক শ্রেণীতে ইংরেজি পড়ানো
—সুখময় সেনগুপ্ত — সাড়ে চার টাকা

রামায়ণী বাংলা অভিধান
—সুধাংশুশেখর গুপ্ত — ষোল টাকা

● রামায়ণীর আসন্ন প্রকাশিত ●

পুস্তক তালিকা

কৈশোর যৌবন—রমাপদ চৌধুরী
রক্তা নদীর ধারে—কুমার মিত্র
সেই উত্তম নায়ক - কবিতা সিংহ
উদয়শঙ্কর—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
একালের বাংলা গল্প—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
একালের বাংলা গল্প—বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স কলকাতা

৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

দৈব আশীর্বাদের মত

দুর্গাপুজো হলো নানারঙের আলো-ঝলমল খুশির উৎসব। কিন্তু যাঁরা প্রতিমা গড়েন, উৎসবের অন্তরালে সেই মৃৎশিল্পীদের দিন কাটে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে। ব্যবসার মরশুমে পুঁজির জন্যে বেশীর ভাগ মৃৎশিল্পীকেই হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে। ফলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত টাকার অনেকটাই চলে যায় চড়া সুদের ধার মেটাতে। পরিশ্রমের অনুপাতে লাভ থাকে না।

একটা বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৯ সাল থেকে ইউবিআই মৃৎশিল্পীদের সাহায্য করে আসছে। ইউবিআই-এর আর্থিক সহায়তায় এখন তাঁরা ব্যবসার মরশুমে প্রতিমা-নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ একবারেই কিনে নিতে পারেন। মাটি, খড়, রঙ, সাজপোষাক, অলংকার —এমনি কতকিছুই তো সময়মত কিনে রাখতে পারলে ভালো। পুজোর বিক্রির পর ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করতে হয়।

পুজোর সময় ইউবিআই-এর সাহায্য তাই মৃৎশিল্পীদের কাছে দৈব আশীর্বাদের মত নেমে আসে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-9-71B

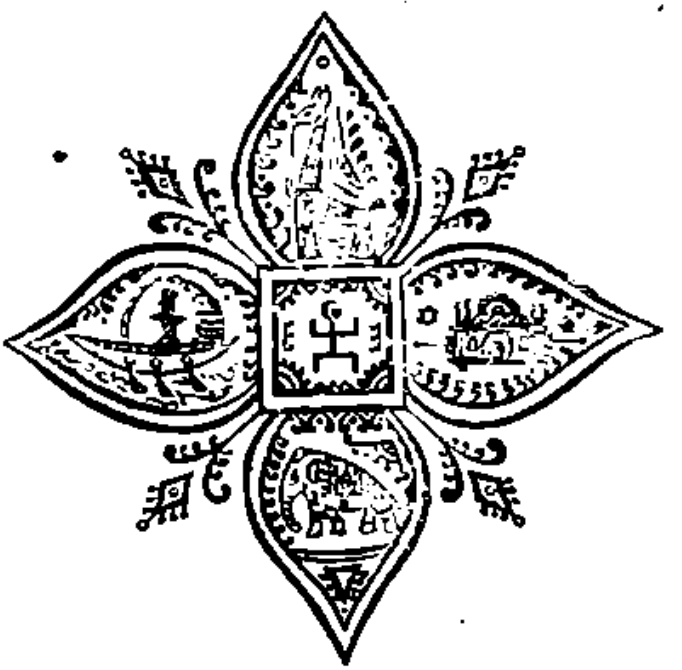

অনেক ছুটি পার হ'য়ে আবছের দিনগুলিতে ফেরা...
অলস বেলায় চাঁপার ঘ্রাণ...
শিরশিরিয়ে ওঠে হাওয়া শিশিরে শিউলিতে আনন্দে...
কাছে আসার আকুলতায়
ঘুঙুর বাঁধির টানে চঞ্চল দিন...

দূর হোক বিকট, বিকট হোক নিবিড়
পথপরিক্রমা ঋজু হোক, বিবিধ হোক

পূর্ব রেলপথ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১২·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	১০·০০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks	৭·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৫·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫·৫০
বাংলার ঋষি	৫·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
জীবন গড়া	·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
আচার্য জগদীশ	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০০
মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বঙ্কিমের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	৩·০০
ছোটদের সেরা গল্প	৪·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

ছড়ায় ছড়ায়	১·৫০
শিশু রামায়ণ	১·৩০
শিশু মহাভারত	১·৩০

শিক্ষা বিষয়ক বই

আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি—শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত	৭·৫০
শিক্ষা—শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত	১০·০০
আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি	১৪·০০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত ও শ্রীরমণী সেনগুপ্ত

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা	১৪·০০

শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত

শিক্ষা-বিজ্ঞান—শ্রীযতীন্দ্র চৌধুরী	৪·০০
শিক্ষার ইতিহাস—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বসু	

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাসের

তরুণ তুর্কী	৩·০০
ভয়ঙ্কর আফ্রিকা ১ম, ২য়	৩·২৫
বেদুইনের দেশে	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৩·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন	২·৫০
সরল যোগ-ব্যায়াম	৩·০০
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৫·০০

শ্রীরমেশচন্দ্র সরকারের

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী	৬·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মধ্যাকৃতি অভিনব বাংলা অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

২৪ পরগণা জেলায় স্বনিযুক্তি কর্ম সংস্থান প্রকল্প ও অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কর্মসূচীর কাজ এগিয়ে চলেছে :

* জেলার প্রগতিশীল বেকার শিক্ষিত যুবকরা কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, রসায়ন সিরামিক ও অন্যান্য বিষয়ে নূতন নূতন শিল্প সংস্থা গড়ে তুলেছে।
* ৬৩৭টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।
* ২৭৮টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।
* ৬৬০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক প্রকল্পের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
* ৯১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে।
* ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে সরকার থেকে।

ব্যবসা করতে গেলে মূলধন লাগে। প্রয়োজনীয় মূলধনের ৯০ শতাংশ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন আর্থিক সংস্থা থেকে পাওয়া যাবে। বাকী ১০ শতাংশ সরকারী ঋণ হিসাবে পাওয়া যায়।

বিশদ বিবরণের জন্য আলিপুরস্থিত ২৪ পরগণার জেলা শাসকের অফিসে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের স্পেশাল অফিসারের (ফোন নং ৪৫-২৪০) সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত।

সূচীপত্র

আশ্বিন-কার্তিক : ১২৮১

১। শক্তি ১০৫
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

২। পূজোর কথা ১০৬
শ্রীবেণু মিত্র

৩। বাংলার চিত্র শিল্পের আদি উৎস ১১১
শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্তী

৪। কেমন আছেন (কবিতা) ১১৫
শ্রীশান্তশীল দাশ

৫। স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ ১১৬
শ্রীসুনীতি সান্যাল

৬। অপূর্ব অতিথিসেবা (কবিতা) ১২৪
শ্রীশুভ্রাংশু চক্রবর্তী

৭। রবার্ট ফ্রষ্ট ১২৫
শ্রীমনিশঙ্কর ভট্টাচার্য

৮। একটি আদর্শ দর্শন : সাধারণ মানুষের চোখে ১৩০
শ্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের বিদেহী ১৯৫৫ ১৩২

১০। আত্মাশক্তির আরাধনা ১৩৯
শ্রীসুনয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

১১। সোচ্চার (কবিতা)
শ্রীগণেশ চক্রবর্তী ১৪০

পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব

—আগামী ৮ই ডিসেম্বর '৭৪ রবিবার—

ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের অবধূত-ভাষ্যকারের

৯২-তম জন্মোৎসবের

বিকাল ৪টার সভায়

আপনাদের সহৃদয় উপস্থিতি

আকাঙ্ক্ষা করি

নরনারায়ণ আশ্রম

সি, সি, কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

—কন্টিনেন্টাল কম্যার্শিয়াল কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড—

৮।১, ডালহৌসী স্কোয়ার (ইষ্ট)

কলিকাতা-১

যাবতীয় অফিস-ষ্টেশনারী ও

ছাপাই-এর কাজ :

টাইপরাইটার—ফাউন্টেন পেন

বিক্রয় ও মেরামত :

—টীল ফার্নিচার—

গ্রাহকের সন্তোষ আমাদের লক্ষ্য

ফোন—২২-৪২৬২

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২, ভূপেন বসু এভিনিউ কলিকাতা-৪

ইন্দোচীনে পাঁচটী রাত

বেদুইন ৮·০০

খুনের পর খুন

চিরঞ্জীব সেন ৫·০০

শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে

শ্রীপান্থবাস ৫·০০

বার্ণার্ড সাহেবের বেগম

নিগূঢ়ানন্দ ৫·০০

রাঙ্গা শিমূল

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ৫·০০

স্বপ্ন-টপ্প আদতে

অমলেন্দু শূর ৫·০০

বিল্লী যখন আঁহাপনা

নিগূঢ়ানন্দ ৭·০০

পুস্তক প্রকাশনী

৮২।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

শারদ অর্ঘ্য

এবার পূজায় হিজ মাষ্টার্স ভয়েস ও কলম্বিয়া রেকর্ডে অনেক জনপ্রিয় শিল্পীর নতুন গান বেরিয়েছে। তা ছাড়া লং প্লে রেকর্ডে বেরিয়েছে—

- ডীলারের দোকানে সম্পূর্ণ তালিকা পাবেন।

★ **রামকৃষ্ণায়ণ** (EASD 1411)
ষ্টিরিও রেকর্ডে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও কথামৃত অবলম্বনে সঙ্গীতালেখ্য।

★ **পূর্ণদাস বাউল** (EASO 1409)
ষ্টিরিও রেকর্ডে বারোখানি বাউল গান।

★ **পূজা ব্লসম্** (ECLP 2524)
পূর্ব পূর্ব বৎসরের পূজার গানের সঙ্কলন।

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস * কলম্বিয়া

"প্রত্যেক ধর্মই সকলের ধর্ম, প্রত্যেক দর্শনই সকলের দর্শন, প্রত্যেক ইষ্টই সকলের ইষ্ট, প্রত্যেক পথই সকলের পথ। প্রত্যেক মানুষ যখন প্রত্যেক ধর্মকে, প্রত্যেক দর্শনকে, প্রত্যেক ইষ্টকে, প্রত্যেক পথকে নিজেরই বলিয়া আস্বাদন করিতে যত্নবান হইবে তখনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যকার মিলন সম্ভব। অন্যথা তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার—এ অবস্থায় মিলন একান্তই বাহিরের জিনিষ হইয়া পড়ে। সমন্বয় বলিতে অতখানিই বুঝায়। জীবনকে অতখানি গভীর ও ব্যাপক করিয়া দেখিলেই অধ্যাত্ম জগতে ও বাস্তব জীবনে একই নীতি অনুসরণের ফলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি মানুষকে একই সঙ্গে এতখানি গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করিতে পারে না। একমাত্র প্রাণের উদার ঔদার্যের মধ্যেই মানুষ এতখানি বড় হইতে পারে। এই পৃথিবীতে এক সময় মানুষ প্রাণ-সাধক ছিল, কিন্তু সভ্যতার মধ্য দিয়া ক্রমে সে একান্ত বুদ্ধিমান হইয়া উঠে, তাই ডিপ্লোমেসি আজ আর শুধু রাজনীতিতে নাই—পিতা-পুত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিবারে পরিবারে ঘরে বাইরে সর্বত্র। এই ডিপ্লোমেসির স্থলে বুদ্ধিকে পরিপাক করিয়া যে প্রাণ-ধর্ম উপনিষদে কীর্তিত হইয়াছে, সেই প্রাণ-ধর্মকে আজ আবার সভ্যতার মধ্যে আনিতে হইবে। ইহাই নিত্যগোপালের জীবন-দর্শন।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, পৌষ ১৩৬২

পুজোয় চাই নতুন জুতো

বাড়ন্ত
পায়ের জন্য
নরম রঙিন আরাম

বাড়ন্ত পায়ের জন্য চাই নরম চামড়ার
আদর যা পা'কে যেমন দেবে পরার
আরাম তেমনি দেবে বাড়ার স্বাধীনতা।

বেলারিনা
সাইজ ৩·৮

মোকাসিন
সাইজ ৩·৮
১· ২

লিলিপুট ১১
সাইজ ৪·৮

লিলিপুট ৮২
সাইজ ৪·৮

লিলিপুট ৪১
সাইজ ৫·৮

লিলিপুট ২১
সাইজ ৪·৮

লিটল্ স্টার ০১
সাইজ ২·৩

Bata
Bata
Bata
Bata

'গঠন কর্ম্ম পদ্ধতি'—মহাত্মাজীর এই বইটির উপরে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত ব্যাখ্যা-পুস্তকখানির একটি সমালোচনা বিগত ৫ই মার্চ ১৯৬৭ রবিবারের আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গান্ধীজি-প্রস্তাবিত কর্মগুলি যে নিছক কর্মই নহে, তাহা যে একটি শাসন-শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা যে প্রাচ্যের ভাবাদর্শ ও পাশ্চাত্ত্যের কর্মাদর্শকে একটি বৃহত্তর সমন্বয়ে মিলাইবার প্রচেষ্টা—সমালোচক সে কথাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদিক পত্রিকা তাহার নির্দিষ্ট সিমটীতে যেমন অপরিহার্য, তেমনি বাসী হইয়া গেলে বাঙ্গালীর ঘরে তাহার স্থান ও মর্যাদা কতটুকু তাহা কাহারও অজানা নাই। অথচ শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ-প্রস্থাপিত চিন্তাধারার অভিনবত্ব একজন নূতন পাঠকের দৃষ্টিতে যেমন সুন্দরভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা জানাইতে এই খানে প্রকাশ করিলাম।

...'স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত মহাত্মাজীর গঠনকর্ম্ম পদ্ধতি বইটী বিশাল বিশ্বের পটে গান্ধীবাদের মূল্য ও যাথার্থ্য যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তার একটি বিরল প্রমাণ। বইটির নাম শুনে মনে হতে পারে যে এটি গান্ধীবাদ প্রচারমূলক একটি মামুলি গ্রন্থ, কিন্তু পড়া শুরু করলে সন্দেহ থাকে না এটি এক অন্য জাতের বই। পড়তে পড়তে লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে আগ্রহ জেগে ওঠে। কোন কোন জায়গায়—যেমন মার্কসবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে—প্রতিবাদে প্রস্তুত হতে হয়, প্রায় সব সময়ই চিন্তা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং বই সম্বন্ধে বোধ করি এইটেই সব চাইতে বড়ো কথা যে মহাত্মাজীর গঠন-কর্ম পদ্ধতি একটি অসাধারণ চিন্তা-উদ্বোধনকারী উদ্যম। যে সব চিন্তাধারার সমালোচনা স্বামীজি করেছেন সে সবের সম্বন্ধেও তাঁর কোনও বিরূপ সংস্কার নেই, আবার যে সব চিন্তাধারার পক্ষ নিয়েছেন সে সবের প্রতিও তিনি যুক্তি ও বিচার-নিষ্ঠ। গান্ধীজীকে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতাদের পাশে দাঁড় করিয়ে ও গান্ধীবাদকে পৃথিবীর বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে রেখে মূল্যায়ন করেছেন।

মহাত্মাজী যে গঠন কর্মের কথা বলেছেন তাকে সামগ্রিক বাস্তব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখতেই আমরা অভ্যস্ত। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এই বহু-স্বীকৃত সীমানা লংঘন করে মহাত্মাজীর গঠন পরিকল্পনার ভিত্তি-স্বরূপ যে-দর্শন তাকেই উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন। এই প্রয়াসের প্রক্রিয়াতে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, গান্ধীজীর গঠন পরিকল্পনাতে প্রাচ্যের অধ্যাত্মচিন্তা তথা ভাবনীতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের তীব্র প্রাণশক্তি তথা কর্মনীতির এক বিস্ময়-কর সমন্বয় হয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অসম্পূর্ণ এবং প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য কেউই পরস্পর নিরপেক্ষভাবে টিকতে পারে না, পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো দুটি তাসের মতো গান্ধীবাদ এক পরস্পর নির্ভরশীল শাসন ও শোষণ মুক্ত পৃথিবীর দিকে পথ-নির্দেশ করেছে। মহাত্মাজীর গঠন-পরিকল্পনার পেছনে এই দার্শনিক সূত্র আবিষ্কার লেখকের মৌলিক অবদান। আলোচ্য প্রসঙ্গে লেখকের পাণ্ডিত্য ও অধিকার, আপন বক্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা, বক্তব্য স্থাপনে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের শক্তি ও স্পষ্টতা বইটিকে এক উল্লেখযোগ্য মনস্বিতার সাক্ষ্যরূপে তুলে ধরেছে। গান্ধী রচনা সংকলন যেমন ইংরাজী থেকে বাঙালী পাঠকদের জন্যে অনূদিত হয়েছে, তেমনই মহাত্মাজীর গঠনকর্ম পদ্ধতি বাংলা থেকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের জন্য অনুবাদ করা উচিত। লেখকের বিরুদ্ধে শুধু একটি বক্তব্য আছে, বাংলা ভাষার উপরে তাঁর দখল তিনি ভালোভাবেই প্রমাণ করেছেন, তিনি কেন মধ্যে মধ্যে ইংরাজী পরিভাষিক বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করলেন?"

প্রতি সংখ্যা ১·০০, বার্ষিক ৬·০০ শারদীয়া ২·০০

শ্রীযুত মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত
নবনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

UNIVERSITY

শ্রীশ্রী

নিজ-ধর্ম- ধারণ-
ভাব-ব প্রকাশ
সমন্বয়। সমন্বয়।
আকার- সমন্বয়।
জড়-অন্নময় চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। ঐক্য-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

"এই বিশ্বই আমার মহাপীঠ

সাধারণ-পৌষ ১৩৮১ ১৯৭৪ সম্পাদিকা—রেণু মিত্র ২৭-তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

উচ্চতার পরশ

অ্যাডমিরাল ১৮
সাইজ ৫-১০

প্যান্থেইল ১৭
সাইজ ১-১১
১২-১, ২-৫

সুপার স্টাইভ ৮৫
সাইজ ৫-১০

রাখী ৪৮
সাইজ ২-৭

এক্সিকিউটিভ ৭১
সাইজ ৫-১০

Bata
Bata
Bata
Bata

উদ্বোধন

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, খ্রী: ১৯৭৪ ২৭-তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বড়ো মানুষ

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

মানুষ অনেক বড়ো। সেই মানুষের দেখা
মাঝে মাঝে মেলে।
অতি সাধারণ বেশ সহজ সুন্দর,
অথচ কী বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল!
কাছে এলে মনে হয়: কী যেন পেলাম,
কী ঐশ্বর্য! কী আলো সে জীবনের চারিধারে বিচ্ছুরিত
বোঝানো যায় না।
অন্ধকার ভরে ওঠে কাছে এলে সেই আলোকের,
অন্তরে গভীর তৃপ্তি অনেক পাওয়ার!

কী এক নৈরাশ্যে ভরা জীবনের দিনগুলি
কেটে যায় এক একটি করে।
অসংখ্য মানুষ দেখি প্রতিদিন এধারে ওধারে;
কাজ করি, কথা বলি, কী অতৃপ্তি সারা মন ভ'রে,
মেলে নাক' সে-মানুষ যাকে পেয়ে মন খুশি হয়।
গণ্ডী বাঁধা ক্ষুদ্র জীবনের
মাঝে নেই ব্যাপ্তি, নেই প্রসারতা পক্ষ বিস্তারের;
সে-জীবনে চাওয়া ও পাওয়ার
ছোট ছোট হিসেবের কত জাল বোনা—
ক্ষীণ কেঁদে কেঁদে ওঠে মুক্তি চাই,
মুক্তি চাই আমি।

এই মানুষের ভীড়ে তুমি এসেছিলে
অনেক ঐশ্বর্য নিয়ে, সে-ঐশ্বর্য
প্রসারিত তোমার হৃদয়;
বুক ভরা প্রেম নিয়ে দিলে মনে মনে।
সেই প্রেমে কী নিবিড়তা! সমস্ত বন্ধন
ছিন্ন সেই প্রেমের আলোকে।
সমস্ত ক্ষুদ্রতা
নিমেষে বিলুপ্ত হয় সে অসীমতায়,
নিমজ্জন সে প্রেমের মাঝে।
মানুষ অনেক বড়ো। সে বড়োর স্পর্শ আমি
পেয়েছি তোমার কাছে এসে।
দেখেছি কী ঘনীভূত প্রেম
অশ্রু হয়ে ঝরেছে তোমার
দু'টি চোখ বেয়ে।
পৌরিকে আবৃত দেহ—জীবন-বিরাগী তবু
ছিলে না তো তুমি এতটুকু।
জীবন-প্রেমিক ছিলে, কী গভীর প্রেম
ছিল ও হৃদয়ভরা! সে এসেছে কাছে
সারা মন ভরে
নিয়ে গেছে সে-ঐশ্বর্য অকুণ্ঠ উদার।
মেলে না কোথাও আজ সে-হৃদয়, সে বড়ো মানুষ
নেই বুঝি কোনখানে। তাই বারে বারে
তোমাকেই মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই কণ্ঠস্বর
(যেন আজো কানে ভেসে আসে,
কী উদাত্ত আবেগে উজ্জ্বল!)
সে কণ্ঠ ছড়িয়ে আছে এখানে, এ আশ্রম-ভূমিতে,
সে উত্তাপ হৃদয়ের এর চারিধারে।
সেই স্পর্শ নিয়ে যাই দেহমন ভরে,
রেখে যাই অন্তরের শ্রদ্ধানত একটি প্রণাম।

(স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৯২-তম জন্মোৎসবে নিবেদিত)

পুরুষোত্তম-দর্শন ও পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্ব সংস্কারমুক্ত সমন্বয়বৃত্তি শ্রীনিত্যগোপাল দেব বিশ্বকে প্রাণময় পুরুষোত্তম-দর্শন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মায়াব্রহ্ম সমন্বিত ক্ষর-অক্ষর সমন্বিত জগৎ কারণ ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম প্রাণের স্তরে উপলব্ধ। প্রাণের স্তরে মনকে উন্নীত করিবার জন্য তিনি বলে গিয়াছেন সমন্বয়—নিত্য অনিত্য সমন্বয়। আত্মা অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়। যাহে সমন্বয় পদ দ্বিতিধর্মী হয় সেই জন্য অসমন্বয়কেও তিনি ব্রহ্ম-বস্তু বলিয়াছেন। মনের স্তরে পরস্পর বিরুদ্ধ একাধারে থাকিতে পারেনা। পরস্পর বিরুদ্ধের মধ্যে যে মধ্যম প্রাণ আছে মন তাহাকে বাদ দিয়াছে। মনের ভাষা Either or-এর ভাষা। হয় এটা আছে নয় ওটা আছে। মনের স্তরের উর্দ্ধে প্রাণের স্তরেই পরস্পর-বিরুদ্ধের যৌগপদ্য সম্ভব। শ্রীনিত্যদেব এই ভিত্তিতেই পুরুষোত্তম দর্শন প্রদান করিয়াছেন বিশ্বকে মনের স্তর হইতে প্রাণের স্তরে উন্নীত করিবার জন্য।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত নিত্যদেবের সাথে একাত্ম হইয়া প্রাণের স্তরে উন্নীত হইয়া, ক্ষর-অক্ষর সমন্বয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই দর্শন প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং সারা জীবন কঠোর সাধনা করিয়া প্রমাণ করের জন্য পুরুষোত্তম-দর্শনের আলোকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই দর্শন সামগ্রিক এবং কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি নাই এবং বর্তমান যুগের একান্ত উপযোগী। ইহা যতই আস্বাদিত হইবে, যতই হৃদয়ঙ্গম করা হইবে ততই নিখের মঙ্গল এবং ইহাতে যে সম্পদ লুক্কায়িত আছে তাহা বিশ্বের সম্পদরূপে উৎসর্গীকৃত। আজ পুরুষোত্তমানন্দের পবিত্র জন্মদিনের উৎসবে ইহার কয়েকটি মূল্যবান তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পুরুষোত্তমানন্দ এবং শ্রীনিত্যগোপালদেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। তাঁহারা আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক করুন।

প্রচলিত দর্শনে মায়াকে অনন্ত কিন্তু বিনাশশীলা বলা হইয়াছে। মায়ার কোন পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। ব্রহ্ম-বস্তুকে পাইতে হইলে মায়ার বাহিরে যাইতে হইবে। পুরুষোত্তম-দর্শনে মায়া ব্রহ্ম সমন্বিত, ক্ষর ও অক্ষর সমন্বিত ব্রহ্ম-বস্তু। মায়া প্রকৃতি এতদিনের দর্শন শাস্ত্রে ছিলেন অস্পৃশ্যা। কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষের কাছে মাটি ও আকাশ তুল্য ভাবে সত্য। মাটি টাকাই বটে। ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। যুগের বিবর্তনের ধারা বহিয়া দর্শনের পরিবর্তন হয়। দেশ যখন রাজতন্ত্র বা বিদেশী শাসনের অধীন তখন শাসকের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকে। মনুসংহিতায় রাজাকেই ভগবানের প্রতিনিধি বলা হইয়াছে। এই ভাবেই বাহ্য মন বুদ্ধির বাহিরে তাঁহাকে "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তান্ তর্কেন যোজয়েৎ" রূপে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মন বুদ্ধি তাহাতে তৃপ্ত হয় নাই। দুঃসাহসিক দার্শনিক নিত্যদেব পুরুষোত্তম-দর্শনে প্রমাণ করিয়াছেন, ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ সত্য। মাটি ও আকাশ উভয়েই তুল্যভাবে সত্য। তিনি আদর্শ এবং বাস্তবের সমন্বয় সাধন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন মন সহ সর্ব ইন্দ্রিয়কে প্রাণে লয় করিয়া, এই দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধির মাধ্যমে জগৎ কারণ ব্রহ্ম-বস্তুকে ধরিতে বা ছুঁইতে পারার ক্ষমতা যাঁহারা সচেষ্ট তাঁহাদের হইতে পারে। আর এক জন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকিষনও এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লিখিয়াছেন 'When we talk of intuitional truths, we are not getting into any void beyond experience It is the highest kind of

experience when the intllectual conscience of the philosopher and the soaring imagination of the poet are combined. Intuitional expereince is within the reach of all provided they themselves strain to it." পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন "Intuition আজ তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের ভাষায় উহার এখন ব্যাখ্যান সম্ভবপর হইয়াছে"। এই প্রাণ-সাধনারই ফলে জন্ম কর্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া এই দেহকেই ভাগবতী তনুতে গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং নিত্যদেবের সাথে একাত্ম হইয়া পুরুষোত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদিও শরীরে তিনি এখন নাই তবু তাঁহার দেহত্যাগ বা পুনর্জন্ম নাই। এই পবিত্র সাধন-ভূমি তাঁহার সমাধি ক্ষেত্রে তিনি নিত্য বর্তমান।

শ্রীনিত্যদেব তাঁহার পুরুষোত্তম-দর্শনে পরস্পরের বিরুদ্ধতা নয়ন-ধর্ম্মশীল করিয়া এক করিবার জন্য মাত্রাস্পর্শের নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। এই মাত্রাস্পর্শ-নীতিই বৈজ্ঞানিকের গ্রহণীয়। বৈজ্ঞানিক জানিতে ইচ্ছা করেন না কোন বস্তু Either A অথবা Not-A কিনা। পক্ষান্তরে তাঁহারা জানিতে চাহেন A-র মধ্যে কতটা Not-Aness রহিয়াছে এবং Not A-র মধ্যে কতটা A-ness রহিয়াছে। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিপ্রেরণার মধ্যে রহিয়াছে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সমন্বয়। প্রাণের নির্দেশ হইতেছে সর্ব-ভূতের সাথে একাত্ম হইয়া কর্ম সম্পাদন কর। প্রজ্ঞার নির্দেশ হইতেছে—নিজেকে ব্রহ্মের সাথে যুক্ত করিবার জন্য নিজেকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোল। এই প্রাণ প্রজ্ঞার সমন্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে তাঁহার লীলার বিশ্বকর্ম্ম ছন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এই মাত্রাস্পর্শের মধ্যেই বিশ্বে সকল দ্বন্দ্বের মহা মিলন হইতে পারে। পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত এই মাত্রাস্পর্শের দর্শনের কার্য্যাত্মক রূপায়ন করিয়া আদর্শ ভাস্কর।

নিত্যগোপাল দেবের প্রাণ-দর্শনে বিশ্বেশ্বরের সমগ্রতা এবং বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাণ-সাধনায় জীব কর্ম্মযোগে যুক্ত থাকিয়া বিশ্বেশ্বরকে এবং নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারেন। পরস্পর পরস্পরকে গড়িয়া তুলিয়া বিশ্বকর্ম্মচক্রের প্রবাহে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ছুটিয়া চলিয়াছে। এই কর্ম্মই বিশ্ব-কর্ম্মযজ্ঞ। এই বিশ্বস্তরের বিশ্বকে ভরণের জন্য প্রত্যেকেরই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীতা রহিয়াছে। যে যে স্থানে আছেন, সেই স্থান হইতে পুরুষোত্তম-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া বিশ্বজীবের মঙ্গল বিধান এবং পুরুষোত্তমের প্রীতিপ্রদ বিশ্ব কর্ম্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। রাগ-দ্বেষ-বর্জিত পুরুষোত্তম-অর্পিত কর্ম্মদ্বারা জীব ভাগবতী তনু লাভ করে। তখন তাহার কর্ম্ম পুরুষোত্তম কর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া বিশ্বের সাথে বিশ্বনাথের যোগে এই বিশ্বকর্ম্মযজ্ঞ অনাদি অনন্ত কাল অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্ম্ম সদা প্রাণবন্ত। এই কর্মানন্দে কর্ম্মযোগী নিরন্তর কর্মানুষ্ঠান করেন। পক্ষান্তরে প্রাণস্পর্শহীন কর্ম ক্লান্তি আনয়ন করিয়া মৃত্যুরূপে কর্মের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। এই প্রাণবন্ত কর্ম সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া এবং তাহার সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়া পুরুষোত্তম-দর্শন এবং তাহার ভাস্কর পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ধন্য।

পরিশেষে দেহ মন প্রাণ সকল সত্তায় শ্রীনিত্যদেবকে এবং পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতকে জানাই প্রণতি। তাঁহারা বিশ্বকে প্রাণের ভরে তুলিয়া বিশ্ববাসীর সকল সমস্যার সমাধান করুন। জয়যুক্ত হউন নিত্যদেব ও তাঁহার দর্শন। জয়যুক্ত হউন পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত এবং নরনারায়ণ আশ্রম।

পুরুষোত্তমানন্দ

ওঁ নমো নিত্যগোপালায়
নমো পুরুষোত্তমানন্দায়
নমো জগত্তায়।

নর-নারায়ণসেবী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ভারত মহারাজের দিব্য জন্ম ও তাঁর দিব্য কর্মকে স্মরণ করবার জন্য বৎসরান্তে আমরা আবার মিলিত হবার প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের সম্মিলিত শ্রদ্ধা ও প্রণতি শ্রীনিত্যগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ গ্রহণ করুন।

পুরুষোত্তমানন্দ এসেছিলেন আজ থেকে একানব্বই বৎসর আগে অখণ্ড বাংলার বরিশালের সুন্দর পল্লীগ্রামে। ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসনে ও শোষণে ভারতবাসী নিষ্পেষিত। সেই নিষ্পেষণে ভারতবর্ষের দিক দিগন্ত থেকে বহু মনীষীর আত্মপ্রকাশ সুরু হয়। অখণ্ড বাংলার বরিশাল জেলারও এক পল্লীগ্রামে জন্ম নিলেন তখনকার বাংলার শরৎ কুমার ঘোষ। শিশুকাল থেকেই শরৎকুমারের ভেতরে সাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে ভারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও তিনি বলতেন ছোটবেলায় তিনি খুব মুনো ছিলেন, দুজন মানুষের সাথে সামনে গিয়ে কথা বলতে তাঁর নাকি পায়ে কাপড় জড়িয়ে যেত, কিন্তু তাঁর প্রাণের ভেতরে কিসের একটা বেদনায় তিনি কেমন আনমনা থাকতেন। ছাত্র-জীবন থেকেই তাঁর সংঘ-জীবন যাপন করবার অনেক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে বৃটিশ শোষণের জ্বালা, অপর দিকে তাঁর প্রাণের অন্তস্থলের কিসের একটা বেদনার ধারা বেয়ে তাঁর জীবনকে এমন একজন মানুষের চরণ তলে এনে ফেলেছিল, যিনি বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক জীবনতত্ত্বের সুষ্ঠু সমাধানের পথ-রেখা অঙ্কিত করে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ। তিনি নিজেকে আমি বিশ্বনাগরিক, এই বিশ্বই আমার মহামঠ বলে ঘোষণা করে গেছেন। তিনি সকল বিপরীতের সমন্বয়াচার্য্য অবধূত শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীসুনীতি সান্যাল ॥

তখনকার জন সমাজের কাছ থেকে নিজেকে একেবারে গোপন রেখে ভবিষ্যতে বিশ্বের জন্য দর্শনের ক্ষেত্রের নতুন কাঠামো তৈরী করে বাইরের দিক থেকে দেখতে ঐ মুনো মানুষটির প্রাণের ভেতরে রেখে গেলেন বিশ্বের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেবার সেই বীজ মন্ত্র। অসামান্য লৌকিক এবং অলৌকিক শক্তিধর শ্রীনিত্যগোপাল কেন নিজেকে এমন করে সেদিন গোপন রেখে ছিলেন এবং গোপনতা রক্ষা করবার জন্য অন্যকেও সাবধান করেছিলেন "আমায় ফেরী করো না" বাণীতে, তার অর্থ বা উদ্দেশ্য আমাদের মত মানুষের উপলব্ধির বাইরে। সেদিনের একজন মানুষের কাছেই বুঝি তাঁর পরিচয় ধরা পড়েছিল, তিনি পরমহংসদেব। তিনি বলেছিলেন, আমি তাজা গোবরে ঘুঁটে দেব, নিত্য পচা গোবরে ঘুঁটে দেবে। তাই সেদিন তিনি বিশ্বের অন্তরালে বসে রেখে গেলেন বর্তমান বিশ্বের জন্য নিত্য অমিত্য সমন্বয়ের দর্শন, জড় অজড় সমন্বয়ের দর্শন, জ্ঞান অজ্ঞান সমন্বয়ের দর্শন, সর্বসমন্বয়ের দর্শন। ডাক দিয়ে গেলেন বরিশালের শরৎকুমার ঘোষকে। তাঁরই প্রসাদে আজকের এই স্বভাব-সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ভারতীয় প্রস্থান ত্রয়ের ভাষ্যকার, অতীতের অর্থাৎ পরাধীন ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ বাগ্মী শরৎকুমার। তাঁর সমকালীন যারা তাঁকে দেখবার ও তাঁর বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের রিডারেটার পণ্ডিত সতীশচন্দ্র ওহ ঠাকুর মহাশয় তাঁর লিখিত "মহামানব পুরুষোত্তমানন্দ" প্রবন্ধে লিখেছেন, "সার্ভেন্ট পত্রিকার দৈনিক সম্পাদক শ্যামসুন্দরকে এক বক্তৃতায় বলিতে শুনিয়াছি "শরৎ আমার অগ্রজ, কিন্তু আমি তাঁর পদতলে বসিয়া বেদান্ত শিক্ষা করিতে পারি।" তিনি আরও লিখেছেন, "বাগ্মীরূপে পুরুষোত্তমানন্দ অপরূপ। বর্তমান যুগে কুত্রাপি দেখি না যে দীর্ঘকাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন বাগ্মী আসর জমাইয়া রাখিতে পারেন। স্বামীজীর

প্রাণ ছিল একেবারে খোলা, হৃদয় আকাশের মত অসীম। আমি জীবনে অনেক বাগ্মীর বক্তৃতা শুনিয়াছি যথা মাতাজী (মিসেস বেসাণ্ট), মাতাজী সিসিলিয়ন এডগর, সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী সোফিয়া, ওয়াডিয়া, ডক্টর এন্ড্রুজ, জিনরাজ দাস, শ্রীরাম রোহিত মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ, লিয়াকৎ হুসেন, আবুল কালাম, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, তিলক, গোখলে, লালপত রায়, নটেশন, রামানন্দ, গোপাল কৃষ্ণ, দেবধর, মহাত্মাগান্ধী, শশধর তর্ক চূড়ামণি, বিশ্বনাথ স্বামী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, রাধাকৃষ্ণ, শিবস্বামী, কৃষ্ণস্বামী, রামস্বামী, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন শীল, আনন্দমোহন বসু, কুমার স্বামী, ভগিনী নিবেদিতা, দাদাভাই নৌরজী, খপার্ডে, সতীশ মুখোপাধ্যায়, আচার্য রায়, রামেন্দ্র সুন্দর, নেতাজী সুভাষ, যতীন্দ্র মোহন সেন, দশারাম গণেশ দেউস্কর, নেহরু, কৃপালনী, বিনোবা, মহাদেব দেশাই প্রভৃতির বক্তৃতা সকর্ণে শুনিয়াছি। অনেকের বক্তৃতা সংগ্রহগুলি সযত্নে পাঠ করিয়াছি। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের বক্তৃতা আমি অনেক শুনিয়াছি তবু আমি বলিতে পারি তাঁহার মত বাগ্মী আমি দেখি নাই। এমন মর্মস্পর্শী প্রাণখোলা কথা অন্যত্র কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামীজির প্রতিটি বক্তৃতা প্রাণ মন হৃদয় আন্দোলিত করে। আবার এত বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া বলিতেও কাহাকেও দেখি নাই। একমাত্র কেশব চন্দ্রের কথা প্রায় গুরু ম্যান জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি কেশবচন্দ্র ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে পারিতেন। স্বামীজিও তিন চারি ঘণ্টা দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে অনায়াসে বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা সকল বিষয়ে কেশবের সমকক্ষ বলিয়া মনে হয়, অপর কাহারো সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না।

আবার এত বেশী বক্তৃতা একটী জীবনে দেওয়া অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব হইয়াছে কিনা জানিনা। প্রত্যক্ষ দর্শীর প্রাপ্তি হিসাবে জানা যায় শরীর পর্যন্ত স্বামীজি কমপক্ষে ১৩।১৪ হাজার বক্তৃতা করিয়াছেন।...প্রয়াগবাসী ভক্ত ও সুগায়ক শ্রীমোতিমী মোহন রায় ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের নেতাজীর অধীনে এবং অসহযোগের বিখ্যাত বরিশাল কনফারেন্সে স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তিনি ঐ সময় বরিশাল-প্রতিনিধি স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন শরৎ ঘোষের মতন প্রাণস্পর্শা বক্তৃতা তিনি জীবনে অন্যত্র কুত্রাপি শোনেন নাই। শরৎবাবু পরম ভক্ত, Practical vedantist। নিজ জীবনে আচরণদ্বারা যে লোক-শিক্ষা তিনি দিয়া গেলেন, বর্তমান যুগে তাহার তুলনা হয় না।" এই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মানুষটী সেদিন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভারতের কাঠামো যেমন হবে প্রতিটী পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র আত্মকল্যাণের পথে, বিশ্ব কল্যাণের পথে পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলতে পারে তার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। ভারতবর্ষের অদ্বয়বাদী দর্শনের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীনিতাগোপালদেব-প্রদত্ত সমন্বয়ের ভিত্তিতে, দ্বৈত এবং অদ্বৈতদর্শনের সমন্বয়ের ভিত্তিতে সকল বিপরীতের বিরোধের দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্য বিপ্লব আনলেন। তাঁরই লিখিত ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের অবধূত ভাষ্য আর তাঁর অগণিত ভাষণ, পত্রাদি যুগে যুগে নরনারায়ণ আশ্রম বিশ্বের মানুষের আশার বসে আছে—এবং অনন্ত কাল বসে থাকবে। তিনি বলে গেছেন, "প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখো, যে দর্শন আমি রেখে গেলাম বিশ্বের মানুষ আসবে একদিন এই দর্শনের খোঁজে"।

সতীদেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হলে ভারতের বহু স্থান সতী দেহ বক্ষে ধারণ করবার পর পাগল শিব সুন্দর যেমন তার প্রলয় নৃত্য বন্ধ করে মহা সমাধিতে মগ্ন হয়েছিলেন, স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে সারা ভারত বর্ষে বিশেষ করে বাংলার প্রতি জেলায় জেলায় বহু গ্রামে গ্রামে পাগলের মত ছুটে মানুষের ভেতরের মানুষটীকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টার পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে এই মানুষ হবার দার্শনিক কাঠামোটি দিয়ে গেছেন। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারায় যে সন্ন্যাসীর ছবি দেখতে আমরা অভ্যস্ত তিনি সে রকম সন্ন্যাসী কোন দিন

হননি। এই দুঃখ দৈন্য জর্জরিত জগতের বাইরে তাঁর কাছে কোন মুক্তিলোক নেই। তাই তাঁর মন্ত্র ছিল 'ভবে তুলিব এ মহ গড়িয়া তুলিব তোমারই রাঙ্গা নন্দনে'। তাই মোটামুটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পর স্বাভাবিক নতুন ক্রত গ্রহণ করে দেশের গণমানসের জীবন চেতনা সৃষ্টি করার কাজে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমের মুকে জীবন চেতনার নতুন ভাষা নতুন রূপ দিয়ে গেলেন। তাঁর মত একজন দেশনায়ক স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই একটা উচ্চস্থানের অধিকারী হতে পারতেন অথবা লক্ষ ভিক্ষু করে বিরাট রাষ্ট্রের অধিকারী হতে পারতেন। তা তো তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না—তাঁর জীবনের একটী মাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সকল জাতি নিজের বুকে টেনে নিয়ে আপনার জনসাধারণকে দিয়ে মানুষ গড়ে তুলে দিয়ে বিশ্ব শ্রষ্টা করে করে চলা। এরই জন্য তাঁর সারা জীবনে ছিল না কোন সোয়াস্তি। তিনি বলতেন এই প্রাণ-ধর্মকে সাহিত্যের ভাষার রূপ দিয়ে মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট করাবার কাজে গুটিকতক লোকও যদি পেতাম তবে এ পাগল প্রাণটা শান্ত হত।

আমাদের মত সকল রকমের দীনতম, ক্ষুদ্রতম মানুষের কাছে তাঁর প্রদত্ত বিশ্বের এই ধন গচ্ছিত রয়েছে। সকল মানুষ এই খোঁজে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিত্যগোপাল-ব্রহ্ম বিদ্যাপীঠ এই নরনারায়ণ আশ্রমে সমবেত হবেন, বিশ্বের তাপ, কলুষ দূর হবে শ্রীনিত্যগোপাল পুরুষোত্তমানন্দের চরণ তলে নত মস্তকে এই প্রার্থনা। জীবনের চলার গতি আমাদের জীবনে তীব্রতর হোক। শ্রীনিত্যগোপাল পুরুষোত্তমানন্দ জয়যুক্ত হোন্। বিশ্ব ও বিশ্ববাসী জয়যুক্ত হোক।

মহাভাগবত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

উপনিষদের অমৃতোপম বাণীতে—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—সর্ব বস্তুতে পরমেশ্বর দর্শনই মহাভাগবতের লক্ষণ। মহাভাগবতের দৃষ্টিতে সবই কৃষ্ণময়, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী উদ্ধৃত করি—

এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে
ব্রজেন্দ্র নন্দন স্মৃতি হয় সর্বজনে।

আমাদের শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজও ছিলেন একজন মহাভাগবত। সর্ব স্তরে শ্রীকৃষ্ণ-সত্তা তিনি অনুভব ক'রতেন। ১৩১০ সনের ১১শে কার্তিক জনৈক বন্ধুকে লিখিত এক লিপিতে আমরা তাঁর সম্যক পরিচয় পাই—"এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। .....তিনি যদি সর্বব্যাপী তবে তিনি জগৎ এবং জগৎস্থ জীব জন্তু বৃক্ষ ইত্যাদি না হইয়া কিরূপে পারেন।" ছাত্র জীবনান্তে বিত্ত বৃত্তের প্রচেষ্টায় ৫৩নং হ্যারিসন রোডে 'বঙ্গেষ্বাতন্ত্রম্ ঠোর' কাটা কাপড়ের এক দোকান খুললেন মহারাজজী। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ বাঁর মনের মণিকোঠায় লুকোচুরি খেলছেন তাঁর আর কতদিন দোকান চলবে? ছয় মাসের মধ্যেই গণেশ উলটিয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে পাগল হয়ে উঠলেন। অন্তরে তীব্র দাহন—সর্ব কর্মেই অশান্তি। রাধারাণীর ভাষায় তাই তিনি গেয়ে বেড়াতেন—

এ'কূলে ও কূলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়।

সুতরাং এরূপ পুরুষকে মহাভাগবত ছাড়া আর কি বলি! ভক্ত চিত্তের একমাত্র অবলম্বন ভগবান্। মহাভাগবত ভাব বিগলিত চিত্তে কেবল ইষ্টদর্শনই করেন। চেতন অচেতন সর্বভূতে নিজাভীষ্ট ইষ্টদেব দর্শনই মহাভাগবতের লক্ষণ। আমরা আমাদের অবলুপ্ত মহারাজের জীবনে এ ভাবস্ফুরণ শতদল পাঁপড়ি মেলে

ফুটে উঠতে দেখেছি। সকল বস্তুতেই তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কথাতেই বলি—'একদিন শুধু মুলা মুলা নামই জপ করিলাম, উহাও তো ব্রহ্মেরই নাম। এই জগতের নাম রূপ সবই যখন ব্রহ্মের তখন মুলা নামে ডাকিলে হইবে না কেন'? "তদেবালোকয়তি, তদেব চিন্তয়তি, তদেব ভাষয়তি, তদেব শৃণোতি"—নারদ-ভক্তি-সূত্রের মহাভাগবতের লক্ষণও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের চরিত্রে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর উক্তিতেই এ লক্ষণের প্রমাণ দিই—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

আমার নয়ন তোমার বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য কাঁদে, আমার জিহ্বা তোমার গুণ কীর্তন লাগিয়া কাঁদে, আমার নাসিকা তোমার অঙ্গ গন্ধের লাগিয়া কাঁদে, আমার কর্ণ তোমার সুধাময়ী নাম শুনিবার লাগিয়া কাঁদে, আমার ত্বক তোমার স্পর্শের লাগিয়া কাঁদে।"

মহাভাগবত ছিলেন শ্রীশুকদেব। ভক্তির রসপাত্র মহাজনের মুখে ভাগবতের সুধাস্রোতী কথা শ্রবণ করলে জীবন ধন্য হয়। জন্ম জন্মান্তরের তপস্যা না থাকলে মহাভাগবতের মুখে নিঃসৃত ভাগবতের পুণ্যধারা পান করা যায় না। মহারাজ পরীক্ষিত বহু জন্মের সুকৃতি বলে শ্রীশুকদেবের মুখ থেকে ভাগবত অমিয় কথা শ্রবণ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। পতিতপাবন সংসারের আপামর জনের দুয়ার পাত্রী কিন্তু আমাদের মহাভাগবত স্বামিজীর ভাগবত কথা বরিশালের বারবণিতাবৃন্দের শ্রুতি মূলে অমিয় ধারা ঢেলে দিয়েছিল, তাদের জীবন নদীতে নতুন তরঙ্গ তুলেছিল। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়—এই পতিতাগণ মহাভাগবত অবধূত মহারাজের সান্নিধ্য লাভ ক'রে অমৃতের পথে ধাবিত হয়েছিল। হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে তিনি ভাগবতধর্মের সঞ্জীবনী ধারায় ব্রজধামের লক্ষ মানুষের বুকের সংকীর্ণতাও দূর করেছিলেন।

শ্রীমদ্ ভাগবত উত্তম ভাগবতের সংজ্ঞা ঘোষণা করেছেন—"সর্বে সূতেষু যঃ পশ্যেত্তগবদ্ভাব আত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তম।" যিনি আপনার ভগবদ্ ভাব সর্বভূতে অবলোকন করেন এবং ভগবদাত্মাতে সর্বভূতকে দেখেন তিনিই ভাগবতদের মধ্যে উত্তম। উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে—মহাভাগবত শিবকে বিশ্বমাতা বলে দেখেন—তিনি হরিস্মৃতি দ্বারা জন্ম মৃত্যু অন্তরের ভুলা মনের ভয়কে জয় করেন। তাঁর নিকট শ্রীহরির চারু চরণই একমাত্র আশ্রয় স্থল। শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দের জীবনটি এ সবগুলি গুণরাজিতেই সমুজ্জ্বল ছিল। বাসুদেব কথাই তাঁর রসনায় ক্ষচিকর ছিল। কি রাজনীতি কি ধর্মনীতি সর্বক্ষেত্রেই তিনি গোকুলধন কৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।

বস্তুতঃ মহাভাগবতের দর্শন—ভাবের দর্শন। আমাদের স্বামিজী ছিলেন ভাবের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর জীবন খাতার দুদিনের পাতা খুলে ধরি—১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ। নীলাচলে স্বামিজী জগন্নাথ দর্শনে প্রত্যাগমন। সহসা তাঁর নেত্রদ্বয় থেকে সরযূর স্রোত প্রবাহিত হ'ল। দর্শকবৃন্দ, পাণ্ডা তাঁর ভাব-বিহ্বলতা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আর একদিনের কথা বলদবাদে স্বামিজী বক্তৃতা দিচ্ছেন—রাখাল রাজের বন বিহারের কথা। মাঝে মাঝে কান্না—কি সে ভাবমূর্তি। যাঁরা তাঁর সে ভাষণ শুনেছিলেন তাঁরাই অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

ভক্তি রসপাত্রের করুণা লাভ ক'রলে ভক্তি-ধনে ধনী হওয়া যায়। আমার সে সৌভাগ্য হয়নি। আমি তাই সত্যই এক অকিঞ্চন। তবু গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজোর মত তাঁর কিঞ্চিৎ অমৃত কথা তুলে ধরতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি।

যুগসমস্যা ও সমন্বয়বাদী পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীবিবেকানন্দ ব্যানার্জী ॥

আজ এই মুহূর্তে আমার অনেকদিন আগের কথা মনে হচ্ছে। বোধহয় ইং '৪৮–৪৯ সাল। ব্রহ্মেরা মেজমাসীমা শ্রীমতী অন্না দেবী শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের কৃপা লাভ করলেন। অমনি তাঁর নাবালক বোনপো আব্দার ধরে যে সে তাঁকে দেখবে। মেজমাসীমা হয়ত তাকে নিয়ে যেতেন, কিন্তু বাদ সাধলেন ব্রহ্মেরা। তাঁরা সেই অবোধ বালককে বোঝালেন যে স্বামীজী বিরাট রাশভারী ব্যক্তি তাঁর কাছে ছেলেদের যাওয়া সাজে না।

আরও কিছু পরের কথা। হাস্যকর হলেও গুরুর নিন্দে যেটুকু শুনেছিলাম তা হল স্বামীজী বিপ্লবী সুতরাং বিপজ্জনক। তাছাড়া সন্ন্যাসীর বিপ্লবী হওয়ার মধ্যেও তত্ত্বের একটা স্বতঃবিরোধ রয়েছে। এগুলো ধারণা। এখানে কোন 'কেন'র উত্তর নেই।

তারপর দীর্ঘদিন পরে ঘটনাচক্রে কি ভাবে এই আশ্রমের সান্নিধ্যে এলাম তা ভাবতে আশ্চর্য্য লাগছে, আরও লাগছে এই ভেবে যে আমি এই ঘনায়মান সন্ধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলছি। ব্যাপার কথা জিনি নেই। আমি তাঁকে দেখি নি. কোন অতিপ্রাকৃত জিনিষেও বিশ্বাস করি না। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে আজ এই পরিবেশের রেণুতে রেণুতে তাঁর উপস্থিতি রয়েছে।

আগের কথাগুলো বলতে-লুচ্চা হচ্ছিল, কিন্তু ভাবি মানুষের তো কত ভুল ধারণা রয়েছে। আর স্বামীজীর কথা! তাঁর উদাত্ত আহ্বান যদি বর্তমান বিশ্বে কিছুও শুনত হত তবে মানুষের প্রগতি নিশ্চয়ই দ্রুতলয় হত। তবে আমার ধারণাগুলো আক্ষরিক ভাবে ঠিক। তিনি রাশভারী (?) ছিলেন—অমনার আত্মপরিচয়ে শিবের মত জ্ঞানবৃদ্ধ। শুধু স্বাদেশীকতার নয়, মানুষের সংস্কৃতির বিপ্লবী। আর বিপজ্জনক তো নিশ্চয়ই—যারা পুরোণ পচা ধারণা নিয়ে থাকতে চায় তাঁদের ভাবনাকে ভেঙে খান খান করে দিয়ে এক বিশ্বাদৃষ্টির সামনে দাঁড় করান ভীতিপ্রদ তো বটেই।

তবে 'স্বতঃবিরোধ' কথাটা মনে হতেই তাঁর মনের মূল সূত্রটি ভেসে আসছে। একটু আগেই আঁচ করেছি যে সন্ন্যাসীর বিপ্লবী হওয়াটা মোটেই অসমঞ্জস নয়, না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। কেননা তাঁরা গতানুগতিক জীবন যাত্রার প্রতিকূলে যান, কুসংস্কৃত ধারণা উল্টে দেন। শুধু এর চেয়ে বেশী কিছু আছে। দুটি বিপরীত ধারণা পাশাপাশি থাকলেই তাদের বিরোধ থাকবে এর কি মানে আছে? আলোচনায় আমি স্পষ্টতঃ তত্ত্বের দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু তত্ত্ব বিনা কি কোন প্রয়োগ বা ব্যবহার থাকতে পারে? তাছাড়া স্বামীজীর দিনপঞ্জীগুলোর কিছু কিছু উল্টে দেখছি সেই তত্ত্বেরই প্রয়োগের নিষ্ঠা।

যাক্ যেটা বলছিলাম। জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা দেবার জন্য আলোর উপমা টানা হয়। কিন্তু আমরা যা দেখছি তা তো শুধু আলো নয়। আলো আঁধারের খেলা। এই ঘরে যদি অনেক উজ্জ্বলতর আরও গোটাকতক বাল্ব থাকত তবে কি হত? চোখে ধাঁধা লাগত, প্রদীপনে অন্ধকার সম্পূর্ণ মুছে যেত। তখন মনে হত দু একটা আলো নিভিয়ে দিলে তবে দেখতে পাব। এই হল আলো আঁধারের সমন্বয়। আলোর বিষয় বলছি এই জন্য যে এটি বিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি পদার্থ বিজ্ঞানের অন্তর্গত। বিভিন্ন বৈপরীত্যের সমন্বয়ে যে বার্তা দার্শনিক হেগেল ও ঐনিজ্ঞ গোপাল তত্ত্বতঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে গেলেন। কারণ, 'the Philosophy of any period is always largely interwoven with the sciences of that period, so that any fundamental change in science must produce reaction in philosophy' (স্বামীজীর

উদ্ধৃতি)। স্বামীজী সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু জানার আছে, এখানে অবসরও কম ; তাই তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাই বলেছি ও বলছি।

পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুর কথা মনে পড়ছে। কেন্দ্রে ঘনবিভবযুক্ত প্রোটন এবং তার চতুর্দিকে ক্ষিপ্রবেগে ঘূর্ণায়মান ঋণবিভবযুক্ত ইলেকট্রনসমূহ পরমাণুটির স্থিতিরই কারণ। এর আরও একটি দিক এই যে যাকে এতদিন স্থির বীর মনে করতাম আসলে তা নয়। ঘন-ঋণ-সমন্বয় গতি-স্থিতি-সমন্বয়। এটাই কি পুরুষোত্তমের রাসলীলার প্রতীক ? অবশ্য কোন্‌টা গতি কোন্‌টা স্থিতি তা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করছে। এক ভঙ্গীতে যা স্থিতি অন্য ভঙ্গীতে তা গতি। টেলিগ্রাফের খাম নাঠে দাঁড়ান আমার পক্ষে স্থিতি, ট্রেনে অবস্থিত আপনার পক্ষে গতি। আবার আপনি আমি উভয়ে একই গতিবেগযুক্ত এবং একই দিকে গতিশীল দুই ট্রেনের পাশাপাশি দুই কামরায় আসীন। উভয়ের কোন গতি নেই। এবিষয়ে ঠিক ধারণা করতে হলে 'Complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system'—(স্বামীজীর উদ্ধৃতি)। দর্শনের দিক থেকে এই নিরপেক্ষ দ্রষ্টাই পুরুষোত্তম, এর অবস্থা পূর্ণযোগ এবং চেষ্টা তপস্যা।

শ্রীনিত্যগোপাল শুধু দার্শনিক হেগেলের মত বলেন নি, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ শুধু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করেন নি। প্রত্যেক মনীষীই অপরের মতামত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বা তাঁদের মত বলতে গিয়ে নিজের চিন্তার স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। এটাও সমন্বয়। এখানেও তাই দেখছি। তবে বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তুর-সঙ্গে এর কি যোগ ? এ গুলোও বিজ্ঞান তথা দর্শনের যুগ-সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য উত্তর। অতখানি না গিয়েও বলা যেতে পারে আজ যদি বিশ্বের কিছু ভাবের মধ্যেও সমন্বয় হয় তবে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। সহাবস্থানের কথা বলছি না, সেটা তো আছে। কিন্তু সেটা টলমলে জিনিস। যে কোন মুহূর্তে ভাঙতে পারে বা ভাঙবেও। তাই আসুন আমাদের চিন্তা, ভাব, কর্মপ্রচেষ্টা সকলের সুর হোক 'সমন্বয়'। আসুন বলি—

'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ
তোমায় করি গো নমস্কার।'

সূচীপত্র : অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৮১

১। যত মানুষ (কবিতা) — ১০৩
শ্রীশান্তশীল দাশ

২। পুরুষোত্তমদর্শন ও পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত — ১০৪
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৩। পুরুষোত্তমানন্দ — ১০৬
শ্রীসুনীতি সাঙ্গাল

৪। মহাভাগবত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ — ১০৮
শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ

৫। যুগসমস্যা ও সমন্বয়বাদী পুরুষোত্তমানন্দ — ১১০
শ্রীবিবেকানন্দ ব্যানার্জী

৬। বাংলা শারদীয় সাহিত্য — ১১২
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

৭। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ — ১১৪
শ্রীরেণু মিত্র

৮। সাময়িকী : উজ্জয়ন্তভারত সম্বন্ধে — ১১৭
: জন্মোৎসব

৯। নতুন তারার সন্ধানে (কবিতা) — ১১৯
শ্রীগণেশ চক্রবর্তী

বাংলা শারদীয় সাহিত্য

॥ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ॥

('ডাকঘরের দৌরাত্ম্যে' লেখাটি পূজার পরে হস্তগত হয়।)

'প্রবাসী' পূজা সংখ্যায় শারদ উৎসবের আনন্দ ও প্রফুল্লকর সুরে সুর মিলিয়ে প্রকাশিত বিষয়ে লেখা যায় কিন্তু ঘোর্ পূজাসংখ্যা অর্থাৎ শারদীয় সাহিত্যের বিষয়টি নিয়ে লেখাই বা বন্ধ কী। পূজাসংখ্যার গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক রম্যরচনা প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবার অবকাশ আসতে পারে,—সেটা ফসল ঘরে ওঠার পরেকার পালা—কিন্তু মৃত্তিকাকর্ষণ, বীজ বপন, চারা রোপণ, শস্যক্ষেতের সযত্ন রক্ষণ প্রভৃতি ফসল উৎপাদনের প্রাক্ প্রস্তুতির যে একটি অপরিহার্য অধ্যায় আছে তার উপর এক নজর চোখ বুলালে বোধ হয় নিতান্ত অর্থহীন ব্যায়াম বলে মনে না-ও হতে পারে। বিশেষত শারদীয় অবকাশের এই অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে যখন চারদিকে একটা ছুটি-ছুটি ভাব, আকাশের নীলিমায় আর সোনালী রোদে খুশীর ঝলক, শেফালি আর কাশফুলের শুভ্রতায় অনাবিল প্রীতির আবরণ, তখন শারদ সাহিত্যের আয়োজন রূপ আনন্দ যজ্ঞের উপরেই কেন না আমি ধারেকের জন্য আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করি?

আমার ধারণা, পূজা সংখ্যাকে কেন্দ্র করে এই যে বাংলা সাহিত্যে সমৎসরে একবার, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস নাগাদ, সমসাময়িক সাহিত্যসৃষ্টির জোয়ার আসে এবং সেই সৃষ্টিকে উপযুক্ত আধারে শোভায় সম্পদে রূপে পারিপাট্যে পরিবেশন করবার জন্য চারদিকে অন্তহীন সাড়া পড়ে যায়—এটি বাংলার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষ্টির শিল্প। এই সময়ে লেখক এবং সম্পাদকেরাই যে শুধু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তাই নয়, প্রকাশন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত রকমের কর্ম-উৎপরতা আছে—মুদ্রণ, কাগজশিল্প, বাঁধাই, কালিশিল্প, চিত্রাঙ্কন, ফোটোগ্রাফী, ব্লক নির্মাণ, পরিবহন, বিজ্ঞাপন সাময়িক পত্র বিপণন শিল্প ইত্যাদি—সমস্ত মহলে যেন একটা সাজ সাজ রব পড়ে যায়। শুধু যে কলকাতা শহরেরই এই চিত্র তাই নয়, রাজধানী শহরকে ছাপিয়ে আজকাল এই কৃষ্টির শিল্প মফঃস্বল শহরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক বছর যাবৎ দেখতে পাচ্ছি জেলা আর মহকুমা শহরের সাহিত্যানুরাগী তরুণের দলও এই জাতীয় সাম্বৎসরিক শারদ সংকলন প্রকাশের কাজে পিছিয়ে নেই। তাঁদের শিবিরেও উৎসাহ উদ্দীপনা প্রচণ্ড।

মোটকথা, কলকাতা আর জিলাগুলিতে মিলিয়ে সর্বত্র শারদীয় সাহিত্য প্রস্তুতির রীতিমত এক কর্মযজ্ঞশালা গড়ে উঠেছে পূজার উৎসবের দিনগুলিতে, বাংলা সাহিত্যামোদী পাঠকের মনে স্ফূর্তি আর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলবার জন্য। দেশে ঘোর দারিদ্র্য যন্ত্রণা ক্লেশের অভাব নেই। অত্যাবশ্যক ভোগ্য পণ্যগুলির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা নিত্যকার ক্লেশকে আরও বেশী অসহনীয় করে তুলেছে। কিন্তু গোটা বছরই মানুষ দুঃখকে নিয়ে পড়ে থাকতে পারে না, কণ্ঠের কাঁদুনি গাইতে পারে না। কিছু কালের জন্যে হলেও তার দুঃখের বন্ধন পীড়ন থেকে মুক্তি চাই, অন্তরে আনন্দের শিহরণ অনুভব করা চাই। সেই প্রত্যাশিত সুখকর বিশ্রামেরই প্রতিশ্রুতি বহন করে নিয়ে আসে শারদীয় সাহিত্য তার বিচিত্র আয়োজন সম্ভার বর্ণাঢ্য পত্র পত্রিকার ডালিতে সাজিয়ে।

বাস্তবিক বাংলা সাহিত্যের এই শরৎ ঋতুকালীন বিশেষ উপকরণ সম্ভারের কোন তুলনা নেই। আকর্ষণের বৈচিত্র্যে ও উপভোগের স্বাদুতায় এই শারদ উপচার সারা বছরের দুঃখদৈন্য আর নিরন্ত ক্ষোভ ও বঞ্চনা নিয়ে ঘর করবার ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। বাংলা শারদ সাহিত্য নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান—অনন্য এর ধারাবরণ। এর আর দুরি খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। উত্তর ও

পশ্চিম ভারতে দীপাবলী উৎসবকে কেন্দ্র করে সাময়িক পত্র পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের রেওয়াজ আছে, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করবার জন্যে প্রতি বৎসর ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখটিকে ঘিরে "মহান একুশে" সংকলন প্রকাশের গোপাগুলি থাকে না বললেও চলে, কিন্তু ব্যাপ্তিতে ব্যাপকতায় পাঠ্য বস্তুর বৈচিত্র্যে ও দৃশ্যসজ্জার চমৎকারিত্বে বাংলা পূজা সংখ্যাগুলির সঙ্গে অন্য কোন কিছুর তুলনাই চলতে পারে না। এ যেন একটা আলাদা জগৎ—তার দেউড়ি পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে মুদ্রিত অক্ষরের আবরণে ঘরে ঘরে সাজানো রচনা পণ্যের বিচিত্রতা ও সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে ক্ষণকালের জন্য আর সব ভুলে যেতে হয়। শারদীয় সাহিত্য ঋতুসাহিত্য, কাজেই সাময়িকতার দ্বারা কতকাংশে সৃষ্ট। কিন্তু ওই সাহিত্যের প্রকৃতি সাময়িক হলেও তার সোনার তরীতে পুঞ্জীকৃত 'রাশি রাশি ভারা ভারা' ফসল থেকেই এমন কিছু ফসল পৃথে আলাদা করে গোলায় তোলা হয়, যা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ রূপে পরিগণিত হয়। দেশী বিদেশী অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্যেরই প্রেরণার আদিতে আছে ফরমায়েসী তাগিদ, সে কথাটি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

সাংস্কৃতিক দিক ছাড়াও শারদীয় সাহিত্যের একটা সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক দিক আছে, সেটি মনে রাখা প্রয়োজন। আগেই বলেছি এটি বাংলার একটি নিজস্ব কুটিরশিল্প। তবে এর ঘরভরতি একটি বিশেষ কালে সীমিত, এই শিল্পটিকে উপলক্ষ করে কত মানুষদের যে রুজিরোজগারের সংস্থান হয় তা অর্থনৈতিক গবেষকদের একটা চর্চাযোগ্য বিষয় হতে পারে। এবং পূজার বিভিন্ন দাবি দাওয়া মেটাবার পক্ষে শারদীয় সাহিত্যের সূত্রে আহৃত যাড়তি আয় যে বহু মানুষের জীবনে একটা দৈবানুগ্রহের আকারে উপস্থিত হয় সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। লেখকসম্প্রদায় এই শিল্পের প্রধান যোগানদার, তাঁরা তো আছেনই, তা ভিন্ন পত্রিকা সম্পাদক ও তাঁর সহকারীগণ, ছাপাখানার মালিক ও কর্মীবৃন্দ, কাগজ বিক্রেতা, কালিওয়ালা, বাঁধাইওয়ালা, চিত্রশিল্পী, ফটোশিল্পী, ব্লকনির্মাতা, সাময়িকপত্রের হকারস্টল হোল্ডার, হকার এমন কি মুটেমজুর শ্রেণীর মেহনতী মানুষ পর্যন্ত কত রকমের জীবিকা ও বৃত্তিতে নিযুক্ত কর্মীরা যে এই শিল্পোদ্যোগের সুফল থেকে উপকৃত হন তার লেখাজোখা নেই। কোন শিল্পের সুফল যখন নানামুখী হয় এবং সমাজের অনেকগুলি স্তরকে একই কালে স্পর্শ করে, বুঝতে হবে সেই শিল্প একটি উৎপাদক শিল্প এবং পরিপূরক শিল্প। বাংলার পূজাসংখ্যার শিল্পকে এই দুই আখ্যাই দেওয়া যায়।

লেখকদের সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার। কেননা তাঁরাই এই শিল্পের মূল ভিত্তি স্বরূপ। নামী অনামী মধ্যনামী সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাই পূজাসংখ্যার কথা মনে রেখে বেশ কিছু আগে থেকেই তৈরী হতে থাকেন। বিশেষ করে গল্প ও উপন্যাস লেখকদের কয়েক মাস যাবৎ নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত অবসর থাকে না এমন নীরক্ত কাজের চাপে তাঁরা ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে পড়েন। আজকাল এক একটা পূজাসংখ্যায় পাঁচটি-সাতটি করে উপন্যাস ছাপাবার রেওয়াজ হয়েছে। তার দায় মেটানো কি সহজ কথা? খেয়ে না খেয়ে তাদের লিখতে হয়, উর্ধ্বশ্বাসে লিখতে হয়, লিখে এই দুর্মূল্যের কাগজের বাজারেও দিস্তার পর দিস্তা পাতা ভরাতে হয়। সম্পাদক অনবরত তাগিদ পাঠাচ্ছেন আর স্লিপের পর স্লিপ লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে গিয়ে জমা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানায় প্রেরিত হবার অপেক্ষায়। কম্পোজিটর আর লাইনো অপারেটরদের এই সময় মরবারও ফুরসৎ নেই।

স্বভাবতই অতিব্যস্ততা ও দ্রুততার ফসল সব আধা-ময়ি গোছের হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, এরই মধ্যে কিছু কিছু লেখা অদ্ভুত উৎরে যায়। যে-কথার আভাস আগে দিয়েছি, এই রাশি রাশি ফসলের মধ্য থেকেই কিছু ফসল বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী গোলাজাত হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের নাম থাকে। সাময়িকতার তাগিদ থেকে তাদের উদ্ভব হলেও সেগুলি চিরন্তনতার লক্ষণে ভূষিত হয়। বাংলা শারদীয় সাহিত্যের এও এক প্রধান বিস্ময়।

(আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত।)

CALCUTTA UNIVERSITY

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীবেণু মিত্র ॥

ওঁ নমো শ্রীশ্রীনিত্যগোপালায়
ওঁ নমো শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দায়

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ২২-তম জন্মকে স্মরণ করে আমরা আজ সমবেত হয়েছি। সেই মহান মনুষ্য মানুষটি আমাদের সমস্যা-পীড়িত জীবনের জন্য কি অবদান রেখে গেছেন তাই বুঝতে আমরা আজ সমবেত হয়েছি। আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষ যে ভাবে জীবন-যাপন করি তার থেকে ব্যতিক্রম হয়ে যারা এসে পড়েন, ব্যতিক্রম বলেই অনেক সাধনা এই সাধারণ আমাদের কাছ থেকে তাঁদের পেতে হয়—কেননা তাঁদের আমরা বুঝি না, আমাদের অভ্যস্ত চিন্তা ও স্বভাব তাঁদের ধরতে পারে না। তথাপি তাঁদের আমরা একেবারে ছেড়ে দেই না—আর তাইতে আমরা বাঁচি। কেমন করে আমরা বাঁচব সেই কথা বলতেই তো তাঁরা আসেন! শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এমনই একজন ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে জীবন-দর্শন লাভ করেছিলেন তা সর্ব সাধারণের সর্বাঙ্গীণ জীবন যাপনের জন্য আজ প্রয়োজন। সেই জীবন-দর্শনের কথাটি অতি সংক্ষেপে একটু উপস্থিত করতে প্রয়াস পাব।

আজকের দিনে আমাদের সমস্যাটা কি? জ্ঞান বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিদ্যা কিছুতে আমাদের লজ্জা পাবার কারণ নেই কেননা মানুষের সভ্যতা সেদিকে বিশেষভাবেই অগ্রসর। আমাদের লজ্জা শুধু এই সব জ্ঞান বিজ্ঞানের যথার্থ আমরা কোন ভাবে প্রয়োগ করছি তাতে যে মানসিকতা ফুটে উঠছে সে মানসিকতাকে আর যাই বলা যাক মনুষ্যোচিত বলা চলে না। আমাদের সমস্যাটা এইখানে। সমস্ত জ্ঞান কি ভেঙে যাচ্ছে, যে যাচ্ছে লঙ্কায় সে-ই যে রাক্ষস হচ্ছে তার কারণই হল মানুষ হয়ে জন্মেও আমাদের কাজে কর্মে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারিনি, পারছি না। পারিনি তার কারণ মনুষ্যত্বের জীবনযাপনের যা প্রধান প্রয়োজন সেই মানবোধ আমাদের নেই। মানবোধটা আমরা হারিয়েছি বিগত শত বর্ষের দুটো সভ্যতার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষের প্রচলিত মানদণ্ড হারিয়ে আজ নূতন করে আমরা শিখে নিতে পারি নি কোন্‌খানে কোন্‌টা কতটুকু প্রয়োগ করব। বরুন যেমন, বাঁচতে হলে মরতেও হয়, মারতেও হয়। কিন্তু কতটুকু মরব, আর কতটুকু মারব যাতে সমাজ-কল্যাণ ব্যাহত না হয় সেই মাত্রাটা, মানটা আমরা শিখিনি। তাই আমাদের একদল মরতে চেয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠা হারিয়ে বনে বাস করছে আর তারই প্রতিক্রিয়ায় মারতে চাওয়ার দিল বিশ্বধ্বংসী বোমার পাহাড় বানিয়ে তুলছে; একদল বিরামহীন ভোগ করতে গিয়ে মরছে, আর একদল একান্তভাবে ত্যাগী হওয়ার মিথ্যা চেষ্টায় সামগ্রিক সত্যের দৃষ্টিতে দুঃস্থ মানসিকতায় ভুগছে। এই জন্য আজ কোথাও নেই সোয়াস্তি, নেই শান্তি, নেই আনন্দ। সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলিতে সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে বাস করছে কতকগুলি জন্তু যারা কেবলই খাই খাই করছে, কেবলই বলছে আরও চাই, আরও চাই, কেবলই ভাবছে কার ঘাড় ভেঙ্গে কত বেশী সম্পদকে আমারই করব। এগুলি কি মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষের আচরণ? এই মানসিকতা পোড়ায় থাকলে কোন্ মতবাদ কোন্ জ্ঞান প্রোগ্রাম মানুষকে উদ্ধার করবে? মানুষের সমস্যার সমাধান করবে? মানুষগুলির মধ্যে যেহেতু মনুষ্যত্ব নেই সেইহেতু সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান, সমস্ত জ্ঞান প্রোগ্রাম, সমস্ত সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র প্রভৃতি মতবাদ আগুনে ঘি ঢালার মত ভস্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে। জঠরাগ্নিতে খাদ্যবস্তু পড়লে তা পরিপাকপ্রাপ্ত হয়ে রসরক্তবীর্যে পরিণত হয়ে যেমন তা দেহকে, দেহীকে

সুস্থ সবল শক্তিশালী করে, এ ক্ষেত্রে সব কিছু বাইরের আগুনে পুড়ছে বলে, মনুষ্যত্বহীন মানুষের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে বলে এই সব মতবাদ আর প্ল্যান প্রোগ্রাম আমাদের জীবনের সমস্যার সমাধান দিতে পারছে না, সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মত জীবন যাপন করতে যেমন জ্ঞানবিজ্ঞান প্ল্যান প্রোগ্রাম দরকার, তেমনি ততধানিই দরকার মনুষ্যত্বের—কিন্তু সে কথাই মানুষ ভুলে বসে আছে। আজ ধর্মপতি সমাজপতি বলে কিছু নেই—আছে শুধু রাষ্ট্রপতি—অর্থাৎ রাজনৈতিক শক্তির কাছে আজকের মানুষ মাথা বিকিয়ে বসে আছে। এত তো ধর্মসম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান বা মঠ মন্দির মোহান্ত রয়েছেন—প্রচুর সম্পদের তাঁরা অধিকারী, লোকবলও তাঁদের সংখ্যাহীন—তবু কই কেউ তো গর্জন করে উঠছেন না এই বলে যে অন্যায় অসত্য দুর্নীতি শোষণ হতে দেব না—কই কেউ তো বলছেন না—অন্যায় অসত্য দুর্নীতি যেখানে সেখানে ধর্ম নেই, সে ধর্মের বাস্তবিকতা কিছুই নেই, সে ধর্ম জীবনের কল্যাণ আনে না? আজ ধর্ম ধর্মের মত একটা ব্যাপার হয়ে রয়েছে, আর অসত্য অন্যায় দুর্নীতি শোষণ তার মত নিজের অস্তিত্ব বেশ জোরালো করেই রক্ষা করছে। আমাদের সমস্যা তো সেইখানে। শত শত ধর্ম-প্রতিষ্ঠান যদি রাজনৈতিক শক্তির করনিত থাকে, ধর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা যদি মানুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলা না যায়, যদি ধর্মাচরণদ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব জাগ্রত করা না যায়, তাহলে সে ধর্মে সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই তো বেশী হবে। আজ তাই হচ্ছে। ভোগের নামে ভোগ শুধু সহ্য হয়, কিন্তু ত্যাগের মুখোসে যে ভোগ-চরিতার্থতা চলছে, তা থেকে রক্ষার পথ আজ দরকার। গোটার মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়েছে বলে—মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত করা সম্ভব হচ্ছে না বলে আজ বহুবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় গরীয়ান হয়েও মানুষের সভ্যতাকে ধিক্কার দে সে সভ্যতায় শান্তি নেই, আনন্দ নেই, সোয়াস্তি নেই, সেখানে অল্প সংখ্যক বিরাট সম্পদের অধিকারী, তারই পাশে সমাজের অধিক সংখ্যক অভাবে পীড়িত। এতদিনের এত মতবাদ, এত রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা—তবু এত খানি বৈষম্য আমরা কেন নীরবে সহ্য করি, কেন সহ্য করি শাসকের হাতে, রক্ষকেরই হাতের মার? কেননা আমরা মানুষ নই। এইখানে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের স্রষ্টা ও আচরণ রেখে গেছেন। তাঁর মতে প্রতি মানুষ যদি সমগ্র মানুষ হওয়ার সাধনা নেয় —কেউ রাজনীতিবিদ্, কেউ অর্থনীতিবিদ্, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ দার্শনিক, কেউ সন্ন্যাসী, কেউ সংসারী এমন নয় সকলেই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ—মনুষ্যত্বের অধিকারী —এই সাধনা যদি মানুষ গ্রহণ করে তবেই শুধু বর্তমানে যেখানে এসে আর আমরা পথ দেখতে পাচ্ছি না—সেইখানে পথের সোঁজ পাব।

এত মতবাদ প্ল্যান প্রোগ্রাম কোন সুফল আরও কেন দিচ্ছে না? যেহেতু সংঘ-অনুভূতি—সকলে মিলে আমরা এক—এই অনুভূতি আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। তাই প্রত্যেকেই আমরা নিজেরটা গুছাই—নিজেই শুধু বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাইলে অপরকেও যে বাঁচাতে হবে, নইলে যে আমি একলা বাঁচব না, অপরেরটা না গুছিয়ে কেবল আমারটা গুছালে যে আমারটা গুছানো থাকবে না, সব এলোমেলো হয়ে যাবে—এসব ধারণা সমাজের মধ্যে ঢোকানো হয় নি—তাই সর্বত্র সমস্যা। আমি যে সমাজ-বৃক্ষের অংশক, আমার অস্তিত্বকে স্বীকার করাতে হলে অপরের অস্তিত্বকেই শুধু আমার স্বীকার করতে হবে তা নয়—অপরের বিকৃতিও আমাকে সমানভাবে মানতে হবে—এই কথাটি শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সমাজের প্রত্যেককে আজ বুঝাতে হবে এবং তদনুযায়ী তাদের আচার আচরণ শেখাতে হবে। অপরকে যদি আমার অংশক বলে জানি, তাহলে অপরকে বঞ্চিত করে নিজের পেট ভরাবার হীন মানসিকতা অনেকাংশে কমবে। তখন সবাই মিলে বাঁচব—কোন ব্যক্তি বা দল নয়, সবাই মিলে—এই রকম করে ভাবতে পারবে মানুষ। সেইখান থেকে আসবে শান্তি সোয়াস্তি। সমাজের সামনে আজ যে সঙ্কট—তার জন্য এই সমাধান শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ রেখে গেছেন।

তিনি বললেন আমাদের মিলতে হবে, সমস্ত বিশ্বমানব এক-দেহ এই অনুভূতি আনতে হবে। কিন্তু একজনের সঙ্গে আর একজন মিলতে পারব কখন? আমার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, আপনারও আছে—মিলতে গেলে এই বৈশিষ্ট্যগুলিতে টান লাগবে যে! কিন্তু ব্যক্তি ব্যক্তি থেকেও যদি একটা বড়র মধ্যে নিজেকে স্থাপন করতে পারে যেখানে রয়েছে সার্বজনিকতা, তাহলে যার যার স্বাতন্ত্র্য নিয়েও অপরের সঙ্গে মিলতে পারে। শ্রীমৎ স্বামীজী একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—অঙ্কশাস্ত্রের L. C. M. ল. সা. গু-র। ১, ২, ৫ এর L. C. M. ১৫ তে ১৫ আছে ৩ও আছে, ৫ও আছে—কারও অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়নি। তাই আজ আমাদের ১৫ হতে হবে। কিন্তু যদি G. C. M. গ. সা. গু র নিয়ম অনুযায়ী ১-এ গিয়ে বিভিন্নভাবে করতে চাই তাহলে ৩, ৫, রূপ বৈশিষ্ট্যগুলি লোপ পেয়ে যায়। তাই সকলের সঙ্গে মিলিত হতে হলে আমাদের সকলকেই ১৫ হতে হবে। সেইখানে অনেকের নিত্যের সমস্যার সমাধান-সূত্র পাওয়া যাবে। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর প্রবন্ধান্তরের ভাষে বার্ণিকভাবে বিপরীতের এই মিলন-ব্যবস্থা রেখে গেছেন।

সমগ্র মানুষ হতে গিয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করতে হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে বুদ্ধি মানুষে মানুষে ভেদ ঘটায়, পরস্পরের মধ্যে হিংসা রেষারেষির জন্ম দেয়, যে বুদ্ধি ব্যক্তিকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সে বুদ্ধির অনুশীলন আমরা করে আসছি বলেই কোথাও কোনও সমস্যার সমাধান নাই। হৃদয়ের যে বৃত্তি মানুষে মানুষে মিলন ঘটায় সেই হৃদয়ের অনুশীলন করে মানুষকে হৃদয়বান হতে হবে। আজ সমস্ত মানুষের মধ্য থেকে এই হৃদয় নামক বস্তুটি অদৃশ্য হয়ে গেছে—অথচ উপনিষদ বলেছেন এই হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পর্যন্ত অভিষ্পৃষ্ট করা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন 'চোখে দেখিস প্রাণে জানা, হৃদয় মাঝে দেখ না করে ভুবনখানা'। হৃদয়ের প্রীতিকে বাদ দিয়ে কেবল বুদ্ধির বেশাতি করে সমাজকে বর্তমান বিপদ থেকে রক্ষা করা যাবে না—মহান মধুর পুরুষোত্তমানন্দ বার বার সে কথা বলেছেন।

অত্যন্ত সংক্ষেপে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের কথা একটুখানি বললাম। এই চিন্তাধারা নিয়ে প্রতি মানুষ যদি নিজেকে পুনর্গঠিত করে করে সমাজকে পুনর্গঠন করবার সাধনা নিয়ে চলে, এক মাত্র তাহলেই বর্তমান অন্ধকারে পথ পাওয়া যাবে। তাহলে যে নূতন সমাজ গড়ে উঠবে সেখানে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতাও থাকবে এবং পাশ্চাত্যের কম্যুনিজম অথবা তারও পরবর্তী মতবাদও থাকবে। এই রকম সামগ্রিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের প্রয়াস ছাড়া একের দলের অপরের হাতে ক্ষমতা দিলেই সমাজে শোষণ বন্ধ হবে না, সমস্ত মানুষ খেতে পাবে না, শান্তি আনন্দ সোয়াস্তিও মিলবে না। এই নূতন সমাজের পথের খোঁজ যারা রেখে গেছেন সেই শ্রীশ্রী নিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে আমাদের সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করি। আর যাঁদের সাহচর্য ও সাহায্যে আজকের সারাদিনের এই স্মরণ-অনুষ্ঠান সম্ভব হয়ে উঠেছে—ছোট বড় দূরের কাছের সেই সবাইকে আমাদের প্রাণভরা প্রীতি ও আনন্দ জ্ঞাপন করি—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের আনন্দ তাঁদের অভিসিঞ্চিত করুক।

আগামী মাঘ ১৩৮১-তে উজ্জ্বলভারতের ২৮-তম বর্ষ আরম্ভ। গ্রাহকদিগের বার্ষিক চাঁদা ৬·০০ টাকা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

সম্পাদিকা
উজ্জ্বলভারত

সাময়িকী

উজ্জীবনভারত সম্বন্ধে : উজ্জীবনভারত পত্রিকার ২৭ বৎসর এই পৌষে শেষ হইতেছে। ইহার গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাই যে উজ্জীবনভারতের গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন এত কমিয়া গিয়াছে যে ইহাকে রক্ষা করা বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তদুপরি লোকাভাব। এতদিন যে ভাবে চলিয়াছে, আজ সেভাবে আর চলিতে পারে না—নূতন শক্তি সংযোজন অত্যাবশ্যক। কিন্তু সে শক্তি আসিয়া আজও পৌঁছায় নাই। আসিবে এই আশায় ইহাকে বন্ধ করিবার মনও তৈরী করিতে পারিলাম না। তাই আগামী মাঘ ১৩৮১ হইতে ইহার যে অষ্টত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে, সে সংখ্যায় আলাদা প্রচ্ছদপৃষ্ঠা—পৃথক কাগজ ও পৃথক ছাপা—না রাখিয়া প্রথম কর্মার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম প্রচ্ছদ দিয়া আরম্ভ করিব। আয়তনও আরও শীর্ণ করার প্রয়োজন হইবে। ইহাতে হয়তো অনেকে বেদনা পাইবেন কেননা অনেকেই ইহাকে ভালবাসেন। সর্বজনপরিচিত প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, জনাব রেজাউল করীম প্রভৃতি বয়ঃবৃদ্ধ শুভানুধ্যায়িগণ হইতে অনেকেই উজ্জীবনভারতকে বিশেষ ভালবাসেন। পত্রিকাটি বন্ধ হইলে তাঁহারা বেদনা পাইবেন। কিন্তু এ পত্রিকাটী তো commercial পত্রিকা নয়—ইহার অন্তর্নিহিত ভাবধারাটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের যতই প্রয়োজনীয় হউক—তাহা অনেকের পক্ষে বোধগম্য নয়। তাই ইহার জন্য জীবন-পণ করিবে কে? অর্থের বিনিময়ে লোকবল লাভ করিব সে অর্থও নাই। তবু এ বছরও বন্ধ করিব না—প্রচ্ছদ বাদ দিয়া হয়তো আরও শীর্ণ করিয়া বাঁচাইয়া রাখি—যদি কেউ আসে, যদি ইহার মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যেকথা বলিতে চাহিতেছেন সে কথা জাগ্রত হইয়া উঠিবার সময় আসিয়া যায়। যে যে ভাবে পারেন ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়াস করিবেন—বন্ধুজনের নিকট এই আবেদন জানাইয়া রাখিলাম।

জন্মোৎসব : শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৯২-তম জন্মতিথি ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮১ (৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৪) বুধবার তাঁহার পুণ্য সমাধি নরনারায়ণ আশ্রমে বিনম্র শ্রদ্ধায় নীরব অঞ্জলিতে পালিত হইয়াছে। ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার বহুজনের উপস্থিতিতে সে অনুষ্ঠান আড়ম্বর সহকারেই পালিত হয়। সকালে ৪-১৫-তে প্রার্থনা, ৭-৩০-এ বাল্যভোগ, ৮টাতে নরনারায়ণ আশ্রমের লাঞ্ছন-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা উত্তোলন, সকাল ৯টা হইতে প্রায় সারা দুপুর সঙ্গীত, দ্বিপ্রহরের পূজা অন্তে ১২টায় ভোগ, বিকেল ৪টায় সভা, সভান্তে আরতি, রাত্রির নিয়মিত ভোগ সবই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকাল ৯টা হইতে ভক্তিমূলক প্রার্থনামূলক গান গাহিয়া শ্রীকমলা কুমার ও শ্রীরণজিৎ সেনগুপ্ত সকলকে আনন্দ দিয়াছেন। তারপর চারিগ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীভাঁদের মণ্ডল মহাশয় তাঁহার দল লইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা শ্যামাসঙ্গীত ও শ্রীরামকৃষ্ণভজন গাহিয়া সমবেত সকলকে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। বিকালের সভায় শ্রীমৎ স্বামিজী বর্তমান যুগ-সমস্যার সামনে কি সমাধান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কয়েকজন আলোচনা করেন। সেগুলি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। বন্ধুবর শ্রীশান্তশীল দাশ মহাশয় তাঁহার অসুস্থ দেহ লইয়াও বহু বছর পরে সভায় নিজের প্রবন্ধটুকু পাঠ করিয়া আনন্দ দিয়াছেন। প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীনলিনীকিশোর গুহ মহাশয় তাঁহার দৈহিক অক্ষমতার জন্য সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার মর্ম-বেদনা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, '...আর আমার অন্তরের কথা যা প্রকাশ করিতে পারি না তাই অনবদ্য ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করে যেন পুরুষোত্তমানন্দ।' সর্বসমন্বয়মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-প্রাণ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ rationality ও animality নিয়ে যে কথা বলেছেন তাই তো বিশ্বের বাঁচার একমাত্র

পথ।'...অপর বন্ধুবর শ্রীহরপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ গত ২।৩ বৎসর যাবৎ সেই সাগর-নিধী হইতে আসিয়া উপস্থিত থাকেন, এবার অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া বিশেষ বেদনা পাইয়া লেখা পাঠাইয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীজগদীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রবন্ধটিও পাঠ করা হইয়াছে। জীবনের প্রতিটি স্পন্দন স্বীকার করা অথচ তাহাদের মাঝেটুকু বাহির করিয়া না চলিলে এবং সঙ্ঘ-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সামগ্রিক কল্যাণ-বোধকে ভিত্তি না করিলে জাতির বাঁচিবার যে পথ নাই—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সমস্ত কথার এই সারমর্মটুকু মানুষের কাছে পৌঁছাইবার সংকল্প লইয়া আমরা তাঁহার প্রতি আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। শ্রীশ্রীনিতাগোপাল তাঁহার জীবন ও বাণীতে যে বীজ রাখিয়া গিয়াছেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ভাস্করায়া তাহা বিকশিত হইয়া উঠুক এই প্রার্থনা।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	১২·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	১০·০০
কর্মবাণী	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
Soul of India Speaks	৭·৫০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
পকেট গীতা	৫·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৬·০০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·৪০
বাংলার ঋষি	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৭৫
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
আচার্য জগদীশ	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

প্রয়োগমূলক নূতন ধরনের বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯৪·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী: ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

নতুন তারার সন্ধানে

॥ শ্রীগণেশ চক্রবর্তী ॥

দূর আকাশের তারায় তারায়
নতুন তারার সন্ধানে
এই পাতায় ঘরের মাটির দাওয়ায়
উদাসী মোর মন টানে
আজ কোন্ টানে।

আমার এই সুখ জীবনে ওকতারা
যেই দূর আকাশে চোখের পাতায় দেয় হানা—
মোদের রক্তির মোর ফুরাবার
সম্ভাবনায় ছুটি পথে জোরটানা।

দিহন পথে পুব আকাশে
ভোর হলে যেই পাখিরা সব কল্লোলে
এক নতুন দিনের সুর তোলে
এই ঘাম ঝরানো শরীর ছোটে
মন মাদলের হিল্লোলে
কী জোরতালে।

দিনের শেষে আকাশে যেই
সন্ধ্যাতারা ঐ ওঠে
হায় ঘরের পানে মন ছোটে,
মোর অবসরের বিলাস বেয়াল
ক্লান্ত চোখে শুধুই ভাবে
এই আকাশে নতুন তারা কই ফোটে।

ভ্রম-সংশোধন

বিগত শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীঅনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য লিখিত 'রবার্ট ফ্রস্ট' নামক রচনাটির প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ষষ্ঠ লাইনের প্রথমে 'জন্য' শব্দটির পরে একটি লাইন বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। সেইটি সহ সমস্ত লাইন দুইটি এইরূপ : অথচ বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থের জন্য তাঁকে চার বার পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হয়। আমেরিকায় এ সম্মান আজ পর্যন্ত আর কোন কবির ভাগ্যে জোটে নি। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদিকা, উজ্জ্বলভারত

শ্রীপ্রভু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাওইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

ইউবিআই-এর
রেকারিং ডিপজিট স্কীমে

প্রয়োজনের সঙ্গে
তাল রেখে সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠে

কখনো না কখনো নিশ্চয়ই আপনার একসঙ্গে মোটা টাকার দরকার পড়ে।
আমাদের রেকারিং ডিপজিট স্কীমে আপনার পরিকল্পনামত সঞ্চয়ের সুবিধে আছে। পাঁচ থেকে পঁচিশ টাকার মধ্যে সাধ্যমত একটা নির্দিষ্ট টাকা মাসে মাসে জমাতে শুরু করুন। আপনার পক্ষে সুবিধেজনক মেয়াদ আপনিই ঠিক করবেন। দেখুন না, আপনার সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি সুদে কেমন বেড়ে ওঠে!

অল্পস্বল্প যে টাকা থাকে না, সত্যিকার কাজেও লাগে না, সেটাই নিয়মিত জমালে আপনি একসময় মোটা টাকা পাবেন। ধরুন, ৭২ মাসের মেয়াদে প্রতি মাসে আপনি ১০ টাকা করে রেখেছেন। মেয়াদ শেষে আপনার তাহলে জমালো ৭২০ টাকা। কিন্তু ইউবিআই আপনাকে দেবে ২৮৩ টাকা। আজই ইউবিআই-তে একটা রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্ট খুলুন।

মাসিক কিস্তি	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন					
টাকা	১২ মাস টাকা	২৪ মাস টাকা	৩৬ মাস টাকা	৪৮ মাস টাকা	৬০ মাস টাকা	৭২ মাস টাকা
৫	৬৩	১৩০	২০৭	২৮১	৩৭৮	৪৯১
১০	১২৫	২৬১	৪১৪	৫৭৮	৭৫৭	৯৮৩
২০	২৫১	৫২১	৮২৭	১১৫৫	১৫১৩	১৯৬৬
৩০	৩৭৬	৭৮২	১২৪১	১৭৩৩	২২৭০	২৯৪৯
৪০	৫০১	১০৪৩	১৬৫৪	২৩১০	৩০২৭	৩৯৩২

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(আপনার প্রয়োজনের একটি সংস্থা)

ads-UBI-7427

২৪-পরগণা জেলার অধিবাসীদের কাছে আবেদন

- খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।
- আপনার উপর ধার্য 'লেভীর' ধান বা চাল আজই দিয়ে দিন।
- মনে রাখবেন সময়মত লেভীর ধান বা চাল না দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।
- আপনার ধান নির্ধারিত মূল্যে নিকটবর্ত্তী অনুমোদিত এজেন্টের (ডি. পি. এজেন্ট) কাছে বিক্রয় করুন।
- ধান চালের মজুতদার ও চোরা কারবারীদের ধরার কাজে সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন। এই সম্পর্কে খবর থাকলে নিকটবর্ত্তী থানা বা চেক পোষ্টে খবর দিন।
- নিশ্চিত জানবেন আপনার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সরকারের খাদ্য সংগ্রহ ও সুষম বণ্টন সম্পর্কিত নীতি সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব নয়।
- কোন কিছু জানতে হলে স্থানীয় উন্নয়ন আধিকারীকের (বি. ডি. ও) সংগে যোগাযোগ করুন।

২৪-পরগণা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত।

স্বরাজকে স্বদেশ মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন স্বরাজ উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে। 'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

মুদ্রিত

১। ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২·২০
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮·০০
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৭·০০
২। ঈশোপনিষৎ	২·০০
৩। কেনোপনিষৎ	২(০০
৪। কঠোপনিষৎ	৩·০০
৫। প্রশ্নোপনিষৎ	১·০০
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ	·৯৫
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	১·৭৫
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	
মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯। শ্রীনিত্যগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৩·০০
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ	·৫০
১১। গীতাজয়ন্তী	·০৯
১২। উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	·৫০
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৩·০০
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০

পাণ্ডুলিপি

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৩। দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি।

শ্রীপ্রতিভা রায়ের

১। নারী-প্রগতির জন্মকথা	১·২৫
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিক্ষা সুধার কথা	·৩১
৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY 21 JAN 1975

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	·৬২
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২·০০
৩। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৩·০০
ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত	
৪। রবীন্দ্র-জয়ন্তী	৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—জেরুজলনগর, কলিকাতা-৫৯) ২৪ পরগণা